এম. ফিল. গবেষণার শিরোনাম

বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা

The Development of Seasonal Festivals in the Bengali Culture : An Outline of their Evolution

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর তারিক মনজুর

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

তামান্না জেনিফার মুন

শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৩৬

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা

The Development of Seasonal Festivals in the Bengali Culture :
An Outline of their Evolution

তামান্না জেনিফার মুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মার্চ ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীনে 'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' (The Development of Seasonal Festivals in the Bengali Culture : An Outline of their Evolution) শিরোনামে, এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করলাম। আমার জানা মতে, উল্লেখিত শিরোনামে এ যাবৎ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পন্ন হয়নি বা কোনো গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়নি।

অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর তারিক মনজুর এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণা; এটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো পদবি লাভের জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও দ্বিতীয়িক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং সাক্ষাৎকার ব্যতীত অবশিষ্ট উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও বিরচনা আমার নিজস্ব।

তামান্না জেনিফার মুন

এম. ফিল. গবেষক

বাংলা বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৩৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে, তামান্না জেনিফার মুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীনে, বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর তারিক মনজুরের তত্ত্বাবধানে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের যুগ্ম-তত্ত্বাবধানে 'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' (The Development of Seasonal Festivals in the Bengali Culture : An Outline of their Evolution) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করছে। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৩৬, শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮, গবেষণায় যোগদানের তারিখ ১৮.০৩.২০১৮।

এই অভিসন্দর্ভটি তার একক ও মৌলিক গবেষণা, যা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভ বা এর কেনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। গবেষককে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

ডক্টর তারিক মনজুর
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ
যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

দীর্ঘ চোদ্দো বছরের অধিক সময় বাংলাদেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সংস্কৃতি বিষয়ক সাংবাদিকতা করেছি। প্রাত্যহিক অ্যাসাইনমেন্টগুলো করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। তবে, বাৎসরিক উৎসব-ভিত্তিক রিপোর্ট করতে গিয়ে তথ্যবহুল, গবেষণালব্ধ গ্রন্থের অপ্রতুলতা অনুভব করতাম। অনলাইন তথ্যের সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দ্বিধা থাকায় এবং কর্মক্ষেত্রে উৎসব বিষয়ে জ্ঞাত বিজ্ঞজনের অভাবে, তথ্য-উপাত্তগুলো নিজের দায়িত্বে, নির্ভুলভবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করতে বেগ পেতে হতো।

টেলিভিশন সাংবাদিকতায় উৎসব বিষয়ক সর্বোচ্চ তিন মিনিটের খবর উপস্থাপন, কখনোই উৎসবের রং-রূপ-কাঠমো পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে পারে না। আর প্রতিদিনের ঘটমান বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার খবরের ভিড়ে, অধিকাংশ উৎসব-সংবাদের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যেত। নিরুপায় এই বাস্তবতায় একঘেয়েমি কাটাতে নতুন করে কিছু করার সুপ্ত ইচ্ছা জেগে উঠছিল ক্রমাগতই।

কারণ মাত্র সেটাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগে (শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৯-২০০০) বি. এ. এবং এম. এ. ক্লাসে পাঠ্য হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভিনয়-রীতি, আঙ্গিক, কলাকৌশল, প্রযোজনা-রীতি, উপস্থাপন, রূপসজ্জা, আলোকসজ্জা, মঞ্চ ও পোশাক-পরিকল্পনার বিষয়গুলোর সঙ্গে উৎসবের ব্যাপকতা নিয়ে গবেষণার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই। তবে পরিবারিক বাস্তবতায় এবং কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততায় সে বিষয় নিয়ে ভাবার অবকাশ হয়নি বললেই চলে।

সে সুযোগটা করে দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার গবেষণার যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী এবং স্বনামধন্য বাংলা বিভাগে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে এম. ফিল. প্রোগ্রামে নিবন্ধন লাভ, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ, শিরোনাম ও রূপরেখা তৈরি, অধ্যায় বিভাজন-নিরূপণসহ কাঠামো পরিকল্পনা এবং আনুষঙ্গিক সমন্বয় সাধনে তাঁর অবদান সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সনির্বন্ধ কৃতজ্ঞতা স্যারের প্রতি, যাঁর নিঃস্বার্থ এবং আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা ছাড়া এই গবেষণা কাজ হয়তো শুরু হতো না।

'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' (The Development of Seasonal Festivals in the Bengali Culture : An Outline of their Evolution) আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর তারিক মনজুর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে এম. ফিল. প্রোগ্রামের প্রথম পর্বে একই বিভাগের শিক্ষক, অধ্যাপক ডক্টর ফাতেমা কাওসার (উনিশ শতকের নাটক, কোর্স : ৬১১) এবং অধ্যাপক ডক্টর গিয়াস শামীম (বিশ শতকের প্রথমার্ধের নাটক, কোর্স : ৬১২)-এর নিকট এম. ফিল. প্রথম বর্ষের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি। বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা, যাঁদের যথাযথ দিকনির্দেশনায় প্রথম পর্ব উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। বাংলা নাটক বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা, বিশ্লেষণ, প্রাজ্ঞ নির্দেশনা এবং গবেষণা-সংশ্লিষ্ট বইয়ের নাম, তথ্যসূত্রসহ সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে তাঁরা আমাকে ঋদ্ধ করেছেন বারবার।

আমি সবসময় ঋণী যাঁর কাছে, তিনি এই গবেষণার সার্বক্ষণিক সহযোগী, আমার এম. ফিল. গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর তারিক মনজুর। থিসিস লেখা শেখার হাতেখড়ি তাঁর কাছে। নিজেকে ভাগ্যবান এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত মনে করি এজন্য যে, তিনি আমার কাজের ওপর আস্থা রেখেছেন, অকৃপণভাবে এবং ধৈর্য নিয়ে একাধিকবার সম্পূর্ণ লেখা পড়ে সুচিন্তিত পরামর্শ, মন্তব্য, অনুপ্রেরণা দিয়ে গবেষণার মতো নীরস প্রক্রিয়াকে সাবলীল এবং আনন্দের করেছেন। শুধু তাই নয়, শেষ মুহূর্তের বিভিন্ন কাজের কঠিন প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদনে তিনি সবসময় সহযোগিতা করে গেছেন।

এরপরও গবেষণায় যতটুকু অসম্পূর্ণতা আছে, তার দায় একেবারে আমার। থিসিস লেখার পুরোটা সময় জুড়ে বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রাদুর্ভাব ও প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতায় দীর্ঘ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারে বেগ পেতে হয়েছে। বই কিনে পড়া এবং অনলাইন পত্রপত্রিকা সেই অভাব কিছুটা পূরণ করলেও এসব উপকরণ গ্রন্থাগারের বিকল্প হয়ে ওঠেনি কখনোই। গবেষণা-কাজের জন্যে আমাকে যেতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে, বাংলা বিভাগের মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষে, থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগের পাঠকক্ষে ও বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র গ্রন্থাগারে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাতে হয় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, আমাকে অফিসিয়াল কাজে সহায়তার জন্য।

ধন্যবাদ থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স সটাডিজ বিভাগে আমার সহপাঠী, বন্ধু, অগ্রজ ও অনুজ শিক্ষকবৃন্দ সবার প্রতি, যাঁরা আমার ধারণাকে সমৃদ্ধ করতে নিরলস সহযোগিতা করে গেছেন।

সবশেষে আমার বাবা, মা এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ধন্যবাদ। সংসারের ভার লাঘব করে, অসীম ধৈর্য নিয়ে তাদের অপেক্ষা এবং মুহুর্মুহু তাগিদ নির্দিষ্ট সময়ে এই গবেষণা কাজ শেষ করতে সহায়ক হয়েছে।

তামান্না জেনিফার মুন

গবেষক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক পুরানো। সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে সহজ সংমিশ্রণ এবং তার লৌকিক রূপের যে বৈচিত্র্যগ্রাহী প্রবণতা, তা বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনারই এক বিশিষ্ট রূপ। এর আদিমতম, ঐতিহাসিক এবং প্রধান দিক ঋতুউৎসব। অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল সকল শক্তির সম্মিলন এবং একাত্মতা এই উৎসবেরই কার্যকারণ। ঋতুভিত্তিক উৎসব বাঙালি সংস্কৃতিতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সর্বজনীন এক আনন্দযোগ। উৎসব জাতি-ভেদে সংস্কৃতির সৌহার্দ বিনিময়ের মাধ্যম।

একটা সময় ছিল যখন লোকসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া, নেতৃত্ব, শ্রমবিভাজন বা সামাজিক স্তরবিন্যাস সব ক্ষেত্রেই মূলত ঋতুভিত্তিক উৎসবের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হতো। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ লাভের আশা, বিভিন্ন রীতি-প্রথা, আচার-সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষ পার্থিব কল্যাণ কামনায় আয়োজন করত উৎসব। তাই অগণিত মানুষের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণে জীবনঘনিষ্ঠ উৎসব রূপ নেয় সমাজঘনিষ্ঠ উৎসবে। ঋতু-উৎসবের আর্থ-সমাজিক প্রেক্ষপটে আবর্তিত হয় খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও জীবিকা।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে যাযাবর মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনে উৎসব ছিল এক আশীর্বাদ, যার আবির্ভাব প্রকৃতি কেন্দ্রিক – শিকারে প্রাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ বা শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে। সেই ধারায় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অনুষঙ্গরূপে ঋতুভিত্তিক উৎসবের বিকাশ।

মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গল সাধনার ব্রত নিয়ে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা, তাতে সভ্যতার উৎকর্ষ যেমন হয়েছে, তেমনি বিজ্ঞানের প্রভাবে জীবনের অমৃতসম সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তির অপ্রতিহত অগ্রযাত্রায় এবং সহজলভ্যতায় মানুষ হয়ে উঠছে আন্তরিকতাশূন্য, আত্মকেন্দ্রিক ও উদাসীন। বিজ্ঞান ও শিল্পের মাঝে অনিবার্যভাবে তৈরি হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়। ফলে, অনেকটা দ্রুতচালে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে জাতিগত সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিবর্তন আর বৈষম্যের অনির্ধারিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী প্রতিবেশ সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে; দেখা দিচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতা, নিস্পৃহতা, নিরাশা, অবিশ্বাস, মৃত্যুচিন্তার মতো অনিষ্ট ধারণা। বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ ও চেতনায় বিকৃতি ঘটছে; সংকট তৈরি হচ্ছে জাতিগত সংস্কৃতির অনন্য কাঠামোয়। বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত সংস্কৃতির আগ্রাসী তাণ্ডবে যেন ধ্বংসোন্মুখ বাঙালি কৃষ্টি-স্বকীয়তা। ফলে গণতান্ত্রিক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের অসহায় শিকার মানুষ। বহুমুখী সংস্কৃতির প্রবল স্রোতে প্রজন্মগত দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতা বোধের হতাশা সাধারণ এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে আশার কথা, বিচ্ছিন্নতা মুক্তির অমোঘ আহ্বান যেন সুপ্তভাবে প্রোথিত হয়ে আছে বাঙালির মননে। তাই জাতীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করা ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো পর্যায়ক্রমে দেশের মানুষের কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, তা সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কখনোই সম্ভবপর ছিল না।

বর্তমান প্রজন্ম তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হোক, একাত্ম হোক এর মূলধারার সঙ্গে, সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক অসাম্প্রদায়িক ঋতুভিত্তিক উৎসব – এমন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টায় এই গবেষণা।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন লেখক বাঙালি সংস্কৃতি বা ঋতুভিত্তিক উৎসব নিয়ে লিখেছেন অনেক। কিন্তু 'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিকি উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' বিষয়ে এখন পর্যন্ত গভীর অনুসন্ধান, বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ বা কোনো গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বৃহৎ পরিসরে ঋতুভিত্তিক উৎসব এবং এর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। যদিও লোকসংস্কৃতিবিদরা পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ বা নবান্নর মতো ঋতু উৎসবের ওপর কিছু বিবরণমূলক কাজ করেছেন। তবে, বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্ত ঋতুর প্রসঙ্গগুলো সেখানে অনুপস্থিত।

বৃহৎ পরিসরে বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক উৎসবের সৌন্দর্য, উৎসবের বিকাশ, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উৎসবের আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, গণমানুষের সংযোগ, সম্পর্ক চর্চা ও মেলবন্ধন এই গবেষণার উদ্দেশ্য। কালের বিবর্তনে বাংলার ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো কোন আঙ্গিকে এসে পৌঁছেছে – এর মূল্যায়ন করা এবং একইসঙ্গে উদ্‌যাপিত ঋতুভিত্তিক উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য।

'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' গবেষণা পাণ্ডুলিপির তিনটি অধ্যায়ের সাতটি পরিচ্ছেদে সজ্জাক্রমে সংস্কৃতি এবং বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ ও সংকট, ঋতুভিত্তিক উৎসবের উদ্ভব-বিকাশ-বিবর্তন, একই সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসবের উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃতি, এর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য, বাঙালি কে বা কারা, বাঙালি সংস্কৃতির সংকট ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, একটি সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগোষ্ঠীর সম্পদ এবং তার নিত্য জীবনযাপন প্রণালি, জীবনের দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশকে তার সংস্কৃতি বলে। এই সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ধারা এবং সমঝোতার মাধ্যমে উন্নততর জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষাও। সময়ের আবর্তনে প্রতিটি জাতির সংস্কৃতিচিন্তায় ও মননে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী, সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের পরিপন্থী যে কোনো কাজ বা আচরণ অপসংস্কৃতি। আধুনিকতার নামে স্বজাত্যবোধ, চেতনা ও বিশ্বাসকে বিলিয়ে দেয়াও অপসংস্কৃতির নামান্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উৎসব ও ঋতুভিত্তিক উৎসবের আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য, উৎসবের উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি উৎসবের ঐতিহ্য বর্ণনায় এসেছে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের উৎসব। সমাজবিজ্ঞানীরা উৎসব উদ্ভবের ইতিহাস খুঁজে বের করা দুরূহ বলে মনে করলেও, এই মতে পৌঁছেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের উৎসব আর উৎসব-প্রীতির ইতিহাস সমসাময়িক। সময়ের সাথে উৎসবের বিলুপ্তপ্রায় বা বিবর্তিত রূপটিও খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের গবেষণায়।

পারিবারিক আঙিনায় সীমিত ব্যক্তিগত আনন্দ আয়োজন যেমন উৎসব, তেমনি সমাজিকভাবে আয়োজিত নির্দিষ্ট গোত্রের বা সর্বজনীন অনুষ্ঠানও উৎসব। উৎসবের বিশেষ সেই ধারায় কালক্রমে গড়ে ওঠে – জীবিকার উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, ঐতিহাসিক বা স্মরণ উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সামাজিক-পারিবারিক উৎসব, দেশাত্মবোধক উৎসব, জাতীয় উৎসব, দেশীয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব, স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত উৎসব। এই উৎসবগুলো বহন করে বাঙালি জাতিসত্তার সংহত পরিচয়।

মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে বর্ষামঙ্গল, শরৎ উৎসব, পৌষমেলা, বসন্তবরণের মতো ঋতু-উৎসবের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। এর আগে বাংলা সনের সংস্কারক হিসেবে সম্রাট আকবরের নাম উঠে আসে। পুণ্যাহ, হালখাতা, চৈত্রসংক্রান্তী ও বৈশাখী মেলা, নৌকাবাইচ, নবান্ন, পিঠা উৎসবের মতো বর্ণাঢ্য আয়োজনগুলো সময়কে রাঙিয়ে তুলেছে নানাভাবে। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে ঋতু উৎসবগুলো পর্যায়ক্রমে বাঙালির জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে পরিণত হয়েছে প্রাণের উৎসবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশে র্সজনীন ঋতুউৎসবগুলো কীভাবে সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে, এ নিয়ে আলোচনা আছে। তাছাড়া, এখানে দেখানো হয়েছে, ঋতুভিত্তিক উৎসবের মাহাত্ম্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে বাঙালির সামাজিক মিলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, জাগিয়েছে স্বজাত্যবোধ, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ। উৎসব মানুষকে করেছে মানবিক ও সহনশীল, দূর করেছে জাতিগত সীমা। অসাম্প্রদায়িক এই ঋতু-উৎসব মানুষকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে, ক্ষুদ্রতা, দীনতা থেকে মুক্ত করে চিত্তশুদ্ধি ঘটায়, নতুন প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। বাঙালির প্রকৃত পরিচয়ে তার ঋতুভিত্তিক উৎসব সার্থক হয় সমষ্টি চেতনায়, নিঃসার্থ শ্রমে, বিনিময়ের উৎকর্ষে। একটু সতর্ক ও সযত্ন হলেই বাঙালি তার লালিত ঐশ্বর্য দিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারে, এমন প্রমাণ সে রেখেছে। বাঙালি ঐতিহ্যের গৌরবময় এই সাংস্কৃতিক চেতনাকে গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে অনুধাবন করে জাতীয় স্বার্থে এই উৎসবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উচিত আমাদের।

গবেষণা কর্মপ্রক্রিয়ার পুরোটা সময় জুড়ে বিভিন্ন বই, জার্নাল এবং অনলাইন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্ত ঋতু উৎসবের উৎস অনুসন্ধানে তথ্যপ্রমাণ ও লিখিত গ্রন্থপঞ্জির অভাব অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলে। সে ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা উত্তরণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে কর্মসূত্রে মাঠপর্যায়ে কিছু কাজ সহায়ক হিসেবে এসেছে। সেখান থেকেও তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক ধারায় মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থাকার প্রবণতা বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারার বিশেষ দিক। সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতির সুফল ভোগ করতে জনগণের সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে বাঙালির সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলোকে আঁকড়ে ধরতে হবে। অনুভব করতে হবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন সংস্কৃতির অনুকরণীয়

Dhaka University Institutional Repository

দিকের ব্যাপকতা ও গভীরতা। তবেই জাতি হিসেবে বাঙালির অবস্থান সমৃদ্ধ হবে, এমন আশা করা যায়। ধর্ম-গোত্র ছাপিয়ে মানুষের পরিচয় হোক – সে মানুষ। 'মানুষ' পরিচয়ে ধর্মীয় উৎসবের বাইরে অসাম্প্রদায়িক উৎসবগুলো মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠবে। এই জীবন-দর্শন বাঙালির জাতিগত ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি, তার প্রাণপ্রবাহের ধারা। সংস্কৃতিবান মানুষের এই চেতনাকে উজ্জীবিত করাই বর্তমান গবেষণার মৌল প্রেরণা।

বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন সংস্কৃতি জীবনকে আত্মকেন্দ্রীক, সংকুচিত, স্থবির করে দেয়। এর প্রভাবমুক্ত হতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও দরকার। উৎসবের উপযোগিতা স্বীকার করে, তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আজ সময়ের দাবি। এতে আপাত-প্রতীয়মান প্রতিবন্ধকতা দূরে সরে যাবে বলে আশা করা যায়। বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসবের শিক্ষা – বৈষম্যহীন এক সমাজ। তা বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের কিছু দায় থেকেই যায়। যে দায়িত্বের সফল বাস্তবায়ন পথ দেখাবে পরবর্তী প্রজন্মকে। যারা হয়ে উঠবে সুস্থ সংস্কৃতিকে বেগবান করার চালিকাশক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ১২

প্রথম অধ্যায় : সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতি ১৬

প্রথম পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতি : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি ২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাঙালি সংস্কৃতি : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় : উৎসব : উদ্ভব ও বিকাশ ৫৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলায় ষড়ঋতুর উৎসব : উৎস সন্ধান ৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঋতুভিত্তিক উৎসবের ঐতিহ্য : বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঋতুভিত্তিক উৎসবের বিবর্তন ১৩২

তৃতীয় অধ্যায় : সর্বজনীন উৎসব ১৪৩

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসবের ভূমিকা ১৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উৎসবে প্রত্যাশা ও আমাদের দায় ১৬৯

উপসংহার ১৮১

গ্রন্থপঞ্জি ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে মানবসমাজে নানা আঙ্গিকে ও নানা ধারায় উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব জাতি-ভেদে সংস্কৃতির সৌহার্দ বিনিময়ের মাধ্যম। উৎসবে সমাজ ও কালের পরিচয় যেমন থাকে, তেমনি থাকে ঘটনানির্ভর তথ্য। উৎসব ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, কখনও লৌকিক আর প্রাসঙ্গিক রীতি-প্রথার, বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয়ও বর্ণনা করে। বাঙালির রয়েছে বহুবৈচিত্র্যময় ঋতুভিত্তিক উৎসব। বাঙালি সংস্কৃতির অগ্রসর ধারায় ঋতুভিত্তিক উৎসবের ভূমিকা গুরুত্ববহ। বৈচিত্র্যপূর্ণ এসব উৎসবের বিবর্তন অনুসন্ধানে এই গবেষণা।

ঋতুভিত্তিক উৎসব বাঙালি সংস্কৃতিতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সর্বজনীন এক আনন্দযোগ। নির্দিষ্ট ঋতু বা দিনের অনুষ্ঠানমালার সমাহারে এসব উৎসব বাঙালির প্রাণে পরিণত হয়। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে যাযাবর মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনে উৎসব ছিল এক আশীর্বাদ, যার আবির্ভাব প্রকৃতি কেন্দ্রীক; শিকারে প্রাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ বা শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে। সেই ধারায় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অনুষঙ্গরূপে ঋতুভিত্তিক উৎসবের বিকাশ। এই উৎসব মানুষকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে, ক্ষুদ্রতা, দীনতা থেকে মুক্ত করে চিত্তশুদ্ধি ঘটায়, নতুন প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তোলে।

বর্ষবরণ থেকে বর্ষবিদায় পর্যন্ত ঋতুভিত্তিক উৎসবের অনেকগুলো এখনও উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে গ্রামে-গঞ্জে। আবার পার্বত্য-নৃগোষ্ঠীর রয়েছে পৃথক সাংস্কৃতিক উৎসব। নাগরিক মানুষও ধর্মীয় উৎসবের বাইরে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ পরিসরে উদ্‌যাপন করে থাকে ঋতু-উৎসব। বৈশাখের প্রথম প্রভাতে রমনার বটমূলে ছায়ানট আয়োজন করে বৈশাখ-বরণ অনুষ্ঠান। বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত মঙ্গল-শোভাযাত্রা আজ বিশ্বের বিস্ময়। এই শোভাযাত্রা ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের। রাজধানী ও এর বাইরের প্রত্যেক জেলা শহরে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ও বৈশাখী মেলাসহ সপ্তাহ জুড়ে চলে উৎসব-উদ্দীপনা।

বছর জুড়ে রাজধানীর রবীন্দ্র সরোবর, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ, শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বর, চারুকলার বকুলতলাসহ নানা স্থানে আয়োজিত উৎসবের মধ্যে আছে বর্ষা-বরণ, শরৎ-উৎসব, নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব, পৌষমেলা ও বসন্ত-উৎসব। এখন বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। বাঙালি ঐতিহ্যের গৌরবময় এই সাংস্কৃতিক চেতনাকে গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে অনুধাবন করে জাতীয় স্বার্থে এই উৎসবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উচিত আমাদের। এখান থেকে বর্তমান গবেষণাকর্মের অনুপ্রেরণা। সেইসঙ্গে ঋতুভিত্তিক উৎসব নিয়ে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানী লেখা বর্তমান সময়ের একটি অপরিহার্য দাবি বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক পুরনো। সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে সহজ সংমিশ্রণ এবং তার লৌকিক রূপের যে বৈচিত্র্যগ্রাহী প্রবণতা, তা বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনারই এক বিশিষ্ট রূপ। এর আদিমতম, ঐতিহাসিক এবং প্রধান দিক ঋতুউৎসব। অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল সকল শক্তির সম্মিলন এবং একাত্মতা এই উৎসবেরই কার্যকারণ।

ইদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমার মতো ধর্মীয় উৎসবে যেমন মানুষ ঘরমুখো হয় – আশ্রয়, অবকাশ, যৌথ জীবনভোগের অকৃত্রিম টানে, তেমনি ছকবাঁধা জীবনে নববর্ষ উদযাপন, নবান্ন উৎসব বা পৌষ সংক্রান্তিতে মানুষ ঘরে ফেরে – জীবনের অনিন্দ্য সুন্দর রূপরস উপভোগে, শেকড়ের টানে, ঋতুউৎসব অবগাহনে। বাঙালির প্রকৃত পরিচয়ে তার ঋতুভিত্তিক উৎসব সার্থক হয় সমষ্টি চেতনায়, নিঃসার্থ শ্রমে, বিনিময়ের উৎকর্ষে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন লেখক বাঙালি সংস্কৃতি বা ঋতুভিত্তিক উৎসব নিয়ে লিখেছেন অনেক; কিন্তু 'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিকি উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' বিষয়ে এখন পর্যন্ত গভীর অনুসন্ধান, বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ বা কোনো গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। নিঃসন্দেহ যে, বৃহৎ পরিসরে ঋতুভিত্তিক উৎসব এবং এর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। যদিও লোকসংস্কৃতিবিদরা কোনো কোনো ঋতু উৎসবের ওপর কিছু বিবরণমূলক কাজ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : ফোকলোর অনুরাগী আতোয়ার রহমান এবং ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন যথাক্রমে *উৎসব* ও *বাংলাদেশের উৎসব* শিরোনামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। পৃথকভাবে আছে শামসুজ্জামান খান এবং খোন্দকার রিয়াজুল হকের *বাংলাদেশের উৎসব* গ্রন্থ। প্রদ্যোত কুমার মাইতির *বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি* গ্রন্থ, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম লিখিত বই *ফোকলোর উৎসব ও লোক সংস্কার* ছাড়াও সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত *লোক-উৎসব : নবান্ন*, মোবারক হোসেন সম্পাদিত *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ-সহ* বেশ কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলোয় বাংলাদেশের প্রধান কিছু উৎসব – ঈদ, মহররম, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, বাংলা নববর্ষের সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক আর নবান্ন উৎসব নিয়ে পর্যালোচনা আছে, আছে উল্লিখিত উৎসবগুলো রূপান্তর ও সংশ্লেষ।

সবগুলো গ্রন্থই নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে সাধারণ তাগিদ মেটায়। এই বাইরে জাতীয়, আঞ্চলিক, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত ঋতুভিত্তিক উৎসব সম্পর্কে অনুপুঙ্খভাবে জানার সুযোগ নেই বললেই চলে। বিশেষ করে বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্ত ঋতুর উৎসবকে প্রতীকী তাৎপর্যে যারা বুঝতে চান, তাদের জন্য উল্লেখিত বইগুলো যথেষ্ট নয়; বলা যায় ঋতুর প্রসঙ্গগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনায় যা পাওয়া যায়, তাতে প্রমাণিত তথ্যের অপর্যাপ্ততা যেমন আছে, তেমনি

এর গ্রহণযোগ্যতা বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ থাকে। তবু গবেষণা সহায়ক হিসেবে উক্ত গ্রন্থ ও অনলাইন বা প্রিন্ট সংস্করণগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, একথা স্বীকার করতে হয়।

সম্প্রতি বেশ কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ঋতুভিত্তিক উৎসবের নানামুখী সম্ভাবনা নিয়ে কিছু উন্মোচনমূলক কাজ করছে। কেউ কেউ এই উৎসবের আর্থসামাজিক উন্নয়ণে এর রাজনীতিকরণের বাইরে স্বপ্রণোদিত বিনোদোনে প্রাধান্য দিতে আন্তরিক। এমনকি উৎসবের ধর্ম-সংলগ্নতা ছাপিয়ে এর সর্বজনীনতার ওপর আলোকপাতে উৎসাহী। কিন্তু সে ভাবনাকে ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে নিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্যবহুল দিক নিদের্শনা এবং গবেষণামূলক উপাত্ত তাদের কাছে অপ্রতুল। তাই সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে নির্ভরযোগ্য লিখিত তথ্যের উপযোগিতা অনস্বীকার্য মনে করি।

অপর দিকে, ঐতিহাসিক কাল থেকেই পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ তাদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টির স্বকীয়তা নিয়ে বাংলাদেশে বাস করছে। তাদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির মধ্যে ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো সুবিস্তৃত, বর্ণিল এবং ঐতিহ্যবাহী। সম্প্রদায় ভেদে ঋতু উৎসবগুলোর উদযাপন রীতি নিজস্ব ভঙ্গি ও রীতি মেনে। নামগুলোও বৈচিত্রময়। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উৎসবগুলো এসেছে আলোচনায়।

এই গবেষণায় আগ্রহী হবার কারণ; প্রজন্মের প্রতি দায় বোধ। সে সূত্রে বলা যায়, বিভিন্ন সময়ে এ দেশ শাসন করতে আসা বিদেশিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বাংলার সংস্কৃতি। বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত সংস্কৃতির আগ্রাসী তাণ্ডবে যেন ধ্বংসন্মুখ বাঙালি কৃষ্টি-স্বকীয়তা। সেই সাথে গণতান্ত্রিক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের অসহায় শিকার মানুষ।

বহুমুখী সংস্কৃতির প্রবল স্রোতকে যেমন রোধ করা প্রায় অসম্ভব, তেমনি শহুরে জীবনে আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে উঠছে মিশ্র-সংস্কৃতি। এই প্রবণতা রুদ্ধ করাও দুরূহ। ফলে প্রজন্মগত দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতা বোধের হতাশা সাধারণ এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তবে আশার কথা, এত কিছুর পরও জাতীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করা এই ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো পর্যায়ক্রমে দেশের মানুষের কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, তা সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কখনোই সম্ভবপর ছিল না। বিচ্ছিন্নতা মুক্তির অমোঘ আহ্বান যেন সুপ্তভাবে প্রোথিত হয়ে আছে বাঙালির মননে। বর্তমান প্রজন্ম যেন তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হয়, একাত্ম হয় এর মূল ধারার সঙ্গে – এমন আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রত্যাশা এই – সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক অসাম্প্রদায়িক ঋতুভিত্তিক উৎসব।

ধর্ম-বর্ণ-জাত-গোত্র ছাপিয়ে মানুষের পরিচয় হোক মানুষ। যে পরিচয়ে ধর্মীয় উৎসবের বাইরে অসাম্প্রদায়িক উৎসবগুলো মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠুক। এই জীবন-দর্শন বাঙালির জাতিগত ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি, তার প্রাণপ্রবাহের ধারা। সংস্কৃতিবান মানুষের এই চেতনাকে উজ্জীবিত করাই বর্তমান গবেষণার মৌল প্রেরণা।

বৃহৎ পরিসরে বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক উৎসবের সৌন্দর্য, উৎসবের বিকাশ, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উৎসবের আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, গণমানুষের সংযোগ, সম্পর্ক চর্চা ও মেলবন্ধন; এই গবেষণার উদ্দেশ্য। কালের বিবর্তনে বাংলার ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো কোন আঙ্গিকে এসে পৌঁছেছে – এর মূল্যায়ন করা এবং একইসঙ্গে উদ্‌যাপিত ঋতুভিত্তিক উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা এই গবেষণাকর্মে তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি।

সময়ের অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পারিবারিক প্রথা আর সামাজিক বন্ধনের বিলুপ্তি ঘটতে দেখা যায়; পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে সংস্কৃতির সুস্পষ্ট অবক্ষয়। বাঙালি সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশে বৈষম্যহীন সমাজ, মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে উৎকর্ষ সাধন, সমৃদ্ধ আগামী প্রজন্ম তৈরি করতে পারাই হবে এই গবেষণার সাফল্য।

প্রথম অধ্যায়
সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতি

বাঙালি ও বাঙালি সংস্কৃতি, এর উৎপত্তি এবং এর হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে যুগে যুগে সমৃদ্ধ চিন্তার অভিব্যক্তি এবং গবেষণা থাকলেও সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, কোনো জাতির সংস্কৃতির মতো দুরূহ বিষয়কে বোঝার জন্য জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। কারণ হিসেবে বলা হয়, কোনো জাতির জীবনে সংস্কৃতির এক একটি উপাদান যেমন স্পষ্ট, তেমনি সব উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি অবয়বটি বেশ জটিল। বাঙালি সংস্কৃতি যেমন বাংলাভাষী সব ধর্মাবলম্বীর, তেমনি বহু জাতিতে বিভক্ত এই সমাজে তা বহু বর্ণিল। এরপরও বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে কোথাও বেশ অভিন্নতা দৃশ্যমান। আর সেটাই বাঙালি সংস্কৃতির স্বকীয়তা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাঙালি হিসেবে তার শারীরিক গঠন, খাদ্যাভ্যাস, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ কাঠামো বা জীবিকা নির্বাহের পন্থা।

কোনো জাতির চেতনা, সচেতনতা, চিন্তা আর উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক অবকাঠামো, ইতিহাস ও জাতীয় জীবনে ঘটনাপ্রবাহের গতি নির্ধারণ করে তার সংস্কৃতি। সেই আলোকে জাতি হিসেবে বাঙালির স্বকীয়তা যেমন আছে, তেমনি আছে অনন্য ঐতিহ্য, সম্ভাবনা। পাশাপাশি তার স্বজাত্যবোধ, পরাধীনতা-মুক্তির সংগ্রামী ইতিহাস, অপরাজেয় মনোবল আর অর্জিত আত্মপরিচয় – বিশেষায়িত করে বাঙালিকে। সবকিছু নিয়ে গঠিত তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। বাংলা ভূখণ্ডে বসবাসকারী বাঙালির সংস্কৃতির বিষয়ে ধারণা পেতে, তার ইতিহাস, উত্তরাধিকার এবং অন্তর্জীবন ও বহির্জগতের গতিধারার বিষয়টি অনুসন্ধানের দাবি রাখেন সমাজতাত্ত্বিকরা।

একটি জাতির ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম ও বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন, উৎসব-পার্বণ, শিল্পকর্ম এবং প্রতিদিনের কাজে লাগে এমন হাতিয়ার ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে শিক্ষা, সামর্থ্য এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে – তাও সংস্কৃতির অঙ্গ। (মুরশিদ, ২০০৬ : ১৩)

তাই, একটি জাতির সংস্কৃতিকে একদিকে যেমন তার আত্মগঠনের অন্যদিকে তার পরিবেশকে পুনর্গঠিত করার ব্যাপার বলে মনে করেন আবুল কাসেম ফজলুল হক। 'জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ') শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> সংস্কৃতি হল সেই শক্তি যা মানুষের চিন্তায় ও কাজে উন্নতিশীলতা, উৎকর্ষমানতা, সৌন্দর্যমানতা, উত্তরণশীলতা, প্রগতিশীলতা ও পূর্ণতা প্রয়াসের মধ্যে বিরাজ করে। সংস্কৃতি হল ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত জীবনে সজ্ঞান ও অজ্ঞান সংস্কার প্রচেষ্টা। (আবুল কাসেম, ২০১৮)

সংস্কৃতির গভীরে প্রগতির তাড়নাও ক্রিয়াশীল থাকে। তাই সংস্কৃতিতে সর্বজনীন কল্যাণবোধ বিরাজমান। জাতির অন্তর্গত চিন্তা, কর্ম, উৎপাদন ও সৃষ্টিকে সেই জাতির সংস্কৃতির বাহন বলে মনে করেন আবুল কাসেম।

তবে, বাঙালি সংস্কৃতির বিষয়ে আলোকপাত করতে বাঙালি জাতির চৌহদ্দি, পরিসীমা এবং ঐতিহাসিক পটভূমি জানা আবশ্যক বলে মনে করেন এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ। বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্যপ্রমাণ সহজলভ্য না হলেও, জনগণের সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারাবাহিকতায় তা খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, উল্লেখ করে শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> উপাদানের স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের বিবরণ দেওয়া বেশ কঠিন। এ ছাড়া, যে-সব উপাদান পাওয়া যায়, বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সেগুলিতে রাজনৈতিক ঘটনারই বর্ণনা বেশি। তবুও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলি ও সাহিত্যিক উপাদান এবং শিলালিপি, তাম্রলিপি, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও ফার্সি উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির আলোকে বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায়। (শামসুদ্দীন, ২০০৭ : ১৪৭)

ইতিহাসের আলোকে প্রাপ্ত সেই তথ্যমতে বলা যায়, বর্তমানে লুপ্ত-প্রায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীগণ ব্যতীত এমন কোনো জাতি নেই যারা বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে। সেই সূত্রে বাঙালিও মিশ্র জাতি- এমন উল্লেখপূর্বক অতুল সুর লিখেছেন :

> বাঙালির আবয়বিক নৃতাত্ত্বিক গঠনে যেসব জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, তারা হচ্ছে অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী ও আগন্তুক দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী ও আর্যভাষাভাষী আলপীয় (বা দিনারিক) জাতিসমূহ। তবে অস্ট্রিক ভাষাভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী ও আলপীয় (বা দিনারিক) রক্তই প্রধান। ... বাঙালী জীবনে অস্ট্রিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বাঙালির লৌকিক জীবনে। বস্তুত 'অস্ট্রিক' জীবনচর্যার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালির জীবন-চর্যার বনিয়াদ। সেই বনিয়াদের ওপরই স্তরীভূত হয়েছে দ্রাবিড় ও আলপীয় উপাদান। (অতুল, ২০০৮ : ৮-৯)

বাঙালির জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকে, এমন কথার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন তথ্য পরিক্রমায়। যুগের সাথে চাহিদা আর নতুন নতুন আবিষ্কার ছাপ রেখে গেছে বাঙালি স্বকীয়তার। অতুল সুর উল্লেখ করেন :

> প্রত্নোপলীয় যুগের প্রথম দিকের মানুষের কঙ্কালাস্থি পাওয়া না গেলেও, মানুষ যে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলা দেশে বসবাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাঙলা দেশের নানাস্থানে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ (tools) থেকে। এগুলো সবই পশ্চিম-ইউরোপে প্রাপ্ত প্রত্নোপলীয় যুগের হাতকুঠারের অনুরূপ। প্রত্নোপলীয় (palaeolithic) যুগের পরিসমাপ্তির পরই সূচনা হয় নবোপলীয় (neolithic) যুগের। এ যুগেই কৃষি ও বয়নের উদ্ভব হয় এবং মানুষ পশুপালন করতে শুরু করে। তবে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা নবোপলীয় যুগে ঘটেছিল, তা হচ্ছে মানুষ তার যাযাবর জীবন পরিহার করে, স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস কতে শুরু করেছিল। ধর্মেরও উদ্ভব ঘটেছিল। ... নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের

> দৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি, যথা ধামা, চুবড়ি, কুলা, ঝাঁপি, বাটনা বাটবার শিল-নোড়া ও শষ্য পেষাইয়ের জন্য যাঁতা ইত্যাদি। এগুলো সবই আজকের বাঙালি নবোপলীয় যুগের 'টেকনোলজি' অনুযায়ী তৈরী করে। তা ছাড়া, নবোপলীয় যুগের শস্যই, আজকের মানুষের প্রধান খাদ্য। (অতুল, ২০০৮ : ৭)

ভূখণ্ড হিসেবে প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিক আলোড়ন ও আবর্তনের ফলে বাংলাদেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে। ভূতত্ত্ববিদগণের হিসাব অনুযায়ী সেটা ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে আর মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে, আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে, এমন তথ্য দেন অতুল সুর (২০০৮ : ৫)। তার আগেই ঘটেছিল জীবজগতে ক্রমবিকাশের এক কর্মকাণ্ড।

উন্নত মানবসমাজ সৃষ্টির আগে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, কিছু অসামঞ্জস্য ছাড়া যুথবদ্ধ জীবন প্রায় একভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতো। সময়ের প্রয়োজনে বহুবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় গড়ে ওঠে বিচিত্র সংস্কৃতি। সেই ধারায়, সংস্কৃতি তার উপাদানগত বৈচিত্র্য নিয়ে, শত-সহস্র বছরে গড়ে তোলে একটি জাতির মূল্যবোধ, মানসিকতা, ঐতিহ্যগত ধারণা। বাঙালি জাতি তার সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিবর্ধিত হলেও, প্রগৈতিহাসিক কিছু অকৃত্রিমতা বহন করে চলেছে যুগে যুগে। আবু জাফর শামসুদ্দীন উল্লেখ করেন :

> অতীতে অলিখিত ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে সমস্ত মানবজাতি অভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তরে অবস্থান করত। সেই আদিম স্তরের কিছু কিছু স্মৃতি এ যুগের সভ্য মানুষও বহন করে চলেছে। ...বিরল ব্যতিক্রমদের বাদ দিলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৃহত্তর মানবজাতির অগ্রগতি অব্যাহত আছে। (আবু জাফর, ১৯৮৮ : ১০)

বিচিত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাঙালি জাতির ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, খাদ্যাভ্যাস, অঙ্গসৌষ্ঠব, স্বভাব, গোষ্ঠীগত ঐক্য বাঙালি সংস্কৃতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই অভিন্ন উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তার ভাষা। গোলাম মুরশিদ বলেন :

> সমাজের ভিন্নতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সব বাঙালির ভাষা। এবং সে কারণে যখন থেকে বাংলা ভাষার উন্মেষ, তখন থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, বাংলা ভাষার জন্মের আগে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রচলিত ছিলো, তাকে আমরা অস্বীকার করছি। বস্তুত অস্বীকার করে নয়, বরং সেই বাংলা-পূর্ব ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে সত্যিকার বাঙালি সংস্কৃতি। (মুরশিদ, ২০০৬ : ১৫)

স্থানীয় বাংলাভাষী গোষ্ঠী বাংলা ভাষার ধারক। তাই যখন থেকে বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালা নামে একটি অঞ্চলের জন্ম হয়, তখন থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা ধরে নেয়া যায় বলে মত গোলাম মুরশিদের। তিনি আরও বলেন, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর আগে সত্যিকার বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করেনি। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে অখণ্ড বঙ্গদেশও গড়ে ওঠেনি। আর এ অঞ্চলের লোকেরা আঠারো শতকের আগে বাঙালি বলেও পরিচিত হননি। (মুরশিদ, ২০০৬ : ২৬)

মানুষ তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেক কিছুর সাথে সন্ধি রচনা করলেও, সব জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিই স্বতন্ত্র – উল্লেখ করে মাসুম কামাল (২০০৯ : ১৬) লিখেছেন, সমাজে অন্তর্গত মানুষ একদিকে যেমন নতুনে বিশ্বাসী, অপরদিকে পুরাতনেরও পিয়াসী। প্রপিতামহের যুগের আসন-বসন ছিন্ন করতে ইচ্ছে জাগে না বলে পুরাতন এবং নতুন অঙ্গাঙ্গি হয়ে নিরবধি কাল ধরে বহমান রয়েছে। স্তরীভূত অসংখ্য বিশ্বাস ও ভাবধারা সমাজে কেন্দ্রিভূত হয়ে আছে এবং এর মধ্য দিয়েই সমাজের সকল কর্মপ্রক্রিয়া একটি সুস্থির দর্শনে রূপ নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন :

> বহুবর্ণের এবং গোত্রের মিলন এবং মিশ্রণের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক যে পরিমণ্ডলের বিকাশ দেখা যায়, তার অভ্যন্তরে বহুবর্ণের এবং গোত্রের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল বলে আদিম সংস্কৃতির বিশেষ কিছু লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায় একই ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থানরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। (মাসুম, ২০০৯ : ১৬)

বাঙালি সংস্কৃতি প্রাচীন। আদিকাল থেকে এ সময় পর্যন্ত এই সংস্কৃতিতে যোগ হয়েছে বিশ্বের নানা জাতি-গোষ্ঠীর প্রভাব। ফলে বাঙালি জাতির সংস্কৃতি বহুমাত্রিকতা লাভ করলেও, বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান সংস্কৃতিকে দিয়েছে স্বকীয়তা।

বাঙালি সংস্কৃতির উৎপত্তি

বাঙালি তার সংস্কৃতির উত্তরাধিকার যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। কালে কালে বাংলা ভূ-ভাগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আগমন ও বিস্তারে বাঙালি সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছে; এর পরেও জাতি হিসেবে বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনা তাকে করেছে বিশিষ্ট।

অতুল সুরের (২০০৮ : ৮২) লেখায় পাই, বৈদিক সংস্কৃতির বাহক নর্ডিক আর্যরা পূর্ব দিকে বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে সে পর্যন্ত ছিল আর্যাবর্ত বা বৈদিক সংস্কৃতির লীলাভূমি। এর বাইরের লোকেদের তারা হীন মনে করত। সেজন্য আর্যাবর্তের কোনো লোক যদি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে বাঙলাদেশে আসত, তাহলে তাকে পুনোষ্টম নামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করে শুদ্ধ হতে হতো। এই বিধান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, বাংলাদেশের লোকেরা তখন সংস্কৃতিবিহীন জাতি ছিল না। তাদেরও স্বকীয় সংস্কৃতি ছিল, স্বকীয় ধর্ম ছিল এবং তাদের দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তীর্থস্থানও ছিল। আর্যদের মধ্যে উদারপন্থী কেউ কেউ সে সকল তীর্থ দর্শন করতে আসত।

তবে, আর্যরা প্রথমে যখনই এসে থাকুন না কেন, বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতার জোরালো প্রভাব পড়তে শুরু করে মৌর্যদের আমলে। তার কারণ হিসেবে গোলাম মুরশিদ (২০০৬ : ৫২) লিখেছেন, মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাংলার দোরগোড়া – মগধে। ফলে, সে-সময় (খৃস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতক) থেকে কৃষি এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় আর্যসভ্যতার সঙ্গে স্থানীয় সভ্যতার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়।

তার পরও, বাংলার জীবন যাপন প্রণালী যে অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র্য, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অতুল সুরের (২০০৮ : ৮২) লেখায়। বাঙালির আহারের একটা বিকশেষ উপাদান-মাছ। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষি লোকেরাও মাছ খেত। কিন্তু বৈদিক আর্যরা মাছ খেত না। তারা খেত মাংস। এমনকি আর্যরা গরুর মাংসও আহার করত। কিন্তু অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেরা গরুকে দেখত শ্রদ্ধার চোখে। এমন আরও পার্থক্য চোখে পড়ে পোশাক পরিধান বা রন্ধন পদ্ধতির বৈচিত্র্যেও। অতুল (২০০৮ : ৮২) লিখেছেন, আসাম, বাংলা, ওড়িশা, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরা ঊর্ধ্বাঙ্গে চাদর ও পায়ে গোড়ালির দিকে খোলা জুতা পরে। তা ছাড়া, তারা রাঁধবার জন্য ব্যবহার করে তেল। এদিকে, উত্তরভারতের লোকেরা উপর-গায়ের জন্য সেলাই করা জামা, পায়ে গোড়ালি-ঢাকা জুতা এবং রাঁধবার জন্য তেলের পরিবর্তে ঘি ব্যবহার করে। বাঙালির আহারে ৬৪ রকমের ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হলেও, এত বেশি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে জানত না উত্তরভারতের লোকেরা। আহার-বিহার ও বস্ত্রের বিভেদ ছাড়া অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে আর্যাবর্তের লোকদের ধর্মীয় সংস্কারেরও পার্থক্য উল্লেখ করেন অতুল সুর :

> অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের অন্তর্ভূক্ত ছিল মৃত্যু-উত্তর জীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষগণের পূজা, কৃষি-সম্পর্কিত অনেক উৎসব, যেমন পৌষপার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি; মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক ব্রত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাউল, দুর্বা, কলা, হরিদ্রা, সুপারি ও পার, নারিকেল, সিঁদুর ও কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার; শিলা, বৃক্ষ ও লিঙ্গপূজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলি আর্য-অন্তর জাতিসমূহের ধর্মীয় আচারের অন্তর্গত। চড়ক, গাজন প্রভৃতি উৎসবও বাঙলাদেশের বৈশিষ্ট্য। এরূপ অনুমান করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বাঙালরি এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রা-আর্য যুগ থেকে প্রচলিত আছে। যোগ-অভ্যাস এর অন্যতম। লিঙ্গরূপী শিবপূজা, মাতৃদেবীর পূজা প্রভৃতি বাঙলাদেশে প্রাক্-আর্য কাল থেকেই চলে এসেছে। তন্ত্রধর্মের উদ্ভবও বাংলাদেশেই হয়েছিল। (অতুল, ২০০৮ : ৮৩)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন অতুল (২০০৮ : ৮৩)। যেমন – হস্তবিদ্যা, রেশমবয়ন, সাংখ্যদর্শন, প্রেক্ষাগৃহ (বা রঙ্গালয়), নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দেওয়া, আলপনা অঙ্কন প্রভৃতিও বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব অবদান।

এ তো গেল সংস্কৃতির দৃশ্যমান অংশবিশেষ। বাঙালি সংস্কৃতির ধর্ম বা আচারকেন্দ্রীক আনুষ্ঠানিকতার উদ্ভব বিষয়ে ফিরে দেখা যাক ইতিহাসের পাতায়। প্রাচীন বাঙলায় ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল মৌর্যযুগে। তবে ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণরা বাংলায় আসতে শুরু করে গুপ্তযুগে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বঙ্গ অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের ধর্ম এবং ধর্মীয় লোকাচার অনুসৃত হতো। যা পরবর্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে। এর উদাহরণ তুলে ধরে অতুল সুর লিখেছেন :

> মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, 'টটেম'- এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম,নদী, বৃক্ষ,অরণ্য,পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি

> বা ভূত-প্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল। কালের বিবর্তনে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান, যেমন দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটুপূজা, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় এবং পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও নেওয়া হয়েছিল আটকৌড়ে, শুভচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন, অলক্ষ্মীর পূজা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অবদান। এ ছাড়া, নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজা পূজা, বৃক্ষের পূজা, বৃষকাষ্ঠ, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা ও আম্বুবাচী, অরন্ধন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক-আর্য-জাতি সমূহের কাছ থেকে নেওয়া। (অতুল, ২০০৮ : ৮৪-৮৫)

উপর্যুক্ত উপাদানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি। অতুল সুর তাঁর *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* (২০০৮ : ৮৫, ৯০-৯৪, ৯৬-৯৮) গ্রন্থে আরও যুক্ত করেন, এই লৌকিক জীবনচর্যায় আছে বিয়ের মতো আনুষ্ঠানিকতা। জামাই ষষ্ঠী ও ভাইফোঁটার মতো লৌকিক উৎসব, সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে তার নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, পৌষপার্বণ ও অরন্ধন (যে দিন মেয়েরা তাদের রন্ধনক্রিয়ার দক্ষতা প্রদর্শন করত)।

বাংলার গৌরবময় সংস্কৃতির নিদর্শনে আরও আছে – কার্পাস বা রেশম বস্ত্র বয়ন, মৃৎশিল্প তৈরি, পৌরাণিক কাহিনি সংবলিত পোড়া মাটির মন্দির সজ্জার মতো কারু ও দ্বারুশিল্প। আলপনা আঁকা বা নকশিকাঁথার মতো লৌকিক শিল্পে অনুরণিত হয়েছে বাঙালির প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দময় জীবনচর্চার সংস্কৃতি। ছিল ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বা সংস্কার মেনে চলার প্রবণতা, বশীকরণ, উচ্চাটন, মারন ইত্যাদিতে বিশ্বাস।

লোকসংস্কৃতির এই ধারাগুলোকে বিশেষায়িত করে আমেরিকান ফোকলোরবিদ Archer Taylor মনে করেন, এই ঐতিহ্য মৌখিক উপাদানও হতে পারে, যা ঐতিহ্যানুযায়ী আচারকেন্দ্রিক পন্থায় পরিচালিত হয়। লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় তিনি উল্লেখ করেন :

> 'Folklor' is the material that is handed on by tradition, either by word of month or by custom and practice. It may be folksongs, folktales, riddles, proverbs or other materials preserved in wards. (Taylor, 1948 : 216)

বাঙালির লৌকিক জীবনকে প্রাণস্পন্দনে ভরে তোলে তার নিজস্ব খেলাধুলা; কাবাডি, কুস্তি, লাঠিখেলা, সাঁতার, নৌকাবাইচ, পাশা, কড়ি, গুটি খেলা, বাঘবন্দি, বউ-বাসন্তী, মোগল পাঠান, দশ-পঁচিশ, লুকোচুরি, কানামাছি, এক্কা-দোক্কা ইত্যাদি। ছিল ঘুমপাড়ানি গান, বিয়ের গান। রাতের ঘুম হরণ করা পালা গান, পাঁচালি গান, কবিগান, তরজা গান, ঝুমুর, ধামালী গান বা যাত্রার মতো আরও মনোহর বিষয় বাঙালি সংস্কৃতির পরিচায়ক।

কালের বিবর্তনে এই লোক সংস্কৃতির অনেক কিছুই লুপ্ত, আর কিছু আধুনিকীকরণে বিবর্তিত হয়ে এখন সে পরিবেশ আর রেশ হারিয়ে গেলেও, এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাঙালি – এ কথা নিঃসন্দেহ।

বাঙালি সংস্কৃতির উদ্ভবকাল নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোনো কোনো লেখক বাঙালি সংস্কৃতিকে খুব পুরনো, এমনকি, পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন বলে দাবি করলেও, গোলাম মুরশিদ মনে করেন; বাঙালি সংস্কৃতি আদৌ অতো পুরনো নয়। তাঁর মতে :

> সত্যি বলতে কি, বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছরও হয়েছে কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে বলছি এ জন্যে যে, এক দিনে – এমন কি এক শতাব্দীতে – একটা ভাষা তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে না। এ কথা মেনে নিলে নীহাররঞ্জন রায় যাকে বাঙ্গালীর ইতিহাস বলেছেন, তাকে বাঙালির ইতিহাস অথবা বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস বলা সঙ্গত নয়। কারণ, তিনি যখনকার ইতিহাস লিখেছেন, তখনও এই অঞ্চলের ভাষা তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে রীতিমত বাংলা হয়ে ওঠেনি। এমন কি, এই এলাকাও তখন এক অখণ্ড বঙ্গভূমিতে পরিণত হয়নি। তখনও বঙ্গদেশ বিভক্ত ছিলো গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সমতট, সুহ্ম, বঙ্গ ইত্যাদি নানা ভাগে। বস্তুত, এই ছোট ছোট অঞ্চল মিলে একটি অখণ্ড বঙ্গভূমি পাল-বর্মন-সেন রাজাদের সময়ে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং সেই যুগে যাঁরা বাস করতেন তাঁদেরও বাঙালি বলার কোনো যুক্তি নেই। (মুরশিদ, ২০০৬ :১৬)

গোলাম মুরশিদকে সমর্থন করেই বলা যায়, বাংলা-পূর্ব অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক বা নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, বরং তাকে অবলম্বন করে নতুন উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত। গোলাম মুরশিদ আরও যুক্তি দেখান, সেই প্রাচীন কালে যে-আদিবাসীরা এ অঞ্চলে বাস করতেন, তাঁদের রক্ত এখনও আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। প্রথমে রাঢ়ে এবং তারপর বরেন্দ্রীতে আর্যরা এসে বসতী স্থাপন করেছিলেন খৃস্টের জন্মেরও আগে। কিন্তু তারও আগে এ অঞ্চলে কেবল অস্ট্রিক শ্রেণির লোকেরাই বাস করতেন না, ছিল দ্রাবিড়, ভোট-চীনারাও। এই ভিন্ন ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোকেদের রক্তের এবং ভাষার প্রভূত মিশ্রণ হয়েছিল। তার সঙ্গে মিশেছে আর্য, সেমিটিক, কেন্দ্রীয় এশিয়ার রক্ত। ইউরোপীয় রক্তও যে একেবারে মেশেনি, তা নয় (মুরশিদ, ২০১৬ : ১৬)। আজকের বাঙালির দেহে যেমন এই বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন বহমান, তেমনি আজকের বাংলা ভাষাতে সকল জনগোষ্ঠীর ভাষার উপাদান বর্তমান। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন :

> আর্যরা এ অঞ্চলে এসে যখন স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন, তখন তাঁরা শাসক ছিলেন না। কিন্তু পরে তাঁরাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঙ্গদেশ শাসন করেন। এবং তাঁদের মুখের ভাষাকেই এই অঞ্চলের

> লোকেরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। ...আর্যরা বঙ্গদেশে আসার প্রায় পনেরো শো বছর পরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় বলে অনুমান করা যায়। অবশ্য তখনো বাংলার উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ী লোকেরা এ ভাষাকে গ্রহণ করেননি। ...কিন্তু সমতল ভূমির লোকেরা বাংলাকে মেনে নিয়েছেন। এ থেকে সমতল ভূমির লোকেদের সমন্বয়ী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে মুসলমানরা যখন এসেছেন, তখনও তাঁরা নবাগতদের ভাষা দিয়ে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। (মুরশিদ, ২০০৬ : ১৬-১৭)

বস্তুগত সংস্কৃতি (জীবনযাপন প্রনালী) আর মানস সংস্কৃতি (সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীতে মানসিক প্রবৃত্তির প্রকাশ) মিলিয়ে কোনো দেশের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে বলে মনে করেন আনিসুজ্জামান। তাঁর মতে, বাংলার আদি জনপ্রবাহে প্রাক আর্য নরগোষ্ঠী, পরবর্তীতে আর্য জনগোষ্ঠীর গভীর প্রভাব ছিলো। পরে মুসলমানরা যখন এদেশ জয় করলেন, তখন তাঁরা যে সংস্কৃতি নিয়ে এলেন, তাতে তুর্কি-আরব-ইরান-মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশেল ছিল। সেখান থেকে অনেক কিছু এল বাঙালি সংস্কৃতিতে। তারপর এদেশে যখন ইউরোপীয়রা এলেন, তখন তাঁরা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ ঘটালেন আরও একটি সংস্কৃতির। এভাবে বাংলার সংস্কৃতিতে অনেক সংস্কৃতি-প্রবাহের দান এসে মিশেছে। আর নানা উৎসের দানে আমাদের সংস্কৃতি হয়েছে পুষ্ট। (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ৫০)

বাংলা ভাষা গড়ে ওঠার আগেকার সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের লোকেরা বর্জন করতে পারেননি; সেই প্রভাব উল্লেখ করে গোলাম মুরশিদ যোগ করেন, বাংলা-পূর্ব কালের লোকেরা যে-মাছভাত খেতেন, বাঙালি তা এখনও ছাড়তে পারেনি। পুরনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্যরা নতুন কৃষি এবং খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন; মোগল-পাঠনি-তুর্কি-আরবরাও ভিন্ন ধরনের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে এসেছিলেন। এমনকি, পর্তুগিজ এবং ইংরেজরাও অনেক নতুন খাবার নিয়ে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও মাছ-ভাতের প্রতি বাঙালিদের আকর্ষণ এবং আনুগত্য আগের মতোই আছে। এমনকি, রান্নার ধরনেও রয়ে গেছে সেই ধারা। এমনকি, দ্বাদশ শতাব্দীর উদ্ভট শ্লোকে বাঙালির যে খাবার বর্ণনা, তার সঙ্গে এ যুগের বাঙালির খাবারে মিল যেমন আছে, তেমনি প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে যেভাবে দোচালা বাড়ি তৈরি করা হতো শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই রীতিই বজায় রয়েছে। (মুরশিদ, ২০০৬ : ১৭)

ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুলতান গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহের সময়ে বাংলাদেশে ব্যবসা করার সনদ পান-ওলন্দাজ, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসি এবং পর্তুগিজ বণিকরা। পর্তুগিজদের অনেকে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার কারণে বাংলা ভাষায় তাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেননি পর্তুগিজসহ অন্য বণিকরা। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইংরেজরাই খুঁটি গাড়েন বঙ্গদেশে। ইংরেজরা তাদের সাথে পণ্য এবং ইউরোপীয় ভাবধারার সাথে আরও নিয়ে আসে ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য। যা দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় বাংলা ভাষা।

প্রাচীন সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর গত এক হাজার বছরে বাঙালি সংস্কৃতির অবয়ব গড়ে উঠেছে। তার কাঠামো নতুন, কিন্তু তা দাঁড়িয়ে আছে বাংলা-পূর্ব ঐতিহ্যের ওপরে। যে-ভাষার ওপর ভিত্তি করে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেই বাংলা ভাষা কখন জন্ম লাভ করে, তা বিবেচনা করে দেখার চেষ্টা করেছেন গোলাম মুরশিদ। চর্যাপদের মধ্যে বাংলা ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিলেও, তখনও বাংলা ভাষার অনেক উপাদান ওড়িয়া-অহমিয়ার সঙ্গে অভিন্ন ছিল। গোলাম মুরশিদ যুক্তি দেখান, চর্যাপদেরও পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব। চর্যার বয়স এক হাজার বছর হয়ে থাকলে, বাংলা ভাষার বয়স এখনো এক হাজার বছর হয়নি। সুতরাং বাংলা ভাষাকে বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে অভিন্ন উপাদান বলে গণ্য করলে, বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসকে এক হাজার বছরের চেয়ে কম বয়সী বলে মনে করাই সঙ্গত বলে মনে করেন মুরশিদ।

বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে বাংলা অঞ্চলের উৎপত্তি

'বঙ্গের অধিবাসী' এই অর্থে 'বাঙ্গাল' শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ করা যায় চোদ্দ-পনেরো শতকে – এমন তথ্যের অবতারণা করে গোলাম মুরশিদ বলেন :

> কেবল শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পদবী 'শাহে বাঙ্গালিয়ান' ছিলো না, নূর কুতুবে আলম নামে একজন বিখ্যাত দরবেশও "আলম বাঙ্গালি" বলে পরিচিত ছিলেন। এই দরবেশ অবশ্য দক্ষিণবঙ্গে বাস করতেন না। তাঁর কবরও পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত। তা সত্ত্বেও তাঁকে বাঙালি কেন বলা হতো, জানা যায় না। (মুরশিদ, ২০০৬ : ২২)

এ রকমের দু-একটি ব্যতিক্রম থাকলেও, সাধারণ লোক তখনও বাঙালি নামে পরিচিত হননি। মুরশিদ (২০০৬ :২২) লিখেছেন, ষোলো শতকের শেষ দিকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে 'বাঙ্গাল' শব্দটা ব্যবহার করেছেন এভাবে :

> কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই

কিন্তু মুরশিদ মনে করেন, কবি 'বাঙ্গাল' শব্দের প্রয়োগ করেছেন দক্ষিণ-অথবা পূর্ববাংলার লোক অর্থে, বৃহত্তর বঙ্গের অধিবাসী অর্থে নয়।

এ কথার সূত্র ধরে 'বাঙ্গালি' শব্দের আরও কিছু ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন মুরশিদ (২০০৬ : ২২)। ষোলো শতকে বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবতে* পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হিশেবে 'বাঙ্গাল' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এর প্রায় দু শতাব্দী পরে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর গোটা বাংলার অধিবাসী বোঝাতে প্রথম 'বাঙ্গালি' শব্দ প্রয়োগ করেছেন :

> বাঙ্গালিরা কত ভাল পশ্চিমার ঘরে

অন্যত্র কবি ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গলের* চরিত্র ভবানন্দ মজুমদারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'বাঙ্গালি বামন'।

তপন রায়চৌধুরীর মতে, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের আগে বঙ্গের অধিবাসী অর্থে বাঙ্গালি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু আহমদ শরীফ দাবি করেছেন যে, ১৫৮৪ সালের দিকে লেখা সৈয়দ সুলতানের রচনায় 'বাঙ্গালী' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় :

> কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
> না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন!!

এই উদ্ধৃতি প্রক্ষিপ্ত কি না, অথবা আহমদ শরীফ যে পুথি ব্যবহার করেছেন, তা কত সালে লিপীকৃত, এর উল্লেখ পাওয়া না গেলেও, বানান এবং ভাষা থেকে এ পুথিকে অত প্রাচীন বলে মনে করেন না গোলাম মুরশিদ।

আলোচনাসূত্রে বলা যায়, সমাজতাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতিকে জটিল একটি ধারণা মনে করলেও, এ কথা স্বীকার করেন যে, মানুষের বিশ্বাস, দৃশ্যমান আচরণ এবং জ্ঞানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি। এর সাথে যুক্ত হয় তার ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, উৎসব ও পার্বণ, শিল্পকর্ম এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য। সংস্কৃতি একমাত্রিক নয়। এর স্বরূপ চলমান, সময়ের সাথে বিবর্তিত। জন্ম থেকে শুরু করে সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব শিক্ষা, সামর্থ্য এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে, তাও সংস্কৃতির অঙ্গ। যুগের আবহে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমানে যে উৎকর্ষ বা অবদমন – সবই তার সংস্কৃতির ফল। আর বাঙালি সংস্কৃতি অনুভবযোগ্য এক বিষয়; একে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। একটা সময়ে বাঙালি গ্রামভিত্তিক সমাজ ছিল মন্থর। সময়ের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবার প্রথার ধরণ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ, দেশবিভাগসহ নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মতই ধীরলয়ে বিবর্তিত হয় বাঙালি সংস্কৃতি। তারপরও বলা যায় – সমাজব্যবস্থা, পরিপার্শ্বের প্রভাব, ধর্ম, রীতি-প্রথা আর বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠা সংস্কার, মানবচিন্তার সচেতন যুক্তিবাদ – সবকিছু নিয়ে বাঙালি জাতির বাঙালি সংস্কৃতি। সংস্কার আর যুক্তির মিলিত বিন্দুতে যে সমাজবোধ, জাতিভেদে তা বৈচিত্রময়; আর বাঙালি সংস্কৃতি সেই বৈচিত্র্যেরই একটি অংশ। বহু বিভক্ত রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক সমাজে সংস্কৃতি খণ্ডিত বা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করলেও, সব মিলিয়ে বাঙালি সমাজ অভিন্ন, বাঙালি সংস্কৃতি সব বাঙালির।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতি : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে প্রাণের তাগিদে জীবনমাত্রই বিকাশমান। মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, চিন্তা-কর্মে আচরণে জীবনের দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য অভিব্যক্তি এবং সভ্যতার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষের মধ্যে নিহিত থাকে নানা রূপবদলের ইতিহাস। সেখানে মানবসৃষ্ট ভাব-জগৎ, তার জীবনাচরণ পদ্ধতি এবং পরিপার্শ্ব নিয়ে তার নিজস্বতা। বলা হয়ে থাকে, স্মরণাতীত কাল থেকে সেই নিজস্ব জনজীবনকে কেন্দ্র করে মানবসভ্যতার সমান্তরালে গড়ে উঠেছে মানুষের সংস্কৃতি এবং তা বিকশিত হয়েছে নানা বৈচিত্র্যে। প্রত্যেক সভ্য জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে বিশেষত্ব।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা ঠিক কবে থেকে, এ নিয়ে গবেষণা চলছে যুগ যুগ ধরে। পর্যবেক্ষণলব্ধ সেসব তথ্য ও উপাত্ত থেকে, প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শন ও ঐতিহ্য থেকে, উত্তরাধীকারীদের ভাষ্য ও লিখিত দলিল থেকে সংস্কৃতি ও এর রূপান্তর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া গেছে। তবে, আজ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি যে, সংস্কৃতির জন্ম কখন ও কীভাবে, কিংবা সংস্কৃতি কি এবং কি নয়!

শাহ আবদুল হান্নান (২০০৪ : ১০৯) মনে করেন, সংস্কৃতি নিয়ে নানা বিতর্ক বৃদ্ধি পায় মার্কসিজমের উত্থানের পর। সে সময় Art for life sake নামে নতুন একটি দর্শন এলে, কমিউনিস্টরা বিতর্ক তোলেন, Art for art sake না Art for life sake এই নিয়ে। এটা করতে গিয়ে তারা বাড়াবাড়িও করেন উল্লেখ করে আবদুল হান্নান লিখেছেন, আর্ট সেখানে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃতির ভেতর যে একটা সৌন্দর্য আবশ্যক, সেটা তারা উপেক্ষা করেন বা বিশেষায়িত করতে ব্যর্থ হন। অপর দিকে 'আর্ট ফর আর্ট সেক'-এর পক্ষে যারা, তারা এ ইস্যুকে রাজনীতিকরণ করে বলেন, আর্ট আর্টের জন্য। অর্থাৎ এর মধ্যে সৌন্দর্য থাকতে হবে, সৌন্দর্য চেতনা থাকতে হবে। জীবনের বিভিন্ন দিককে যা কিছুই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, তাই সাহিত্যকলায় 'সংস্কৃতি' হিসেবে স্বীকৃত। হান্নান আরও যোগ করেন :

> সংস্কৃতির প্রশ্নে যদি আমরা সুবিচার করতে চাই তাহলে সেখানে আর্ট বা সংস্কৃতিতে দুটো দিকই থাকতে হবে। জীবনের জন্য তা প্রয়োজনীয় হতে হবে। জীবনের জন্যেই হবে। জীবন কে বাদ দিয়ে নয়। জীবনকেই সার্ভ করতে হবে। এটাই সত্য কথা। অন্যদিকে এটাও সত্য যে যা কিছু সুন্দর নয় তা আর্ট বা সংস্কৃতি হবে না, তা জীবনে জন্য হলেও। কাজেই দুটো উপাদানই প্রয়োজন। দুটোই সত্য। এই বিতর্কেও পরিসমাপ্তির প্রয়োজন রয়েছে। (হান্নান, ২০০৪ : ১০৯)

বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের চিন্তা, কর্ম, সৃষ্টি আর সজ্ঞান প্রয়াসে মিশে থাকা জটিল এক সামগ্রিকতার নাম সংস্কৃতি। সংকল্প আর সংঘশক্তির সাধনায় যার উন্নততর প্রকাশ বলে মনে করেন বিজ্ঞজনেরা। সংস্কৃতি মূলত বিমূর্ত এক ধারণাবোধ।

মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন, সামাজিক পরিবেশের উন্নতি বিধানের নিয়ন্ত্রক বা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির নির্ধারক এই সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা নিরূপণে নানা যুক্তি, মতপার্থক্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আছে, তেমনি এর স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তকেরা নানা মত ও পথের সন্ধান দিয়ে সংস্কৃতির ধারণাকে বিকশিত করেছেন। তাঁদের মতে, এর তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য মানুষের অন্তর্জীবনের সাধনা প্রয়োজন।

সংস্কৃতি : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী চিন্তার উদ্ভব, বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) থেকেই। ইংরেজি Culture শব্দের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম 'অনুশীলন' শব্দটি ব্যবহার করেন, এমন তথ্য দেন আবুল কাসেম ফজলুল হক :

> একশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের সঙ্গে ইংরেজি কালচার-এর ধারণার সংশ্লেষণ ঘটিয়ে একটি নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন অনুশীলন। তৎকালে তিনি লক্ষ করেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মসাধনার মধ্য দিয়ে জীবনে ভালো হওয়ার ও ভালো করার জন্য যে চেষ্টা করে, ইউরোপের মানুষ কালচার-এর সাধনা দ্বারা মোটামুটি তাই করে। কোনো কোনো দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে পার্থক্যও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ধর্মের ধারণার সঙ্গে কালচার-এর ধারণার সংশ্লেষণ ঘটাবার প্রয়োজন অনুভব করে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্ব নামে যে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গভীর হয়েছিলো। এ তত্ত্ব আজও মনুষ্যত্ব-সচেতন ও মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী মানুষদের চিত্তকে নাড়া দেয়, অনুভূতিকে সতেজ করে, চেতনাকে জাগ্রত ও সতর্ক করে, জীবনে নতুন কর্মের স্পৃহা জাগায়। অনুশীলনতত্ত্বকে সংস্কৃতিতত্ত্বও বলা যায়। (আবুল কাসেম, ২০১৫ : ১৬-১৭)

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে কালচার অর্থে অনুশীলন শব্দটিই চালু ছিল। পরে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'কৃষ্টি' শব্দটির প্রবর্তন করেন; এমন তথ্য পাওয়া যায় উল্লিখিত লেখকের *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (২০১৬) সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা অংশে। সেখানে আবুল কাসেম সংস্কৃতি শব্দের প্রচলন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, ১৯২০ এর দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'কৃষ্টি' শব্দকে পাশে রেখে 'সংস্কৃতি' শব্দটি প্রবর্তিত হয়। সমঅর্থে কর্ষণ, চর্চা, শিক্ষা, বৈদগ্ধ বা চারিত্র শব্দের প্রয়োগ হয়েছিল। এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তমদ্দুন মজলিশও সংস্কৃতি অর্থে 'তমদ্দুন' শব্দটি চালু করতে চাইলে, মর্মগত ধারণার বলিষ্ঠতায় টিকে যায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি।

সংস্কৃতি চেতনার বা মানসিকতার ব্যাপার, যার একটি বস্তু ভিত্তি আছে এবং বস্তুর প্রভাবেই তা অস্তিমান, জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল; এমন মত দিয়ে আবুল কাসেম বলেন (২০১৬ : ৬১-৬২), মানুষের সকল চিন্তার, আচরণের ও কর্মের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতির প্রকাশ। তিনি এর পরিশীলিত ব্যাখ্যা দেন এভাবে :

> সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সংস্কার করার, পরিমার্জন করার, অনুশীলন ও পরিশীলন করার, চেষ্টার ও চর্চার মাধ্যমে সুন্দর ও ভালো হওয়ার ও করার, মহৎ হওয়ার ও করার, প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর হয়ে ওঠার ও করে তোলার মানসিকতার চেষ্টার রূপ-স্বরূপকে। (আবুল কাসেম, ২০১৬ : ৬১-৬২)

জীবনধারণের ও উপভোগের প্রয়াপ্রসূত মানবক্রিয়া মাত্রই সংস্কৃতি; যেখানে জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনাচরণ মুখ্য– এমন মত আহমদ শরীফের (২০০৬ :২২)। ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে জীবনের সার্বক্ষণিক অভিব্যক্তি বা মনুষ্যজীবনের অর্জিত স্বভাবের সার্বিক অভিব্যক্তিকেই সংস্কৃতি বলেছেন তিনি। তবে সূক্ষ্ম, পরিস্রুত ও সুন্দর-শোভন অভিব্যক্তিকে বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলে বিশেষায়িত করে আহমদ শরীফ যোগ করেন, মানব সংস্কৃতির অবয়বে আদিম সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও অনুকরণীয় সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন :

> ভাব-চিন্তা-কৃতির যে অংশ হিতকর ও গৌরবের তা-ই যেমন ঐতিহ্য বলে খ্যাত, তেমনি জীবনচর্যার যে অংশ সুন্দর-শোভন ও কল্যাণকর তা-ই সংস্কৃতি, বাদবাকি কৃতি বা আচারমাত্র। এ তৌলে যাঁরা মাপেন তাঁদের কাছে জীবনচর্যার কিংবা জীবনযাত্রার সবটাই সংস্কৃতি নয়। তাঁদের সংজ্ঞায় নগরবিহীন সভ্যতাও নেই। আমাদের ধারণায় সংস্কৃতির উৎকর্ষে সভ্যতার উদ্ভব। সংস্কৃতির বস্তুগত ও মানসসম্ভূত অবদানপুষ্ট জীবনপদ্ধতির সার্বিক ও সামগ্রিক উত্তরাধিকারই সভ্যতা। (আহমদ শরীফ, ২০০৬ : ২২)

সংস্কৃতি শব্দকে 'প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ' বলে ধারণা করেন অনেকে। এর সাথে সহমত প্রকাশ করে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন :

> বৈদিক যুগে সংস্কৃতি বলতে বোঝাত যজ্ঞ প্রভৃতির প্রস্তুতি। নৃত্য গীত কাব্য ইত্যাদি নয়। 'ব্রাহ্মণ' রচনার যুগে সংস্কৃতি বলতে বোঝাত গঠন। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতির অর্থ দেবতার কাছে উৎসর্গ। পরবর্তীকালে শব্দটি অপ্রচলিত হয়ে যায়। হঠাৎ এই বিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজি কালচার শব্দের পারিভাষিক শব্দরূপে এর নবজন্ম ঘটে। (২০১৬ : ২১)

তিনি আরও বলেন, যা কিছু মানবিক বা প্রাকৃতিক – তার সবটাই সংস্কৃতির অন্তর্গত। এমনকি ধর্মও এর বাইরে নয়।

উপরোক্ত কথার মিল পাওয়া যায় মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কাছে। তিনি তাঁর *সংস্কৃতি-কথা* গ্রন্থে ধর্মকে সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচারকে শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম বলে মত দেন। সেই সাথে এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

> কাল্‌চার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। ... কাল্‌চার একটা ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। ব্যক্তির ভেতরের 'আমি'কে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ। ... সত্যকে ভালবাসা, সৌন্দর্য্যকে ভালবাসা, ভালবাসাকে ভালবাসা – বিনা লাভের আশায় ভালবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালবাসা – এরি নাম সংস্কৃতি। ... সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ – নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা। (মোতাহের, ২০১৬ : ১-৪)

মোতাহের হোসেন সংস্কৃতিকে অহমিকা মুক্তির উপায় বলে বিশেষায়িত করে, একে মূল্যবোধের নির্ধারক মনে করেন। অনেকে মনে করেন 'সংস্কার মুক্তি-ই সংস্কৃতি'। মোতাহের এই বিভ্রান্তি সংশোধন প্রসঙ্গে বলেন, সংস্কার মুক্তি সংস্কৃতির একটি শর্ত, তবে অনিবার্য শর্ত হল মূল্যবোধ। আরও বিশদভাবে তিনি সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

> সংস্কৃতি মানে সুন্দর ভাবে, বিচিত্র ভাবে, মহৎ ভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; ... বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা, জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীর ভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা। (মোতাহের, ২০১৬ : ১৪)

বাস্তব জীবনে মানুষের সমুদয় বাহ্যিক ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবনযাত্রার আর্থিক ও সামাজিক রূপ, আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, শিল্পসৃষ্টি – সবকিছুই সংস্কৃতির স্বরূপ।

ব্রিটিশ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার সংস্কৃতিকে মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বিশ্বের যাবতীয় উপাদানকে অজৈব, জৈব ও অতিজৈব এই তিন ভাগে শ্রেণিকরণ করেন। যার উল্লেখ পাওয়া যায় বুলবন ওসমানের *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব* গ্রন্থে (২০০১ : ১৪)। বিশ্বের সব প্রাণহীন বস্তু যা মানুষের তৈরি নয় অর্থাৎ ভূ-গোলকের পিণ্ড রয়েছে অজৈব বা পদার্থ-এর আওতায়। প্রাণীজগৎ ও মানুষ নিয়ে জৈব জগৎ। তৃতীয় ভাগে পড়ছে সংস্কৃতি বা মানুষের নিজের সৃষ্ট সব কিছু, যাকে স্পেন্সার অতিজৈব পরিবেশ বলে বিশেষায়িত করেছেন। তাই বলা যায়, মানুষের সৃষ্টিশীলতার দৃশ্যমান বা অনুভব করা অংশটুকু তার সংস্কৃতি। এই সৃষ্টিশক্তির জন্যই মানুষ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, এ জন্যই মানুষ প্রাণিজগতে বিশেষ!

স্পেন্সারের এই শ্রেণিকরণের সাথে সাথে সংস্কৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কিছু ধারণার সাথেও বুলবন ওসমান পরিচয় করিয়ে দেন (২০০১ : ১৪-১৫) :

> রাশিয়ান চিন্তাবিদ ট. ভি. ডি. রবার্টির মতে সংস্কৃতি হলো অনুমানগত ও ফলিত সব চিন্তাধারা ও জ্ঞানের সমষ্টি।
>
> গ্রাহাম ওয়ালেসের মতে সংস্কৃতি হল, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও বস্তুর সমষ্টি, এক কথায় সামাজিক ঐতিহ্য।
>
> বি. মালিনওস্কির মতে সংস্কৃতি হল, 'মানুষের ক্রমবর্ধমান সৃষ্টির সমষ্টি।'
>
> জন লুই গিলিন এবং জন ফিলিপ গিলিন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ রূপে মানসিক ব্যাপার বলে গণ্য করেছেন। সাংস্কৃতিক বস্তু হলো মানুষের সংস্কৃতির ফল।
>
> সামনার অবশ্য সংস্কৃতিকে ব্যাপক ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে লোক জীবনধারা, শুভ-অশুভ বোধ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সমষ্টি হল সংস্কৃতি।

রবার্ট রেডফিল্ড বলেছেন সংস্কৃতি হল সমগ্রভাবে 'সমঝোতাসমূহের অংশ।'

র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের মতে সংস্কৃতি মূলতই একটি নিয়ম-কানুনের ধারা।

ট্যালকট পার্সন্স এবং তাঁর সহযোগীদের মতে, যাঁরা থিওরি অব এ্যাকশানের প্রবক্তা, 'সাংস্কৃতিক বস্তুসমূহ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-ধারণার প্রতীকগত উপাদান বা বিশ্বাসসমূহ, প্রকাশধর্মী প্রতীকসমূহ বা মূল্যবোধের ধারা।'

স্যার ই. বি. টাইলরের মতে, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস এবং অন্যান্য সব সম্ভাবনা যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে আহরণ করে তা-ই সংস্কৃতি।'

মার্কসের মতে, সংস্কৃতি হল সুপারস্ট্রাকচার বা অতি কাঠামো। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক নির্ধারণ করে সমাজের মূল চরিত্র। তার ওপর তৈরি হয় সংস্কৃতি বা শিল্প-সাহিত্য, রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম ইত্যাদি। মার্কস এই অতি কাঠামোকেই সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেছেন।

অপর দিকে, 'Culture is the man-made part of environment' সংস্কৃতির এমন সংজ্ঞা দেন আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী Alfred A. Konpf (1966 : 4)।

মানুষের ক্রমবর্ধমান সৃষ্টি এবং তার মূল্যবোধের অনুশীলন যখন জীবনে শুভ-অশুভের পার্থক্য করতে শেখায়, তখন তা হয়ে ওঠে সংস্কৃতি। আর সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা মানুষেরা হয়ে ওঠে সংস্কৃতিবান মানুষ।

গোপাল হালদার তাঁর *বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ* (১৯৭৫ : ১০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে 'কৃতি' বা সৃষ্টির সহায়ে মানুষ 'মানুষ' হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়েছে – তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির অর্থ তাঁর কাছে সৃষ্টি :

> সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (sciences) ও সমস্ত সৃষ্টিসম্পদ (arts); অর্থাৎ যা আমরা জেনেছি (প্রকৃতির নিয়ম-নীতি প্রভৃতি), যা আমরা করেছি (যন্ত্র-শিল্প, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান; মানসিক প্রয়াস, চিন্তা-ভাবনা, নৃত্য, গীত, চিত্র, কাব্য প্রভৃতি)। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলেকা [এলাকা]; আর শিল্প বলতে বোঝায় বাস্তব সৃষ্টি আর মানস-সৃষ্টি দুই-ই, কারণ দুই-ই সৃষ্টি; করুকলা (crafts) ও চারুকলা (arts) দুই-ই তাই সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। ... সংস্কৃতির গোড়ার কথা হল সৃষ্টি, নূতন প্রকাশ, নূতন প্রয়াস। আর সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হল – প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে জয়ী করা, অগ্রসর করে দেয়া, শক্তিশালী করে তোলা। আর মানস–সৃষ্টিরও সার্থকতা তাই বাস্তব সৃষ্টিতে, বাস্তব সৃষ্টিরও প্রয়োজন তাই মানস-সৃষ্টির সহায়তা করা। (গোপাল, ১৯৭৫ : ১০)

সংস্কৃতির শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান (২০১৬ : ৫০) সংস্কৃতিকে মুখ্যত 'বস্তুগত সংস্কৃতি আর মানস-সংস্কৃতি' বলে বিশেষায়িত করেছেন। দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালিকে তিনি – বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত করেন। সেই সাথে সাহিত্য-দর্শনে শিল্পে-সঙ্গীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃপ্রকাশ, তাকে বলেছেন মানস-

সংস্কৃতি। বস্তুগত আর মানস-সংস্কৃতি এক হয়ে কোনো দেশের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে বলে মত দেন তিনি।

'সাংস্কৃতিক বহুত্ব' শিরোনামের অপর এক প্রবন্ধে আনিসুজ্জামান (২০০০ : ২১) বলেন, সংস্কৃতি বলতে বোঝায়, কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি ও সুবিন্যস্ত আচরণরীতি, বস্তুগত অর্জন, বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজ ও আধ্যাত্মিক ধারণাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি রেমন্ড উইলিয়ামসের সাংস্কৃতিক ভাবনা তুলে ধরেন :

> সংস্কৃতি না বলে সংস্কৃতিসমূহ বলা উচিত : কেননা শুধু যে বিভিন্ন জাতি ও কালপর্বের নির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি রয়েছে, তা নয়, একটা জাতির বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীরও নির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি আছে। এর থেকে সাংস্কৃতিক বহুত্বের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক বহুত্বের ধারণায় একথা স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে বহু সংস্কৃতি রয়েছে এবং প্রত্যেক সংস্কৃতিরই নিজের মতো বিকাশ লাভের অধিকার আছে। ... দেখা যায়, মানুষ যে-সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠে, সাধারণত তাকেই সে বিশেষ ভাবে পছন্দ করে। (আনিসুজ্জামান, ২০০০ : ২১)

সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন আবুল হোসেনও। 'মুসলিম কালচার' প্রবন্ধে তিনি বলেন, মানুষের চিন্তা কোনো একটা বিশিষ্ট দেশে, একটা বিশিষ্ট কালে, একটা বিশিষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে ওই সময়ের মানুষকে যে সমস্ত কাজ করতে প্রণোদিত করে, সেই সমস্ত কাজের সমষ্টিকে বলা যায় 'কালচার'। (আবুল হোসেন, ২০১৬ : ৮৪)

'Culture is some kind of the information that human beingsare not born with but they need inorder to interact with each other in social life. It must be learned during the long process of education, socialization, maturing and growing Old' – *The nature of culture, What impact Globalization has no Cultural Diversity* থেকে এমন উদ্ধৃতি তুলে ধরে ওমর বিশ্বাস (২০০৪ : ৩১৪-৩১৫) লিখেছেন সংস্কৃতি মনকে পরিচ্ছন্ন করে। মনের উৎকর্ষতার জন্য পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা চালায়। এটা মানুষকে স্বচ্ছ রূপায়ণের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে উন্নত মানসিকতার প্রেরণা দেয়। এর অনুরণনে যে পদ্ধতি উদ্ভাবন হয়, রূপ নেয় নতুনত্বের তা এমন এক কাঠামোগত বলয় তৈরি করে যেখানে দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা সব সময় সুন্দরভাবে ক্রিয়াশীল। কালের প্রতিক্রিয়ায়, যা বিরূপে আসা – আপনা থেকেই নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি করে নেয় তার উৎকর্ষতার আঁকরে। এখানে পরিবর্তনশীল নৈতিকতা আর মূল্যবোধের আলোক প্রাপ্তির স্থান আছে। কিন্তু দৃঢ়, নমনীয় বা স্থায়ী অনৈতিক ও রুচিহীনতার কোনো স্থান নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সংস্কৃতি হলো মানব আচরণের সভ্য আবরণ এবং নৈতিক মূল্যবোধের পরিমাপক, যার গভীরে আছে প্রজ্ঞা এবং অনুশীলন। ব্যক্তিগত বা যৌথ প্রয়াসে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার যে প্রবণতা, সেই প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা রাখে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি। ব্যক্তি-মানসের বা সমষ্টির ভাবনা, ক্রিয়া আর সৃষ্টিশীলতা সংস্কৃতিকে ধারণ করে। রুচিশীল ব্যক্তিত্ব উন্নত সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। মানুষের মনের ভেতর সুপ্তভাবে বিরাজ করা মনুষ্যত্ব। এই মানবিকতাই সংস্কৃতির উৎকর্ষ।

অতীতের অভিজ্ঞতাপুষ্ট জাতি ইতিহাসের গতি নির্ধারণে তার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটায় নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে। সমাজজীবনের মানোন্নয়নে সুচিন্তা এবং সে চিন্তার বিকাশে সচেষ্ট হওয়াই সংস্কৃতির মূল কথা।

সংস্কৃতির বিশিষ্টতা

সংস্কৃতি মানুষের পুরোপুরি 'অর্জিত আচরণ'। প্রাণী হিসেবে একমাত্র মানুষই সংস্কৃতিবান। সংস্কৃতি হল সমাজের নিদর্শন, এককথায় জীবনধারা। এই জীবনধারাই উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই সামাজিক সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সর্বক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতিকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনুভবযোগ্য একটা বিমূর্ত বিষয় বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। তিনি বলেন :

> সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা – মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টার দ্বারা যে সৌন্দর্য চেতনা, কল্যাণবুদ্ধি ও শোভন জগতদৃষ্টি অর্জন করতে চায় – তাকেই হয়ত তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিস্রুত জীবনচেতনা। (আহমদ শরীফ, ২০১৬ : ৩৭)

আহমদ শরীফের মতে, প্রজ্ঞা ও বোধিসম্পন্ন ব্যক্তি-মানসেই এর উদ্ভব ও বিকাশ, যা ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজ ছাপিয়ে বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর ও মার্জিত প্রকাশকেই সংস্কৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন তিনি।

সাধারণ মানুষ সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ বিষয়ে সঠিক ধারণা রাখে না বলে আশংকা আবদুল মতিনের। তিনি তাঁর 'সংস্কৃতির সন্ধানে' প্রবন্ধে সংস্কৃতির মধ্যে দিনাতিপাত করা মানুষ প্রসঙ্গে সেই সংশয়ের কথা তুলে ধরেন :

> ...তারা কাপড় পরে, গান গায়, পালা-পরবে রকমারী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, কিন্তু এগুলো যে সংস্কৃতির বাহন সেটা তারা জানে না। তারা ধর্ম মানে, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে যোগ দেয়, কিন্তু ধর্ম যে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি সেটা তারা ভেবে দেখে না। অপর দিকে, তত্ত্বানুসন্ধায়ী বিদ্বজ্জন মহলে সংস্কৃতি একটা 'মূল্য' (value), মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য – এবং বিশেষজ্ঞরা কথাটা ঘুরিয়ে বলেন যে শিক্ষিত, অর্থাৎ অসাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিই ধর্ম। (আবদুল মতিন, ২০১৬ : ৯৬)

তবে, ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি শুধু ধর্মই নয়, – মাতৃভাষা, গবেষণা, নীতি নৈতিকতা, ঐতিহ্য, দর্শন সবই পড়ে সংস্কৃতির আওতায়। সমাজবোধ মানসনির্ভর বিষয় হলেও, সংস্কৃতি মানুষের অর্জিত আচরণের ফল।

শ্রেণিহীন ও শ্রেণিযুক্ত সমাজের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক চরিত্রের উল্লেখ করে বুলবন ওসমান তাঁর *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব* গ্রন্থে সংস্কৃতিকে সাম্যমূলক এবং দ্বন্দ্বমূলক সংস্কৃতি এই দুই ভাগে বিভাজন করে লিখেছেন :

> সংস্কৃতি হলো বস্তু ও নির্বস্তুক কলা কৌশলসমূহের সমষ্টি এবং যা নৈতিক পক্ষপাতশূন্য হতে হবে। ...কিন্তু সংস্কৃতির মধ্যে ভালমন্দ বোধও একটি মূল্যবোধ হিসাবে বিবেচিত, তাই নৈতিকতাবোধের জায়গা করে দিতে হবে সংস্কৃতির সংজ্ঞায়। (বুলবন, ২০০১ : ১৩)

মূলত সামাজিক পরিবেশ থেকেই সংস্কৃতির উদ্ভব। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এতটাই প্রখর, যে একটি সমাজ অবলুপ্ত হলেও সংস্কৃতির চিহ্ন ধারণ করে স্মরণীয় হয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে। উদাহরণ হিসেবে বুলবন ওসমান (২০০১ : ১৭) পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্যের ইতিহাস থেকে তৎকালীন সামাজিক ধারণা লাভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

সমাজের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক চরিত্রের উল্লেখ করে বুলবুল একে সাম্যমূলক এবং দ্বন্দ্বমূলক সংস্কৃতি বলে বিভাজন করেছেন : 'এক জায়গায় কোন শ্রেণীস্তর নেই, কিন্তু অন্যত্র শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও শ্রেণীবিন্যাস এসে পড়ে।' (ওসমান, ২০০১ :২২)

সমাজ-সংস্কৃতিবিদেরা মনে করেন, সংস্কৃতি সমাজের সম্পদ এবং সে সমাজের দর্পণ স্বরূপ। আমরা যা, সেই আমি-ই সংস্কৃতি। অর্থাৎ আমাদের আচার-ধর্ম, আচরণ-ভাবনা, দর্শন, জড় ও অজড় কলা-কৌশলের সমষ্টি নিয়ে এই সাংস্কৃতিক জগৎ।

বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে সংস্কৃতির কোনো নির্ধারক নেই। তবে, মানবসভ্যতা মূল্যবোধজাত একটি ধারণা, তার একটা নির্ধারক আছে। মূল্যবোধ আরোপ করে কোনো সংস্কৃতিকে মাপা যায় না, তবে সেই মূল্যবোধ ঊর্ধ্বগামী বা অধঃপতিত, সেই মানদণ্ডে বিশেষায়িত করা যায়।

অপসংস্কৃতি

আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির যে জোয়ার, তা অনেকাংশেই প্রভাবিত করছে জাতীয় জীবনকে। বিকৃতি, নৈরাজ্যবাদ, অনুচিত ও অসুন্দর কার্যকলাপ অপসংস্কৃতির সমগোত্রীয়। এই হিসেবে অপসংস্কৃতি আর বিজাতীয়তা সমার্থক বলে মনে করেন নারায়ণ চৌধুরী (১৯৮৫ : ৫৭)। তাঁর মতে, 'অপসংস্কৃতি বলতে রুচির বিকার, যৌনতা, অন্ধকার প্রবৃত্তির পোষকতা, সমাজ বিরোধী চিন্তার দাস্যতা ইত্যাদি নানা প্রকারের মালিন্যকে বোঝায়' (নারায়ণ, ১৯৮৫ : ৪৫)। জীবনের সমস্ত স্তরে বিজাতীয়তার কুপ্রভাব এক অর্থে অপসংস্কৃতির আবর্জনা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিটি জাতির উন্নতি ও অবনতির মূলে কাজ করে তার সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি। ব্যক্তিগত কিংবা যৌথ জীবনে সংস্কৃতি চেতনা যখন লোভ, হিংসা, ভোগসর্বস্বতা, ক্ষমতালিপ্সা, সম্পত্তিলিপ্সা, কুশিক্ষা, অসততা, দুর্নীতি ইত্যাদি দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় তখন দেখা দেয় অপসংস্কৃতি; এমন মত আবুল কাসেম ফজলুল হকের (২০১৮)। 'জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, প্রতিটি জাতির মধ্যেই সংস্কৃতি বিকশিত হয় অপসংস্কৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শঠ, প্রতারক ও লোভীর প্রবণতা ও প্রচেষ্টা হলো অপসংস্কৃতি। বিপ্লবে ও ন্যায় যুদ্ধে সংস্কৃতি থাকে। কিন্তু প্রতিবিপ্লবে ও অন্যায় যুদ্ধে সংস্কৃতি থাকে না, থাকে অপসংস্কৃতি – উল্লেখ করে আবুল কাসেম লিখেছেন :

> প্রতিটি জাতির প্রতিটি কালের সংস্কৃতিচিন্তা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল, রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা লক্ষ করা যায়। প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রগতির বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকে। প্রতিক্রিয়াশীলদের সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি। প্রতিক্রিয়াশীলদের অপক্রিয়াশীল বলাই সমীচীন। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজে সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে বিরাজ করে অপসংস্কৃতি এবং দুয়ের মধ্যে চলে বিরোধ। জাতীয় জীবনে কখনো সংস্কৃতি, কখনো অপসংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করে। জাতীয় জীবনে জাতীয় সংস্কৃতিই মূল। এতে থাকে নানা প্রবণতা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। অপসংস্কৃতি মানুষকে পরিণত করে অপশক্তিতে। মানুষ মানবিক গুণাবলি অর্জন করে ঐশ্বরিক আচরণে ঋদ্ধ এবং মানবিক গুণাবলি অর্জনে অমনোযোগী হয়ে পাশবিক আচরণ নিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। পাশবিক প্রবৃত্তি আর মানবিক প্রবৃত্তি অবিচ্ছেদ্য, শুধু মানবিক প্রবৃত্তিকে রক্ষা করে পাশবিক প্রবৃত্তিকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। (আবুল কাসেম, ২০১৮)

তবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক জীবনে পাশবিক প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার চেষ্টাই সংস্কৃতি চর্চা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলে মনে করেন আবুল কাসেম। জাতীয় জীবনে সংস্কৃতি চেতনা দুর্বল হলে, বিকৃত হলে জাতির উন্নতি ব্যহত হবার পাশাপাশি ব্যক্তিরও অবক্ষয় ঘটে। যার বিরূপ প্রভাব পড়ে জনগোষ্ঠীগত জীবনে- এমন মত তাঁর।

অহংকারবশত বা আধুনিকতার নামে স্বতন্ত্রবোধ, বিশ্বাস ও কৃষ্টিকে বিলিয়ে দেয়া অপসংস্কৃতির নামান্তর বলে মনে করেন ওমর বিশ্বাস (২০০৪ :৩০৮)।

আধুনিকতা বা বিনোদনের নামে স্বেচ্ছাচারিতা এক ধরনের অপসংস্কৃতি। বিশ্বাস ও বিনোদনকে অবশ্যই অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত চিন্তায় সংস্কৃতিও বিরুপ প্রভাবিত হয়। কারণ, বিশ্বাস আচরণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; উল্লেখ করে শাহ আবদুল হান্নান অপসংস্কৃতির বাস্তবতা বিষয়ে কিছু বিধি নিষেধ তুলে ধরেন :

> কুস্বভাব সৃষ্টি করে, ক্রাইম ছড়ায় এমন কিছু করা যাবে না। খারাপ যা খুব কম ঘটে তাকে নাটকে এনে জাতিকে জানাতেই হবে তা আসলে জরুরি নয়। সাহিত্যের নামে যেটা করা হয় – একটি পরিবারের দুর্ঘনাকে গোটা জাতিকে জানানো হয়। তা যদি সুন্দর কিছু হতো তাও কথা ছিল। আসলে বিনোদনের মধ্যে একটা সীমা থাকতেই হবে। আইনের মাধ্যমে এবং কাস্টমসের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে স্বাধীনতার নামে আমরা কদাচারকে অনুমোদন করতে পারি না। আমরা এমন স্বাধীনতা চাই না যে স্বাধীনতা মানুষকে অমানুষ করে দেয়। (হান্নান, ২০০৪ : ১১৪)

সংস্কৃতির বাইরে মানুষ হতে পারে না। এর মূল দিক জীবনাচার, পুরো জীবন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অপসংস্কৃতির বাঙালির মস্তিষ্কের অবদান। এর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, উল্লেখ করে অন্নদাশঙ্কর রায় (২০১৬ : ২৯-৩০) যোগ করেন, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আইন আছে, কিন্তু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত কোনো আইন প্রণয়ন হয়নি বিধায়, তা একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা হয়ে সমাজে চেপে বসেছে। লেখকের মতে অপসংস্কৃতি :

> ময়রার দোকোনের মতো স্বাবলম্বী। সকারের সাহায্যের জন্য সে হাত পাতে না। তার খুঁটির জোর জনতার আগ্রহ। আর এটাও পরীক্ষিত সত্য যে, জনতার আগ্রহ এদিনে বা এক মাসে বা এক বছরেও ফুরোয় না। কোটি কোটি মানুষ যদি একই নাটকে আগ্রহী হয় তো একটানা দশ বিশ বছর ওই নাটকই বাজার মাত করতে পারে। (অন্নদাশঙ্কর, ২০১৬ : ৩৫-৩৬)

শোষণমুখী সমাজে শোষণ অক্ষুণ্ন রাখার এক প্রধান হাতিয়ার হলো অপসংস্কৃতি, এমন ভাবনা নারায়ণ চৌধুরীর (১৯৮৫ : ১৬)। কাজেই পাকে-চক্রে অপসংস্কৃতি টিকিয়ে রাখায় ধনিক-বণিক শ্রেণির লোকেদের প্রভূত স্বার্থ বিদ্যমান মনে করে তিনি বলেন, 'বর্তমানের সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার সম্ভব নয় এই কারণে যে, বর্তমান সমাজ যে বুর্জোয়া মূল্যবোধের সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই মূল্যবোধের মূল কথাই হলো অসম চিন্তাধারা, বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি।' (নারায়ণ, ১৯৮৫ : ৮৫)

প্রবীর ঘোষ বলছেন, 'যে সংস্কৃতি একটি সংস্কৃতি গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে এবং গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের জীবন ও চেতনার, মননের পুষ্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সুস্থ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অসুস্থ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই-ই অপসংস্কৃতি।' (২০১৬ : ২২৬)

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কুসংস্কার, হুজুগ, উত্তেজনা, অন্ধবিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ বা ক্ষতিকর অভ্যাসের অনুগামীতা – এগুলো অপসংস্কৃতির নিয়ামক। তাই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন কেবল সাহিত্য-সংস্কৃতির বা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনই শুধু নয়, এই আন্দোলন জাতি গঠনের আন্দোলন। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে যাঁরা অপসংস্কৃতির বিপক্ষে অবস্থান নেন, তাঁরা মূলত দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির মঙ্গলের সঙ্গে জাতিগত বৃহত্তর তাৎপর্যের কথা মাথায় রাখেন।

সংস্কৃতির বিবর্তন

সংস্কৃতির রূপরেখা আর অপসংস্কৃতির বিরূপ প্রভাব আলোচনার পর, স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সংস্কৃতির পরিবর্তন সংঘটিত হয় কিনা। এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায় গোপাল হালদারের লেখায়। তিনি লিখেছেন :

> সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবনসংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সেই জীবনযাত্রারই ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ ও রঙও পরিবর্তিত হয়। আবার, সংস্কৃতির সহায়েও জীবনযাত্রা যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার

> সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার সঙ্গে নূতন হইয়া উঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধ যখন দেখিতে পাই তখনই বুঝি সংস্কৃতি নিশ্চল নয় – তাহার রূপান্তর ঘটে। (গোপাল, ১৯৭৬ : ৩৪)

নানাবিধ অনিবার্য কার্যকারণে মানুষের জীবনযাপন পালটাতে থাকলে তাদের মনোজগৎ পালটে যেতে থাকে এবং মনোজগৎ পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে, উল্লেখ করে হায়াৎ মামুদ সংস্কৃতির বিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> যদি কেউ ভেবে থাকেন সংস্কৃতির রূপ অপরিবর্তনীয় তিনি যেমন কট্টরপন্থি ছুঁৎমার্গের পরিচয় দেবেন, তেমনি সংস্কৃতির নিত্য পরিবর্তনশীলতাকে চূড়ান্ত বলে যিনি মানবেন, তাঁর চিন্তায় উন্মার্গতা ও আতিশয্য প্রাবল্য পাবেই। সত্য, মনে হয়, দাঁড়িয়ে আছে এ-দুয়ের মাঝখানে। সংস্কৃতিরূপের পরিবর্তন না-মেনে উপায় নেই, কারণ জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে তাতে পরিবর্তন ধীর ও সূক্ষ্ম লয়ে ঘটতেই থাকে; যে-সব কারণে ঘটে তার মধ্যে মুখ্য হলো জীবনযাত্রার চলিষ্ণুতাজনিত পার্থক্য। যুগ থেকে যুগে কিংবা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জীবনযাপনে তফাত আসে। অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ অর্থনীতিসঞ্জাত কর্মপ্রণোদনার ব্যাপ্তিতে বা সংকোচনে। গ্রামের ভিতরে শহরের অনুপ্রবেশ, এমনকি একে যদি 'শহুরে আগ্রাসন'ও বলি, ঘটেতো গেছেই। ইচ্ছে করে পরিকল্পনামাফিক কেউ ঘটায়নি, অবশ্যম্ভাবী বলেই তা ঘটেছে।(হায়াৎ মামুদ, ২০১৯ : ৩৮১)

সংস্কৃতি বিবর্তনের বিশদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হায়াৎ মামুদ আরও উল্লেখ করেন, গ্রামাঞ্চলে আগের তুলনায় বর্তমানে বৃত্তিবিন্যাসের পরিবর্তন ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। এর পেছনে আছে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শক্তি। কাঠের আগুনে মাটিপর হাঁড়িতে জ্বাল দেয়া দুধ অমৃতস্বাদী হলেও, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি বাসনের অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভবপর নয়। এর পশ্চাদ্‌বর্তী কারণ হিসেবে জিহ্বার স্বাদ পরিবর্তন নয়, আর্থিক সংগতির হিসেবনিকেশে অধিকতর সাশ্রয়গুণকেই প্রভাবক হিসেবে দেখেছেন তিনি। এমনকি পুরুষের পোশাকে সুতিবস্ত্রের জায়গায় সিন্থেটিক কাপড় প্রচলনের কারণ ব্যয়সংকোচন। হায়াৎ মামুদের মতে, প্রাত্যহিক জীবনের এমনি হাজারো খুঁটিনাটিতে ধরা পড়বে জনজীবনে সাংস্কৃতিক বিবর্তন।

সংস্কৃতির রূপান্তর চিরন্তন, স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গের সাথে সুর মিলিয়েছেন বুলবন ওসমানও (২০০১ : ৩২-৩৩)। প্রথম দিকের সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করতেন আদিবাসীদের সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না। পরে দেখা গেল পরিবর্তনটা দ্রুত নয় বলেই মনে হয়েছে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আসলে সব সংস্কৃতিই সচল। বুলবনের মতে, মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সংস্কৃতিকে ধরা হয় অতি কাঠামো হিসেবে এবং সে ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অর্থাৎ অতিকাঠামোর বদল – জীবনধারা, রীতি-প্রথা, মূল্যবোধ, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদির যে বদল, এই বদলের মাপ করতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। দৈনন্দিন বদলটা হঠাৎ করে ধরা না গেলেও, সময়ের সাথে এক সময় এই পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। মানুষের সমাজ বা ইতিহাসের যে সব যুগবিভাগ তা সবই সময়কে কেন্দ্র করে। সংস্কৃতির পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুলবন আরও বলেন –

> ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সংস্কৃতি ভিন্ন ধারার এবং সেটা জন্মগতভাবেই নির্ধারিত। ... ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিয়ের পর পরবর্তী প্রজন্মের দেহে বিপুল পার্থক্য ঘটায়। তাছাড়া বর্ণগত স্থানান্তর দেহের ওপর প্রভাব ঘটায়। যুদ্ধ, দাসত্ব ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারগুলো বর্ণের এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে। যার

> ফলে একদল আর এক বর্ণগত দলকে নিকৃষ্ট বলার সুযোগ পায় বা এক বর্ণ ওপরে থাকার সুবিধা করে নেয়। ... মেধার পার্থক্যের মূল কারণ সংস্কৃতিগত পরিবেশের পার্থক্যের ফল। (বুলবন, ২০০১ : ৩২-৩৩)

সংস্কৃতির বিবর্তন প্রসঙ্গে নারায়ণ চৌধুরী (১৯৮৫ : ৫১-৫২) আলোচনা করেছেন, তাঁর *সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য* গ্রন্থে। তিনি বলেন :

> দীর্ঘ দুশো বছরেরও বেশী সময় বিজাতীয় শাসনের পায়ের তলায় থাকার ফলে আমাদের সংস্কৃতি তার জাতীয় প্রতিভা অনুযায়ী বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি, শুরু থেকেই তার উপর অনুকরণাত্মক সংস্কৃতির অস্বাভাবিক ছাপ এসে পড়েছিল বিলক্ষণ মাত্রায়। প্রথমে ইংরেজের কালচারের দৃষ্টান্তে এই অনুকরণ ঘটেছিল, তারপর তার সম্পর্ক সূত্র ধরে ফরাসী জার্মান স্পেনীয় স্ক্যান্ডিনেভীয় এবং সর্বশেষ মার্কিন প্রভাব আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল বিসদৃশভাবে।

তিনি মনে করেন, এই স্বাধীন দেশেও অনুকরণের এই প্রক্রিয়া আজও থামেনি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নারায়ণ চৌধুরী (১৯৮৫ : ৫২) এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের শিল্পে সাহিত্যে সাহসিক কিছু করার প্রেরণা আমরা পাশ্চাত্য সূত্রে পেলেও, তাতে উপকারের পাশাপাশি অপকার হয়েছে আশংকাজনকভাবে। আমাদের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছে বিজাতীয় অনুকরণ। এই অবস্থা সংস্কৃতিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে, যা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুব সহজ নয়।

সময়ের সাথে সবকিছু বিবর্তিত হয়। ফলে সংস্কৃতির রূপান্তরকেও স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯৮৮ : ৫৯)। শিক্ষার প্রসার, নতুন জ্ঞান, নতুন চেতনা, নতুন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নতুন প্রশাসনিক কাঠামো প্রভৃতি মিলে এই রূপান্তর ঘটায় উল্লেখ করে তিনি 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালি সংস্কৃতি' নিবন্ধে লিখেছেন :

> আমাদের বাল্যকালে পল্লী সমাজে পালিত বহু আচার অনুষ্ঠান এখন বিলুপ্ত প্রায়। পল্লী সমাজেও রেডিও, টেলিভিশন প্রবেশ করেছে, নগর-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। বহু কুসংস্কার হতে পল্লীর মানুষ মুক্ত হয়েছে। আবার নতুন কুসংস্কারও যে কিছু কিছু না ঢুকছে এমন নয়। দ্বন্দ্ব ও বিবর্তনের মধ্যেই মানব সমাজ এগিয়ে চলছে। ... সমাজ তার দ্বৈত সত্তা – এক দিকে সে অতীত স্মৃতির ধারক ও বাহক – বিগত অতীত লোকসংস্কৃতির অন্তরে কথা বলে, তার মর্মে মর্মে অতীত গুঞ্জরিত, অপরদিকে সে নতুনের বার্তাবহ, সে নতুনকে ধীরে বরণ করে নেয়– নতুনের পথযাত্রায় সে এক বিরামহীন অনুষঙ্গী। (আবু জাফর, ১৯৮৮ : ৫৯-৬০)

এই বিবর্তনশীলতা মানুষের স্বভাবজাত, যেমন স্বভাবজাত বৃত্তি হিসেবে প্রভাব ফেলে স্মৃতিশক্তি। স্মৃতি নানাভাবে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়, যা পুরানো এবং আধুনিক সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজায়। আবু জাফর লিখেছেন :

> মানব জাতি স্থবির বসে নেই,এগিয়ে চলছে। কিন্তু নিত্য জঙ্গমতার মধ্যেও মানুষ সুদূর অতীতের বহু স্মৃতি মস্তিষ্কে বহন করছে। কৃষিযুগে এমনকি যন্ত্রযুগে প্রবেশ করেও মানুষ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে নিছক আমোদের

> জন্যে শিকারে যায়। অর্থাৎ সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর স্মৃতি কতকটা যেন স্বভাবজাত বৃত্তিরূপে বহন করে চলছে। এ-যুগের লিখিত ইতিহাসে এই স্ববিরোধের বিবরণ পাওয়া যাবে না; কেননা এগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। কিন্তু এগুলোও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বিষয়। (আবু জাফর, ১৯৮৮ : ১০)

আবু জাফর মনে করেন, সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে কারণ, যুগের সাথে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অচিন্তনীয় উন্নতির ফলে অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটছে। স্থানিক বৈশিষ্ট্য ও দূরত্ব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্ব-সংস্কৃতি নির্মানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানবজাতি।

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়-মানব জাতির জন্ম বা বংশ পরিচয়ে তার নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও, সংস্কৃতি তৈরিতে মানুষের ভূমিকা অনেকটাই এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মানুষের বেশ নিয়ন্ত্রণাধীন। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিষয়টি স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও একথা সত্যি, রাষ্ট্র পরিচালনার কলাকৌশল, ঐক্যের ধারণা বা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব সৃষ্টির প্রেরণা পাশ্চাত্য প্রভাবিত, তারপরও বাঙালি মূল্যবোধকে হতাশাব্যঞ্জক করে তোলে এমন কিছু মনোবৃত্তি গেঁথে আছে জাতির আষ্টেপৃষ্ঠে, যা দূর করা অসাধ্য হয়ে উঠেছে।

এর কারণ হিসেবে শাহ আবদুল হান্নানের মত, সংস্কৃতির একটি নিয়ামক হল ধর্ম বা বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এক অর্থে সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে নিয়ামকের আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃতির পার্থক্য যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়, আবার কিছু বৈশিষ্ট্য বিশ্বে টিকে থাকে। টিকে থাকা বৈশিষ্ট্যগুলো সাংস্কৃতিক ঐক্য জোরদার করলেও, সচেতন নাগরিকের ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারা জরুরি বলে মনে করেন হান্নান :

> এখানে আগ্রাসন ও ইন্টারাকশনকে যদি এক না করে পার্থক্য করতে পারি তাহলে ভালো হবে। ইন্টারাকশনকে আমরা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা লেনদেন বলি, আর আগ্রাসন হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেয়া। আমাদেরকে অবশ্যই পরিকল্পিত চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। ... পাশ্চাত্যের কালচার দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও বস্তুবাদের ওপর ভিত্তিশীল। বস্তুবাদ হলো ভোগবাদ এবং স্বার্থপরতা। তার কারণেই কালচার খুব নোংরা হয়ে গেছে। (হান্নান, ২০০৪ : ১১৩-১১৪)

পশ্চিমাদের ভালো বিষয়গুলোকেই গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে; অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমা বস্তুবাদ নাস্তিকতা না হলেও নাস্তিকতার কাছাকাছি, যা মানবতার জন্য কল্যাণকর নয়। এর জন্য তাঁর মতে সার্বিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

সমাজে বিরাজমান নানা হতাশায় আশার আলো দেখেন হাসান আজিজুল হক (২০১৬ : ৫১৫)। তিনি মনে করেন, সংস্কৃতির রূপান্তর বা ক্ষেত্রবিশেষ অবলুপ্তি অনেক সময় শুভ বার্তা বয়ে আনে :

> যা এসেছে তা বদলানোর এবং চলে যাওয়ার জন্যই এসেছে। যা কিছু জীবন্ত তার মৃত্যু ঘটবে, তবু মৃত্যু ঘটলেই জীবনের পরাজয় ঘটে তা নয়। জীবনের মহিমা আপন জীবনীশক্তির বলেই প্রকাশ পায়। যখন আর তার প্রকাশ দেখা যায় না, তখন জীবনীশক্তির শেষ তৈলবন্দুটি পুড়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। যা পছন্দ হয়, তাকে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে রাখলে একদিন মুষ্টি খুলে দেখা যায় সেটিতে শূন্যতা ধরে আছি। যেন উইপোকায় খাওয়া কাঠ। (আজিজুল হক, ২০১৬ : ৫১৫)

বলা হয়ে থাকে, মূল্যবোধ মানুষের প্রতিটি কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের পরিবর্তন মানেই তা সামাজিক অবক্ষয় নয়। এই পরিবর্তন কখনো নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টিরও কারণ হয়। সংস্কৃতির বিবর্তন হয় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ এবং বিশেষ জ্ঞান ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার সূদূর প্রসারী প্রভাব দেখা যায় মানুষের কর্মে, চিন্তায়, শিল্পকলায়, লোকজীবন ধারায়। তাই বিভিন্ন সমাজে মূল্যবোধের ভিন্নতা দেখা যায় এবং সংস্কৃতিতেও দেখা যায় পরিবর্তন। তবে সংস্কৃতির স্বরূপ কী, তার অবলম্বনই বা কী, তা বোঝা গেলেই ধারণা পাওয়া সংস্কৃতি পরিবর্তনের গতি প্রকৃতির ধারা সম্পর্কে।

সংস্কৃতি বিপর্যয়ের প্রভাব

সমাজই ধারণ করে সংস্কৃতি। আর এই সমাজেই তৈরি হয় মূল্যবোধ। তাই সমাজের গুণগত প্রাচুর্য বা অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের ধারণারও বদল ঘটে। এমনকি সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলেও পরিবর্তন ঘটে মূল্যবোধের।

সমাজে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন (১৯৭৪ : ১১১) বলেন, মানুষের দেশপ্রেম, আত্মসম্মানবোধ এবং গৌরবচেতনা সব কিছুই তার সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে জড়িত। তাই কোনো দেশের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ব্যক্তি-মানসের সামগ্রিক জীবনকে আচ্ছন্ন করতে বাধ্য। সাংস্কৃতিক জীবনকে পঙ্গু এবং বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলে পরোক্ষভাবে সে সমাজের সামগ্রিক জীবনকে পঙ্গু ও বিধ্বস্ত করার কাজ অনেকখানি সফল ও দ্রুততর হয়। এখনকার রবীন্দ্রবিরোধীতা এবং বাংলা ভাষা সরলীকরণের প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সামগ্রিক জীবনকে এইভাবে বিধ্বস্ত করারই এক সূক্ষ্ম এবং দূরদর্শী পরিকল্পনা।

অনুকরণজাত, আন্তরিকতা বর্জিত, আচারসর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতা – স্বার্থকতাবিহীন অপসংস্কৃতিরই নামান্তর। এই প্রজন্ম অজ্ঞানতাবশত সেদিকেই আকৃষ্ট। বলা যায় সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী ও পরিবর্তন বিমুখ জাতির জীবনে সৃষ্টির সম্ভাবনা আশংকাজনকভাবে কমে আসে। তবে সময়ের সাথে সাথে কোনো জাতির জীবনেই এটা স্থায়ী প্রভাব ফেলে না; ইতিহাস সেই আশার আলো দেখায়।

নারায়ণ চৌধুরী (১৯৮৫ :৮৪) মনে করেন, সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেটা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন তা হল পাঠকের মন থেকে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের ধারণাগুলিকে বিদায় দেওয়া এবং তার জায়গায় আগামী দিনের সমাজের মূল্যবোধের আবাহন। তাঁর মতে, বিগত ও বর্তমানের চিন্তাধারাকে আমল না দিয়ে ভবিষ্যতের সমাজে যে চিন্তাধারা জন্ম নেবে তার পথ প্রস্তুত করার জন্য সজ্ঞানে চেষ্টা করে যাওয়াই হবে সুস্থ সংস্কৃতির ভিত তৈরির অপরিহার্য প্রাথমিক পদক্ষেপ।

কারণ, সাম্রাজ্যবাদ, আগ্রাসন, বিশ্বায়ন, যাই হোক না কেন; সেখানে আমাদের জাতিগত ভূমিকা, দেশের কৃষ্টি কালচার এবং তার নিয়ন্ত্রণের বিবেচনাবোধও আমাদের থাকা উচিত মনে করেন ওমর বিশ্বাস (২০০৪ : ৩১৭)।

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসকদের পতনের পেছনেও তাদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সেন রাজত্বের শেষ দিককার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (২০০৪ : ১৫৬) আমাদের জানাচ্ছেন, রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সেনাপতি, বণিক, রাজপুরুষ সবার জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরম বিশ্বাসী হয়ে ওঠার পরিস্থিতি শাসকদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। রাজার অনুচররা আতঙ্কগ্রস্ত, উপদেষ্টা ও মন্ত্রীমন্ডলী পরাজয় ভাবাপন্ন। জ্যোতিষরাই রাষ্ট্র বুদ্ধির নিয়ামক। এমন অপশাসনে বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা জনগণ রাজার বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রবল প্রতিরোধ। যুগে যুগে সংস্কৃতির নানা আগ্রাসন সংকটকেই ঘনীভূত করে।

শ্রীচৈতন্যের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার ফলে বাংলার মুসলীম শাসনের আয়ু বৃদ্ধি পায়। এরপর আকবরের শাসনামলে বাংলায় মুগল শাসনের সূচনা হওয়ার দরুন তার বিভ্রান্ত চিন্তাও বাংলার সংস্কৃতিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে – এমন উল্লেখপূর্বক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান আরও লিখেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য আকবর দীন-ই-ইলাহী নামে যে সমন্বয়বাদী ধর্মমত প্রচার করেন তাতে ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্মেরই কিছু কিছু অনুষ্ঠান ঠাঁই পেয়েছিল। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি লিখেছেন :

> বাদশাহর হেরেমে অগ্নিপূজা ও মূর্তি পূজা প্রচলন, সালাম দেয়ার রীতি রহিতকরণ, বাদশাহকে সেজদা করার রীতি প্রচলন, আযান ও গরু জবাই নিষিদ্ধকরণ, শুকরকে পবিত্র প্রাণীরূপে বরণ, দেওয়ালী, রাখী, পূনম, সূর্যোপাসনা, কপালে তিলক এবং কোমরে ও কাঁধে পৈতা ধারণ, মৃতদেহ কবরস্থ করার রীতি পরিবর্তন প্রভৃতি রীতি দীন-ই-ইলাহীর বৈশিষ্ট্য ছিল। আওরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যুর পর তার দুর্বল উত্তরাধিকারীরা সাংস্কৃতিকভাবে ছিল পুরোপুরি বিপর্যস্ত। শৌর্য বীর্য হারিয়ে তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতার মাঝে আত্মসমর্পন করেছিল। ... শাসক সমাজ, আমীর ওমরাহ ও রাজানুকুল্য লাভকারী মুসলিম ধনিক শ্রেণীর চরম বিলাসিতা, সংস্কৃতির নামে বাঈজী চর্চা প্রভৃতি উপসর্গ প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং সমাজের উঁচু শ্রেণীকে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিল। আঠারো শতকে মুসলিম সমাজের দিল্লী থেকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজ করছিল। সাধারণ মুসলিম সমাজের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয় চরমে উঠেছিল। বিশ্বাস, আচরণ ও নৈতিকবৃত্তি তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সকল দিকে সার্বিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল। মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা ও

> অসচেতনতার সুযোগে বাংলার ইউরোপীয় খৃস্টানদের মিশনারি তৎপরতা বৃদ্ধি করে। (আবদুল মান্নান, ২০০৪ : ১৫৮)

বহুকালে সংস্কৃতির এই আগ্রাসন বর্তমানকেও প্রভাবিত করে আমাদের পরিবার প্রথাকে ভাঙতেই যেন বদ্ধ পরিকর। কেননা, আমাদের পরিবার বন্ধনের মতো অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধন ও সামাজিক ঐতিহ্যকে ভাঙতে পারলে অন্যান্য অনেক উপাদান আপনা আপনি ভেঙে যাবে। ওমর বিশ্বাস (২০০৪ : ৩১৭) মনে করেন, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে আঘাত অবশ্যম্ভাবী। দেশে অপশক্তি, বিদেশি চক্রান্ত, পাশ্চাত্য প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্য দিয়েই নিজস্বতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে সংরক্ষিত করতে হবে। এই বিপর্যয় থেকে মুক্তির পথ হিসেবে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সামষ্টিক ঐক্যই রক্ষাকবচ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আত্মিক উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক সচেতনতা এবং জাগরণ জরুরি।

উপর্যুক্ত মত ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সংস্কৃতি জাতিগত জীবনবোধ, সমাজ গঠনের মূল উপাদানগুলোর অন্যতম। প্রতিটি জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়েই উৎকর্ষ লাভ করে। সংস্কৃতি হলো একটি সম্প্রদায়ের অর্জিত আচরণ, এক কথায় সামাজিক সম্পদ। জাতির কীর্তির মাধ্যমেই সংস্কৃতির প্রকাশ। মানুষের আচার, জীবিকা, শিল্প, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি বা শিক্ষা সম্পর্কীত বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ প্রতিদিনের জীবন যাপনের সাথে যুক্ত হয় তার ললিত কলা এবং শিষ্টাচার। সময়ের সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কখনো তীব্র রূপ ধারণ করে, ভৌগলিক, আঞ্চলিক বা দেশজ বিভিন্ন উপাদান যোগ হয়ে বৃদ্ধি পায় এর পরিধি, কখনো বৈশ্বিক আগ্রাসনে তা হয়ে যায় ম্রিয়মান।

নিজের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উন্নত করার যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে দেখা যায়, এর মধ্যেই মিশে আছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিই প্রভাবিত করে রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাশক্তি, সমাজবোধ, পরিপার্শ্ব, গ্রহণ-বর্জন, প্রয়াস ও প্রচেষ্টা। এই চেতনা যখন তার স্বাভাবিক বিকশে বাধা পায়, তখনই তৈরি হয় সংস্কৃতির বিকার – অপসংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের যেমন অন্তরায়, তেমনি তা অস্পষ্ট করে তোলে জাতির আত্মপরিচয়। দেশ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে রুচির পার্থক্য থাকলেও, মানুষের জীবন উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনে সংস্কৃতির বিরূপ প্রভাব নড়বড়ে করে দেয় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নৈতিক মূল্যবোধের ভিত। মানুষের চিন্তা, কর্ম ও সৃষ্টিই বহন করে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়। সংস্কৃতিতে পরস্পরবিরোধী উপাদান প্রায়শ দৃশ্যমান হলেও শত সহস্র বৎসর ধরে চলছে তার পুনঃর্গঠন। জীবনযাপন আর আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সঙ্গে সংস্কৃতিও ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নেয় তার রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে। সে প্রক্রিয়ায় গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় স্বাধীনতাই নির্ধারণ করে জাতিগত ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতা।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালি সংস্কৃতি : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

পৃথিবী নামক গ্রহে যে মানুষের বাস, সে মানুষ বিশ্বখণ্ডের যে প্রান্তেই অবস্থান করুন না কেন, তার বসবাসকৃত সমাজে একটি সংস্কৃতি রয়েছে, যা বহুবর্ণিল, বহুভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য এবং সদা পরিবর্তনশীল। এই সংস্কৃতি তার আবহমান সংস্কৃতি। তবে কোনো দেশেই একটি সংস্কৃতির অস্তিত্ব এককভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। শতাব্দীকাল একই ভূখণ্ডে নৃতাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন মানব জাতির বসবাস, নানা জাতির পারস্পরিক মেলামেশা, বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা আর বিনিময় প্রথায় বিবর্তিত, সমন্বয়বাদী, সেই সাথে মিশ্র এক সংস্কৃতি গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্ম বা আচার সেখানে একক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ এক সংস্কৃতি গোষ্ঠীর দেশ নয়। তবে সব কিছুর মিশেলে এক সমন্বয়বাদী সংস্কৃতিকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে পারি।

এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ মতিউর রহমান (২০০৪ : ১৪৯) মনে করেন, এককভাবে কোনো বাঙালি সংস্কৃতির অস্তিত্ব এখানে কখনো ছিল না, এখনো নেই। যা ছিল বা এখনো আছে তা হলো বাঙালি জৈন সংস্কৃতি, বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতি, বাঙালি বৌদ্ধ সংস্কৃতি, হিন্দু-বৌদ্ধ সংকর সংস্কৃতি, বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি ইত্যাদি।

মুসলিম আগমনের পূর্বে রাজনৈতিকভাবেও বাঙালির কোনো একক পরিচয় ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই গড়ে ওঠেনি। কারণ হিসেবে মতিউর রহমান (২০০৪ : ১৫০) লিখেছেন, গুপ্ত যুগ ও ব্রাহ্মণ সেন আমলে যে হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে সেটারও রূপ ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য ছিল। উচ্চ বর্ণের আর্য হিন্দুদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যার সাথে দেশের নিম্নবর্ণীয় অনার্য হিন্দুদের ভাষা সংস্কৃতির মিল ছিল না। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের ভাষা অপভ্রংশ থেকে বাংলা হয়। এসব নিয়ে, ঐতিহাসিকদের নানা মন্তব্যের আলোকে মতিউর রহমান লিখেছেন, বাংলা একটি প্রাচীন দেশ হলেও রাজনৈতিকভাবে এটা ঐক্যবদ্ধ হয় মুসলিম শাসনামলে এবং বাঙালি জাতি হিসেবে এর পরিচিতি ঘটে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে। সে দিক থেকে বাঙালি জাতির প্রথম রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বলে মনে করেন তিনি।

অপর দিকে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি, বাঙালি জাতিকে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র্য করেছে, এমন তথ্য দেন Samaren Roy তাঁর *The Roots of Bengali Culture* গ্রন্থে :

> A serious anthropological study into the history and culture of Bengal will perhapsreveal significant facts abou rigour of the distinctive social and religious practices of Eastern

> India, which kept its tradition so much apart from the Aryan vedic tradition of Northern India. This distinctive social tradition which permeated even the later Brahmin-dominated society of Bengal, should be studied properlyin order to discover the roots and history of Bengali culture, which still distinguishes Bengalis from the peoples of other parts of India.(Samaren, 1981 : 23)

বাঙালি বলতে আমরা মাত্র তাদেরই বুঝি যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাংলাদেশে এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক। এখানে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর মিশ্রণ থাকলেও, সবাই এক পর্যায়ে বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে ওঠে, এমন তথ্য উল্লেখপূর্বক অতুল সুর মনে করেন :

> বাঙলার এক স্বকীয় ভাষা ও এক বিশেষ সংস্কৃতি আছে। বাঙলার স্বকীয় ভাষা হচ্ছে বাংলা অন্যান্য রাজ্যের ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। এ ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল বাঙলার আদিম অধিবাসীরা। তারা যে প্রাক্-দ্রাবিরগোষ্ঠীর লোক ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলা ভাষার অন্তর্ভূক্ত এই গোষ্ঠীর লোকদের ভাষার শব্দসমূহের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই নরগোষ্ঠীর ভিত্তির ওপরই পরবর্তীকালে অন্যান্য নরগোষ্ঠী সমূহ স্তরীভূত হয়েছিল। এই অন্যান্য নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিল দ্রাবিড়-ভাষাভাষী, আর্য-ভাষাভাষী জাতিসমূহ ইত্যাদি। এদের সকলেরই ভাষা বাংলাভাষার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছে। (অতুল, ২০০৮ : ৪০)

তবে, প্রাচীন বাংলায় জনবসতি কখন শুরু হয়েছিল এবং তাদের পরিচয় কি ছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। *রিয়াজ-উস-সালাতী* এর লেখক গোলাম হোসেন সেলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে এ.বি.এম. শামসুদ্দীন আহমদ (২০০৭ : ১৪৯) লিখেছেন, প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন বাংলায় বঙ জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল। যে বঙ জনগোষ্ঠী তাদের অধ্যুষিত অঞ্চলকে বসবাসযোগ্য ও সুন্দর করে তোলে এবং তারা সে অঞ্চল শাসনও করেন। তবে তারা কতকাল শাসন করেছিলো তা জানা যায় না। একই সাথে কে.এম.মোহসীনের *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ* গ্রন্থেরও উদ্ধৃতি দিয়ে শামসুদ্দীন আহমদ লেখেন, বঙ জনগোষ্ঠীর পরে আরও কয়েকটি জনগোষ্ঠী-নিগ্রোটা, অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় গোষ্ঠী, মঙ্গোলয়েড, হোমো-আলপাইনাস প্রভৃতি প্রাচীন বাংলায় আসে এবং বসতি স্থাপন করে। এসব জনগোষ্ঠী প্রাক আর্যযুগে বাংলায় এসেছিলো বলে, এদেরকে বাংলার জনগণের আদি পুরুষ বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে (শামসুদ্দীন, ২০০৭ : ১৪৯) আরও জানা যায় যে, আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার আদিম অধিবাসীগণ, বিশেষ করে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গণ এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী ছিল। আর্যরা বাংলায় কখন এসেছিল বা তারা কখন তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, একথা জোরালোভাবেই বলা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে আর্যরা উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলায় প্রবেশ করে তারও অনেক পরে। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, প্রথম শতকে বা তার কিছু পূর্বে আর্যরা বাংলায় আসে। কিন্তু তাদের প্রভাব দৃঢ়ভাবে বিস্তার লাভ করে গুপ্তদের শাসনামলে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের তথ্য মতে শামসুদ্দীন লিখেছেন, বাংলায় আর্যদের বৈশিষ্ট্যাবলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় পাঁচ শতক থেকে।

এদিকে, জাতি পরিচয়ে আমরা অষ্ট্রিক-মঙ্গোলদের বংশধর, যাদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল; এমন মত আহমদ শরীফের। এই সংস্কৃতিকে চিরকাল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা উল্লেখ করে আহমদ শরীফ লিখেছেন যার প্রভাবমুক্ত হওয়া বাঙালির জন্য অসম্ভব। সে পরিচয় মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেও মুছে দেয়া যাবে না। বাঙালির চেতনায়, স্নায়ুতে, রক্তধারায় তা মিশে আছে– যুগ যুগ ধরে চলছে। সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, দেহতত্ত্ব – এগুলো হচ্ছে বাংলার আদি মঙ্গলদের দান, আর নারী দেবতা, পশু-পাখি, বৃক্ষদেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি হচ্ছে অষ্ট্রিকদের দান। এগুলোর মধ্যে মন-মানসিকতা ও মননের যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত আছে, তার প্রভাব থেকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কখনও মুক্ত ছিল না, আজও মুক্ত হয়নি, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। এ বৈশিষ্ট্য বাঙালির চরিত্রে ও জীবনে অন্তর্নিহিত (আহমদ শরীফ, ২০১৬ : ৪৪)। তিনি আরও যোগ করেন, বাঙালি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে কিন্তু কখনও সে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এসে নতুন রূপ পেয়েছে। সব শাস্ত্রই নতুন চরিত্র নিয়ে বাঙালি চেতনার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টেরও চার হাজার বছর পূর্বের এবং এই উপমহাদেশে আর্যদের আগমনেরও দুই হাজার বছর পূর্বের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য এই সভ্য জাতির রয়েছে। বর্তমানের বাংলাদেশে তখন দ্রাবিড়দের বসবাস ছিল, যারা বেবিলনীয় অঞ্চলের সেমিটিক বংশের সভ্য জনগোষ্ঠী ছিল, এমন তথ্য পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমদের (২০০৪ : ৩৮৬) লেখায়। তিনি উল্লেখ করেন, দ্রাবিড়রা ভারতে আসে আর্যদেরও বহু আগে এবং সিন্ধু অঞ্চলে বসতি গড়ে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, সেই সাথে বাংলাদেশেও আসে। তাই প্রাচীন বাঙালিরা এবং যারা পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার গোড়াপত্তন করেছিল, তারা একই বংশীয়। আবুল মনসুর ধারণা করেন, বাংলাদেশে সহজলভ্য উপকরণ দিয়েই তারা ইমারত তৈরি করে। যদিও সেই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, শিল্প ও সাংস্কৃতিক স্মৃতিচিহ্ন বাংলাদেশে বিরল। মহাস্থানগড় ও ময়নামতির তৎকালীন নিদর্শনগুলো বাংলাদেশের শিল্প ও স্থাপত্যের পর্যাপ্ত পরিচয় বহন করে না।

সাংস্কৃতিক নানা বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই সুপ্ত ছিল বাঙালি লোকগোষ্ঠী গঠনের সম্ভাবনা। তবে, বাঙালি লোকগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ মেলে কবে থেকে, এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন মমতাজুর রহমান তরফদার। তিনি Professor Barrie M. Morrison-এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন (২০১৬ : ৩১৬), মরিসন প্রাক-মোগল যুগে বাঙালি লোকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছেন- মোগল ও বৃটিশ আমলে বাঙালিগণ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল। সে যুগের সংস্কৃতি সম্বন্ধে মরিসনের নিম্নোক্ত উক্তি তুলে ধরেন মমতাজুর রহমান :

> There is sufficient evidence in copper plates as well as in the texts and traditions to suggest that there was developing within the sub-regions of Bengal a more homogenous local culture. These local cultures were expressed in the material culture with distinct agricultural implements, housing types and forms of village organization. They were reflected in caste distributions and social practices within families. At various times these

> differences have been observed in religious distributions with Buddhists, Brahmanas, Chaitanya Vasisnavas and Muslims. (মমতাজুর, ২০১৬ : ৩১৬)

মমতাজুর রহমান উপসংহারে মরিসনের (২০১৬ : ৩১৪) উদ্ধৃতি দেন, 'মোগল ও বৃটিশ আমলে শান্তির পরিবেশে পোষকতা পেয়ে বাঙালিগণ তাদের ধ্যান ধারণা প্রকাশের যখন সুযোগ পেল, তখন তারা সাহিত্য, ভাস্কর্য, বিদ্যাচর্চা ও চারুকারুশিল্পের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক অবদান রাখল। আত্মপ্রকাশের এই ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই নিজেদের চিহ্নিত করল, আত্মপরিচয়ের ধারণাও লাভ করল।'

বাংলা ভাষাও নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিল প্রাক-মোগল যুগেই; এমন কথার প্রমাণে মমতাজুর রহমান লিখেছেন, *চর্যাগীতি*র ভাষা যদি সমগ্র পূর্ব ভারতের ভাষা রূপেও গড়ে উঠে থাকে তবুও তো এই ভাষারূপের মধ্যেই বাংলা ভাষার আদি উৎসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। উড়িয়া, ভোজপুরী, মৈথিলি, আসামি, বাংলা প্রভৃতি একই উৎস থেকে আগত বলে উল্লেখ করেন তিনি (২০১৬ : ৩১৪-৩১৫)। প্রাক-মোগল যুগের এই বাঙালি লোকগোষ্ঠী একটি People বা সংগঠিত লোকগোষ্ঠীই, 'নেশন' বা জাতি নয়; উল্লেখ করে মমতাজুর রহমান (২০১৬ : ৩২২) যোগ করেন, উক্ত আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে এবং লোকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য স্বত্ত্বেও প্রবল রকমের কোনো বিরোধ ছিল না। তবে, বাঙালি লোকগোষ্ঠী গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহত করেছিল মোগল শাসনের বহির্মুখী চরিত্র এবং বৈষ্ণব আন্দোলন। বহু দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও দক্ষিণপূর্ব বাংলার কিছুসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান বাংলা ভাষাকে তাঁদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক রূপে চিহ্নিত করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন মমতাজুর রহমান।

বাংলাদেশের অধিবাসী বাংলাভাষী হলেও, অঞ্চলবিশেষে ভাষারীতির পার্থক্য, আচার, ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এই আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। জাতিভেদে নানা সাংস্কৃতিক প্রবণতা সত্ত্বেও, সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন – সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মানুপ্রেরণার মতো বিষয়গুলো মুখ্য ভূমিকা রাখে জাতি হিসেবে বাঙালি পরিচয় নির্ধারণে।

এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর তাঁর *সংস্কৃতির সংকট* গ্রন্থে লিখেছেন :

> বাংলাদেশের যে কোন অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ী ভাবে বসবাস করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে তারাই বাঙালী। (বদরুদ্দীন, ১৯৭৪ : ৫-৬)

বাঙালি সংস্কৃতি বলতে তিনি (১৯৭৪ : ১৮) দেশের অগণিত কৃষক, শ্রমিক আর মধ্যবিত্তের মাঝে প্রচলিত সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন। সময়ের সাথে সাথে সে সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হলেও, এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সামাজিক জীবনযাত্রার সাথে তার বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে। তবে, ধর্মীয় পটভূমি এই সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার কারণে, প্রতিটি বাঙালির সংস্কৃতিতে ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। আচার-অনুষ্ঠান আর ভাষার

ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায় এসব কারণেই। বদরুদ্দীন এক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভাব, অর্থনৈতিক অবস্থাকেও সংস্কৃতির ভেদাভেদ তৈরিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে বলে উল্লেখ করেন।

বাঙালির এবং বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক বা তার পরবর্তীকালের ইতিহাসে বঙ্গসংস্কৃতির উৎস ও ধারা অনুসন্ধান করেছেন নীলিমা ইব্রাহিম। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের পরিচয় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রথম পাওয়া যায় উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'একাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ বলতে প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র তটশায়ী সমস্ত ভূখণ্ডকেই বোঝাত। ধারণা করা হয়; বঙ্গাল বা বাঙ্গালদেশের কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। রাজা শশাঙ্ক অথবা বাংলার পাল এবং সেন রাজারা 'গৌড়' নাম নিয়ে বাংলার সমগ্র জনপদকে একত্র করবার যে চেষ্টা করেছিলেন, তা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। যে অংশ বঙ্গ নামে গৌরব অর্জন করল আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সে অংশ ছিল ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত। এ কারণেই শুরু থেকে অবহেলিত ও শুদ্ধ বাঙালির পরিচয় আমরা পাই প্রবাসে অমার্জিত রূপে।' (নীলিমা, ২০১৬ : ৩২৮)

বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক রীতি, প্রতিকূলতা; পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও শিল্পকলা নিয়ে বাঙালির ঔপনিবেশিক যুগের যে অহংবোধ; সে থেকে ধারণা করা যায়, জাতি হিসেবে বাঙালির আবির্ভাবের আগে উদ্ভব হয়েছে বাংলার সংস্কৃতি। এমন ভাবনার অবতারণা করে গোপাল হালদার লিখেছেন :

> 'বাঙলার সংস্কৃতি' – বাঙলার মাটি, বাঙলার জল ও বাঙলার জনজীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে। প্রায় হাজার বৎসর আগে "পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল।" ...সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতীয় শিষ্ট-সংস্কৃতির সহিত সমসাময়িক বাঙলা শিষ্ট-সংস্কৃতির যোগাযোগ দেখা যায়। তারপর পালযুগে বাঙালী নিজের একটা বিশিষ্ট স্থান সেই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়া ফেলিয়াছিল। (গোপাল, ১৯৭৬ : ১৭১-১৭২)

পাল ও সেন আমলের পর মধ্যযুগে তুর্কিবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি নতুন রূপে উন্নীত হয়। গোপাল হালদার লিখেছেন :

> বাঙলায়ও তখন দেখা যায় তেমনি সুযোগ ও সমন্বয় – সেই আউলিয়া, বাউল, সুফী, দরবেশ ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়া দল, সে মুসলমান শাসক, ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ধর্মপ্রচার, বৈষ্ণব মহাজনদের চেষ্টায় বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ, আর তেমনি ব্রহ্মণ্যধর্মের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচনা। বৈষ্ণব প্রেরণায় সেই সংস্কৃতিতে ষোড়শ-শতাব্দীতে একটা প্রবল স্রোত বহিয়া যায় – বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা জীবনযাত্রা একটা নিজস্বতা লাভ করে। (গোপাল, ১৯৭৬ : ১৭২)

মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ ও পাঠানরা দাবি করে যে তারা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এই পাক-ভারত উপমহাদেশে এসেছে; এমন তথ্য দেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (২০০৪ : ৩৫৬)। চট্টগ্রামের কিছু অধিবাসীদের দাবি তাদের শরীরে বইছে আরবদের রক্ত। হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের দাবি তারা পুরোপুরি আর্য

বংশোদ্ভূত। সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতিতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মিল আছে বলেও উল্লেখ করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এ দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারে তিনি জানান; খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা পশ্চিম থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশে আসে। পশ্চিমে তারা ইরানিদের এক জাতি ছিল। এখানে এসে তারা অনার্যদের বাস করতে দেখে, যারা হয়তো আগে পশ্চিম ও অস্ট্রোএশিয় দ্রাবিঢ় ছিল। আর্যরা পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভের শেষভাগে মোঙ্গলীয় জাতির তিব্বতীয়-বর্মীরা পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে। আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে আর্যরা উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে, উল্লেখ করে শহীদুল্লাহ লিখেছেন :

> পূর্ববাংলার ভাষাগত উচ্চারণ এটাই নির্দেশ করে যে তাদের ভাষায় তিব্বতীয়-বর্মীদের প্রভাব রয়েছে। আর্যদের বিশুদ্ধ তালব্য ধ্বনি তালব্য-দন্ত ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন আর্যদের ঘ, ধ, ভ এর উচ্চারণ হয়েছে গ,দ,ব। এছাড়া প্রতিবেশী তিব্বতীয়- বর্মীদের ভাষার কিছু শব্দ পূর্ব পাকিস্তানের ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের ভাষায় চলে এসেছে। অস্ট্রো-এশীয় লোকেরাই সম্ভবত বাংলার গণমানুষের ভিত্তিমূল। তবে একথা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে বাঙালিদের জীবনে আর্যদের সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। (শহীদুল্লাহ্, ২০০৪ : ৩৫৬-৩৫৭)

বৌদ্ধ পাল রাজাদের পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস সেভাবে জানা না গেলেও, বাঙালির লিখিত ইতিহাস অন্তত বারোশো বছরের। যার উল্লেখ পাওয়া যায় পাল রাজাদের সময় থেকেই। তবে, বাংলাদেশে যারা আদিকাল থেকে বাস করে আসছেন তারাই বাঙালি, এই যুক্তিকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৯৫)। পালটা যুক্তি দিয়েছেন, 'এই বৃহৎ বাংলার ভৌগলিক পরিমণ্ডলে নানা জাতির আগমন হয়েছে। পুরনো ভূখণ্ডে 'বাংলাদেশ' নামের অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে। তাই কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এক শ্রেণির মানুষের নাম হয় বাঙালি হিসেবে।' কিন্তু 'এই বাঙালি কারা?' এমন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা হিসেবে ফজলুল হক বলেন, খুব সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে – নানা রক্তের মিশ্রণ থাকলেও, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারাই বাঙালি।

অপর এক গ্রন্থে 'বাঙালি সংস্কৃতি' বলতে গোপাল হালদার (১৯৭৫ : ১) বুঝিয়েছেন 'বাঙালী জাতির জীবন-যাত্রা আর তার সংস্কৃতিকে।' আর সংস্কৃতির স্বরূপ তাঁর কাছে 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের বাস্তব ও মানসকি কীর্তি ও কর্ম, আধ্যাত্মিক চিন্তা, তার জীবনযাত্রার আর্থিক ও সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সেই সাথে নানা শিল্পসৃষ্টি।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

> 'বাঙালী সংস্কৃতি' কথাটিকে আমরা সাধারণত 'বাঙলার কাল্চার' কথাটির প্রতিশব্দ রূপেই প্রয়োগ করে থাকি। সে হিসাবে বাঙালী সংস্কৃতি বললে বোঝাতে চাই– আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি বা ইংরাজ আমলের 'বাঙলার কাল্চার।' নইলে বাঙালী সংস্কৃতি বললে বোঝান উচিত যে-দিন থেকে বাঙালী জাতি জন্মেছে সেদিন থেকে এই প্রায় হাজার খানেক বছরের বাঙালী সংস্কৃতিকে,– বাঙালী সমাজের হাজার বছরের রূপ ও তার বাস্তব ও মানসিক সমস্ত সৃষ্টিকে। (গোপাল, ১৯৭৫ : ১৫)

মূলত বাঙালি সমাজের সনাতন রূপ, তার বাস্তব ও মানসিক সমস্ত সৃষ্টিসম্ভার নিয়েই গড়ে ওঠে বাঙালি সংস্কৃতি। প্রায় হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ভারতীয় অন্যান্য প্রধান ভাষার সাথেই; এমন প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গোপাল হালদার লিখেছেন :

> বাঙালী সংস্কৃতি, মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি জন্মিল এতদিনকার (প্রাক-মুসলিম্) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া। বাঙালি সংস্কৃতি উহার মগধ-মণ্ডলের রূপ ঐতিহ্যের বিশেষভাবে অংশীদার হয়। ... কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির আদিযুগে (আনুমানিক খ্রিঃ ১,০০০-১,২০০ শতক) ও মধ্যযুগে (সাধারণভাবে মুসলমান আমলে) মোটামুটি এই সংস্কৃতির যে ভিত্তি ও যে গঠন ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা সূত্রেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি – শুধু পূর্বপ্রত্যন্তবাসী বলিয়া বাঙলার অধিবাসীরা ছিল উত্তর-ভারতের বা পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে আরও বিচ্ছিন্ন, ঐ সব সংস্কৃতি দ্বারা ক্রমপ্রভাবিত এবং ঐ সব উন্নাসিক শাসক শাস্ত্রকারদের চক্ষে (বেদ ও আরণ্যকের যুগ হইতেই) একটু অবজ্ঞাত; আচার-বিচারে শিথিল, ধ্যান-ধারণায় 'পাষণ্ডী' (heretic); ভাষায় সৃষ্টিতেও হয়ত অনিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্র সংগঠনেও কেন্দ্রানুগ নয় – বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, গৌড় বরেন্দ্র প্রভৃতি বিবিধ অঞ্চলে অঞ্চলে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। আবার উহারই মধ্যে আদিম বা অতি প্রাচীন ঔপজাতিক (tribal) কৌম-বন্ধন ও রাষ্ট্র-বন্ধনের অথবা ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ, জাতিভেদ শ্রেণীভেদের মধ্যে এই বাঙালী একেবারে তলাইয়া যায় নাই। (গোপাল, ১৯৭৬ : ১৭২-১৭৩)

বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জাতি-প্রথা এবং তাদের মিশ্র সংস্কৃতির মেলবন্ধনের কারণকে মুখ্য মনে করেন সমাজবিদরা। যার আভাস পাওয়া যায় আনিসুজ্জামানের (২০১৬ : ৫০) 'আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে। সেখানে বলা হয়েছে, নানা ভাষার সংস্কৃতির যোগসাধনে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটলেও, বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অনেক পুরনো। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির ভাষা। উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে এই গোষ্ঠির অন্যান্য ভাষা ছড়িয়ে আছে বিধায়, সেখানে বাংলার অনেক নিয়ম-নীতিরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আবার বাংলার আদি জনগোষ্ঠি ছিল প্রাক আর্য। তাই, দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসরত আর্য জনগোষ্ঠির সাথে ধান, তেল, হলদি, পান-সুপারি, সেলাইবিহীন কাপড় ব্যবহারে মিল আছে। এই রীতি-নীতিগুলো বাঙালির দেশজ উপকরণে পরিণত হয়েছে।

পরে মুসলমানদের দেশবিজয়ের ফলে, সেই সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে তুর্কি-আরব-ইরান-মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি। খ্রিস্টিয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও লিপির বিকাশ সে স্বাতন্ত্র্যকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। আনিসুজ্জামান বলেন :

> বহিরাগত মুসলমানরা এদেশ জয় করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে। মুসলমান শাসকেরা ভাষা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তার বিকাশে সহায়তা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে মুঘলরা বাংলাদেশ জয় করেন। মুঘল আমলে বাংলা ভাষা সাহিত্য আগের মত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নি। তবে একটা বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে তখন বাংলার সংস্কৃতির যোগ ঘটে। তারপর আঠারো শতকের মধ্য ভাগে ইংরেজ শাসন

> প্রবর্তিত হলে যোগাযোগের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়; বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার যোগসাধিত হয়। (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ৫১)

ইতিহাসের এমন বাস্তবতার নিরীখে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বাঙালির জীবনে কালের গ্রাসে ও প্রকৃতির অবিরাম তাণ্ডবলীলায় যা অক্ষয় রয়েছে, তা হল বাংলাদেশের সংস্কৃতি। এর কারণ হিসেবে আবুল মনসুর (২০০৪ : ৩৮৬) উল্লেখ করেন, এটি এ দেশের বদ্ধমূলে। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বাঙালির আত্মায়। মাঝে মধ্যে এই সংস্কৃতি বিদেশি সংস্কৃতি দ্বারা নিমজ্জিত হলেও, অন্তর্নিহিত উজ্জ্বলতার গুণে বাঙালি সংস্কৃতি তার প্রাক দ্যুতি পুনরুদ্ধার করেছে সগৌরবে।

সব শেষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনায় বাঙালি জাতি তারা, যে জনসমষ্টি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে। একই সাথে তিনি বাঙালি সংস্কৃতির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেন :

> বাংলা দেশে, বাংলাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, শত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই বাঙালি সংস্কৃতি। এবং এই সংস্কৃতি, বাংলাভাষার সৃষ্টিকাল হইতে বাংলাভাষায় রচিত যে সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই 'বাংলা সাহিত্য।' (সুনীতিকুমার, ২০১৬ : ৪৩৯)

ভাবনার সমর্থনে সুনীতিকুমার (২০১৬ : ৪৩৯) আরও যোগ করেন, এই যে বাংলা ভাষা-ভাষী, যারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বাস করছে এবং বাংলার বাইরে অ-বাঙালিদের দেশে গিয়ে বাস করে, তারা সবাই একে অন্যের মধ্যে ভাষাগত স্বাজাত্য অনুভব করে। কারণ, জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা।

ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হলেও, ভাষা যদি ভিন্ন হয়, তবে সেখানে সম্পূর্ণ ঐক্য বা স্বাজাত্য-বোধ আসা প্রায় অসম্ভব। এমনি নানাবিধ আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা যায় গোলাম মুরশিদের বক্তব্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন :

> ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর আগে সত্যিকার বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করেনি। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে অখণ্ড বঙ্গদেশও গড়ে ওঠেনি। আর এ অঞ্চলের লোকেরা বাঙ্গালি বলে পরিচিত হননি আঠারো শতকের আগে। সুতরাং তেরো-চোদ্দ শতকের আগেকার সংস্কৃতিকে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হিশেবে বিবেচনা করতে পারি, কিন্তু তা সত্যিকার অর্থে বাঙালি সংস্কৃতি নয়। (গোলাম মুরশিদ, ২০০৬ : ২৬)

বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ ও আদ্যপান্ত জানতে পূর্ববর্তী সংস্কৃতির ধারা সম্বন্ধে সম্যক জানা আবশ্যক মনে করেন মুরশিদ।

আলোচনার বক্তব্য হিসেবে বলা যায়, হাজার বছর ধরে বাংলা ভূখণ্ডে বিচিত্র জাতির আগমন, তাদের জীবনসংগ্রামের যুথবদ্ধ মনোভাব তাকে বেগবান ও বিকশিত করেছে। নানা বর্ণের মিথষ্ক্রীয়ায় পরস্পর বিরোধীতা, বিচ্ছিন্নতা, নানা বৈচিত্র্য সামাজিক জীবনের সাধারণ ঘটনা হলেও, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নিরন্তর চেষ্টায় সমাজ ও পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে বাংলার মানুষ। এর মাঝে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য, সামাজিক বা অর্থনৈতিক উৎসবের মতো রীতি-প্রথা দৃঢ় করেছে সামাজিক বন্ধনকে। সময়ের সাথে সাম্প্রদায়িকতা অগ্রাহ্য করে তৈরি হয়েছে নিজস্বতা, গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় সংস্কৃতি; যা জাতি হিসেবে বাঙালির অর্জন।

বাঙালি সংস্কৃতির সংকট

একটি জাতির অধিকার-চেতনা, দেশপ্রেম, আত্মসম্মানবোধ সবকিছু তার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। তাই কোনো দেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করা গেলে সে জাতির সামগ্রিক জীবনকে নিশ্চিতভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে অতুল সুর (২০০৮ : ১২) লিখেছেন, পাল বংশের রাজত্বকালই হচ্ছে বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। সে সময় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। বাঙালির প্রতিভা বিকাশের এটাই ছিল এক বিস্ময়কর সময়। পালেদের পর সেনবংশের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সেনযুগেই প্রথম দৃঢ় রূপ ধারণ করে। সেন বংশের লক্ষণসেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পর আরম্ভ হয় বাঙলার বিপর্যয়ের যুগ। মূর্তি ও মঠ-মন্দির ভাঙা হয়। হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হয়। আর শুরু হয় ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ। এটাই ছিল ধার্মান্তরকরণের প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে আর হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হতো না। হিন্দুসমাজ এসময় প্রায় অবলুপ্তির পথেই চলেছিল।

সে যুগে নতুন করে একটা সমাজবিন্যাস ঘটে, উল্লেখ করে অতুল সুর (২০০৮ : ১৩) যোগ করেন, সে সমাজে উদ্ভূত কৌলীন্যপ্রথা সমাজে এক যৌনবিশৃঙ্খলতা আনে। অতুল তাঁর লেখায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, তাঁদের মতে – এমন কৌলিন্যপ্রথার ফলে বাঙলার কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে এভাবে দুষিত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। বাঙালি সমাজকে আরও বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল বিদেশি বণিকদের আগমন :

> ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরাই প্রথম এদেশে আসে। তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পর্যায়ে শুরু হয় নারী ধর্ষণ ও অবৈধ যৌনমিলন। বাঙালি মেয়েদের রক্ষিতা হিসেবে রাখবার ফারমান (firman) পর্তুগীজরা পায় মুঘল দরবার থেকে। কিন্তু পর্তুগীজদের পরে ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন তারা বিনা

> ফারমানেই বাঙালি মেয়েদের রক্ষিতা হিসেবে রাখতে শুরু করে। ... এক কথায় সমাজ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথেই চলছিল। (অতুল, ২০০৮ : ১৩)

এরই পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয় নবজাগৃতি (Renaisance)। নবজাগৃতির ফলে সমাজ সুসংহত হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজে আবার প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক শৈথিল্য। অতুল (২০০৮ : ১৩) আক্ষেপের সাথে লিখেছেন, বাঙালির যে প্রতিভা একদিন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে যে, 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow', তা যেন আজ কালান্তরের গর্ভে চলে গিয়েছে। বাঙালি আজ তার নিজস্ব সংস্কৃতির স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। অশনে-বসনে আজ সে হয়েছে বহুরূপী। আজ সে এক বর্ণচোরা জারজ সংস্কৃতির ধারক। বাঙালির বিবর্তনের এটাই শেষ কথা।

ঐতিহাসিক নানা চড়াই-উৎরাইয়ে সংস্কৃতির যে ধারা বাংলাদেশে বিকশিত হয়েছিল এবং যা এখনো কিছু বহমান, সেই ধারার সাথে আধুনিক বিবর্তিত সভ্যতা যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছে, এমন আশঙ্কার কথা বলেন গোপাল হালদার :

> 'কৃষ্টি' বলিতে আমরা যদি উহার মূলগত কৃষ্ধাতু ও কৃষির উপর জোর দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি – 'বাঙলার কাল্চার' কৃষি বা কৃষকের সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না– ইহা বাবুদের জিনিস, 'বাবু কালচার'। এই জন্যই আমরা 'বাঙলার কাল্চার' বলিলেই বুঝাই ভদ্রলোকের জিনিস; এই কথা মনে মনে বুঝি বলিয়াই বলি, অন্য প্রদেশে 'ভদ্রলোক' নাই। (গোপাল, ১৯৭৬ : ১৭১)

উপর্যুক্ত ভাবনায় মিল পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাছেও। 'সভ্যতার সংকটে' তিনি বলেছেন :

> সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্বশাসন-চালিত দেশে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৭৪৩)

বাঙালির জীবনে সভ্যতার এই সংকট তার সাংস্কৃতিক জীবনকে করে তুলেছে দুরূহ।

উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙালি মুসলমানরা সনাতন সাহিত্যিকদের শিল্পকর্মকে বাঙালি ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে সাংস্কৃতিক সংকটকে ঘনিভূত করেছে। পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকের ধারণা ছিল, বাঙালি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিলে ধর্মনাশ হবে, সেই সঙ্গে তাদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদ শিথিল হবে। ফলে, বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি এই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হলো – তাদের পরিচয় 'বাঙালি' না 'মুসলিম'! দৃষ্টিভঙ্গীর ভারসাম্যের এই অভাববোধই তাদের সৃষ্টিহীনতার জন্যে দায়ী। উপরের তথ্যসমূহ উল্লেখ করে বদরুদ্দীন উমর যুক্তি দেখিয়েছেন :

> রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ভারতীয়, কাজী নজরুল সে অর্থেই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী ভারতীয়। ...কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মুমীনের দল যতখানি আত্মবিশ্বাসের সাথে মাদল বাজিয়েছেন, নজরুলের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে ততখানি করার সাহস তাঁদের এখনো নেই। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বিশ্বাসের বিস্ফোরণ হলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ নজরুল-রবি ঠাকুরকে বাতিল না করলে হাতিম তাঈয়ের পুঁথি, কাওয়ালি আর মর্সিয়া সাহিত্যে রসিকজনের মন বসবে কেন? (বদরুদ্দীন, ১৯৭৪ : ১১২-১১৩)

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়' বিধায়, তাঁর গান শোনা ও তাঁর সাহিত্যচর্চায় ধর্মনাশ হবে বলে যারা মনে করেন, তারাই মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, তক্ষশীলাকে পাকিস্তানের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সগৌরবে প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করেন না বলে মন্তব্য করেন বদরুদ্দীন (১৯৭৪ : ১১২)। রবীন্দ্র-বিরোধিতা যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলা ভাষা সরলীকরণ, নববর্ষ উৎসব বন্ধ করার এক দুরভিসন্ধি। যার সাথে ১৯৪৮ ও ১৯৫২'র ভাষা বিরোধী প্রচেষ্টার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বদরুদ্দিন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন :

> যতদিন না আমরা চন্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক হিসেবে গণ্য এবং স্বীকার করতে শিখবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টির গতিবেগ সঞ্চার করতে আমরা সমর্থ হবো না। আমাদের চারিধারে নানাপ্রকার কৃত্রিম বাধার দেওয়াল তুলে আমরা নিশ্চল ডোবার পানিতেই শুধু অবগাহন করবো। এর বেশী অন্য কিছু সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আমাদের দ্বারা আর সম্ভব হবে না। (বদরুদ্দীন, ১৯৭৪ : ১০-১১)

বাঙালি সংস্কৃতির সংকট ধর্ম প্রভাবিত হলেও, বদরুদ্দীন মনে করেন, কে কোন ধর্মাবলম্বী – এটি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত নয়, তেমনি পাশ্চত্য বিদ্বেষও অপ্রাসঙ্গিক :

> ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে হয় বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন। আবার হিন্দু বিদ্বেষের ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলা সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা গঠন করতে উদ্যত হয় তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি। এ প্রচেষ্টা যে কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক সেটা তার ব্যর্থতার দ্বারাই অনেকাংশে প্রমাণিত হয়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখার চেষ্টার মধ্যেই 'আমরা বাঙালী না মুসলমান?' এ প্রশ্নের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই এ চিন্তাধারার বিকাশ। (বদরুদ্দীন, ১৯৭৪ : ২-৩)

ধর্মকে স্বার্থসাধনে ব্যবহার করার অবান্তর কিছু কৌশল, প্রকৃতপক্ষে সামাজিক দুর্বলতাকেই জোরদার করে। আর ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির মনোবৃত্তি যেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হীনমন্য জাতির পরিচায়ক। বাঙালি সংস্কৃতির প্রবহমান স্রোত, স্বার্থচিন্তা ছাপিয়ে যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত নয় বলেই, বাংলা ভাষাভাষি জনগণ সত্যিকার অর্থে তাদের সংস্কৃতির সুফল ভোগ করতে পারেনি বলে মনে করা হয়।

এর সাথে যোগ হয়েছে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যবাদ, যা ধীরে ধীরে ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির ধারাকে বিলীন করে দিয়েছে; বলে মনে করেন কে. এম. মোহসীন :

> এখনকার যুবক শ্রেণি সাধারণত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে উগ্রপন্থি দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। তারা উচ্চ কণ্ঠের গান শুনছে এবং বিদেশী ফ্যাশন গ্রহণ করছে। অধিকন্তু চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহে, চলচ্চিত্রের পোস্টারে, চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে এবং বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে সবশেষের প্রযুক্তির সুবিধাদিসহ প্রলোভনদায়ক আধুনিক জীবনের হাতছানি আছে; অন্যদিকে রয়েছে দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপব্যবহার ও শোষণের ব্যাপকতা। পাশ্চাত্যের আধুনিক ও আধুনিকোত্তর সংস্কৃতির প্রভাব বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করছে। এর ফলে আমাদের ঐতিহ্যিক মূল্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। (মোহসীন, ২০০৭ : ৬৩৫)

সামাজিক অবকাঠামোকে ভিত্তি করেই ধর্মনীতির মতো সংস্কৃতির বিচরণ। যেখানে আছে নীতিবোধ, শিল্পসাধনা, রাজনীতি, বৈশ্বিক জ্ঞান। সামাজের পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় ভাঙা-গড়ার মাঝেও, মূলত সাম্প্রদায়িকতা যে পর্যন্ত বাঙালির মনজগতে বিরাজ করবে, সে পর্যন্ত মুক্তি মিলবে না এই বিপর্যয়ের হাত থেকে – এমন আশঙ্কা সমাজবিজ্ঞানীদের।

বাঙালি সংস্কৃতির সম্ভাবনা

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ সময় যেমন অতিক্রম করেছে, তেমনি সাধনা আর সংগ্রামে প্রতিহত করেছে সেই দুঃসময়কে। আশার কথা এই যে, সংকট মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস বাঙালির জীবনে অন্তহীন। সীমাহীন প্রচেষ্টায় মানুষ শোধন করেছে বিরুদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে, জয় করেছে 'ব্যক্তি আমি'র ষড়ঋপুকে। এর চালিকা শক্তি ছিল অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, যোগ্য নেতৃত্ব, সর্বপোরি নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস। এই আচরণসমূহ সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যে সাংস্কৃতিক সংকট তৈরি হয়েছিল, তা মুসলমান মধ্যবিত্তের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও গ্রামবাংলায় এ জাতীয় সংকট তৈরির সুযোগ হয়নি। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর (১৯৭৪ : ১১-১২) বলেন, গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনেক আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার মেলবন্ধন ঘটেছিল। যার উদাহরণ- বাংলার লোকসাহিত্য। মধ্যবিত্তের এ সংকট মুখ্যত সাম্প্রদায়িকতা-সৃষ্ট এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিই এই সাম্প্রদায়িকতার জনক। সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মুসলমানেরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে সহজে প্রস্তুত হন না। এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে, বদরুদ্দীন সাম্প্রদায়িকতা মুক্তির পথ খুঁজেছেন :

সাম্প্রদায়িকতা যখনই তীব্র আকার ধারণ করেছে 'আমরা বাঙালী না মুসলমান?' এ-প্রশ্ন তখনই আনুপাতিক প্রচণ্ডতার সাথে মাথা তুলে এ সাংস্কৃতিক সংকটকে করে তুলেছে দুরূহতর। এজন্যেই সাম্প্রদায়িকতা যে পর্যন্ত আমাদের মানসলোকে রাজত্ব করবে সে পর্যন্ত আমরা এই সাংস্কৃতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবো না। এ সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পথ সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বস্তরে এবং সর্ব ভাবে খর্ব করা এবং উত্তীর্ণ হওয়া। এ প্রচেষ্টায় সফলকাম হলে 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী?' এ ধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন বাঙালী মুসলমানেরা আর কোনদিন নিজেদের কাছে উত্থাপন করবে না। এবং তখনই তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হবে নিজেদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়। (বদরুদ্দীন, ১৯৭৪ : ১১-১২)

বাংলার ঐতিহাসিক নিদর্শন, সাহিত্য আর পুরাকীর্তিগুলোও সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে স্বমহিমা প্রকাশ করে চলেছে। সে প্রসঙ্গ তুলে ধরে আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছেন :

কালের ক্ষয় অতিক্রম করে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, লালমাই প্রভৃতি স্থানে বাঙালির প্রাচীন সভ্যতার যেসব নিদর্শন টিকে আছে, সেগুলো এক আলোকোজ্জ্বল অতীতের প্রমাণ দেয়। শীলভদ্র-দীপঙ্করের কালের পরিচয় নিতে গেলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে কালটা ছিল বাঙালির ইতিহাসে এক জাগ্রত চেতনার কাল। পাল রাজাদের সময়টাতে বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে, বাঙলাভাষী প্রায় সমগ্র ভূ-ভাগে দেখা দিয়েছিল এক জাগরণ। পরে পাঠান সুলতানদের কালে বাঙলা ভাষায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সেকালের বাস্তবতায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ চিন্তারও পরিচয় আছে সেকালের অনেক গ্রন্থে। একদিকে ইসলামের স্পর্শে বাঙালির জীবনে নবচেতনা, অপরদিকে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনে বাঙালির জাগরণ। ষোড়শ শতাব্দী বাঙালীর ইতিহাসে আর এক জাগরণের কাল। তারপর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মস্থ করে উনিশ শতকে বাঙালি আবার জেগেছে। প্রথমে বৌদ্ধিক জাগরণ, পরে গণজাগরণ – উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত। বিশ শতকে নানা বিপর্যয় অতিক্রম করে ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন জাতীয় সংস্কৃতি দানা বেঁধেছে ও বিকশিত হয়েছে। (আবুল কাসেম, ২০১৫ : ৫৯)

বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান বাংলার সংস্কৃতিকে দান করেছে স্বাতন্ত্র্য। যার প্রভাব পড়েছে সঙ্গীত, শিল্পকলা, কাব্য, মৃৎশিল্পে। আনিসুজ্জামানের ভাষায় :

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ বাংলায় বিভিন্ন রাজত্ব যেমন স্থায়িত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি বাংলার এই বিচ্ছিন্নতার ফলে ধর্মমতের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও উদ্ভাবন দেখা দিয়েছে। বাংলার সাহিত্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য গান করে লেখা 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব পূর্ববঙ্গের জলাভূমিতে, পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ মাটিতে বিকাশ বৈষ্ণব পদাবলীর। নদীমাতৃক পূর্ব বঙ্গে ভাটিয়ালি গানের বিস্তার, শুষ্ক উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়ার, আর বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কীর্তন ও বাউলের। শিল্পসামগ্রীর লভ্যতাও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই বাংলার স্থাপত্যে পাথরের চেয়ে ইট আর মাটির প্রধান্য, মৃৎফলক এখানকার অনন্য সৃষ্টি। (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ৫০-৫১)

বাংলার মানস-সংস্কৃতি প্রধানত আশ্রয় করেছে আধ্যাত্ম চিন্তা, সাহিত্য ও বঙ্গীয় দর্শনকে। খুব বড় পরিসরে না হলেও, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে বাংলার দান অস্বীকার করার উপায় নেই, বলে মনে করেন তিনি।

বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকশিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে বদরুদ্দীন উমর (১৯৭৪ : ১১৪) ইতিহাসকে বিবেচনায় নিয়ে বলেন, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, কারণ সমস্যাটি ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে অচ্ছেদ্য। সেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়ার পরও থেমে নেই ভাষা সাহিত্যের ওপর আক্রমণ। এখন এই আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করতে ভাষা-সাহিত্যের সাথে বৃহত্তর জীবনের নিবিড় যোগাযোগের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এই চেতনাই পারে দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে, বাংলা ভাষা সাহিত্যচর্চাকে অব্যাহত রাখার আন্দোলন সফল করতে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯৮৮ : ১০-১১) মনে করেন, দুঃশাসনের ফলে দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসক এবং শাসন পদ্ধতি পরিবর্তন করা যায়। তবে, প্রবহমান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমন সশস্ত্র বিপ্লব না হলেও, এর ওপর জবরদস্তির ফল কখনোই ভালো হয় না।

বঙ্গীয় সংস্কৃতির সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করতে আত্মপ্রবঞ্চনা পরিহার করে, সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান আহমদ শরীফ :

> আমদের কিছু নেই, কিছু সম্ভাবনা তো আছে? আমরা গড়ে নেব, চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের কিছু আর্য, কিছু আরবি, কিছু ইরানি ইত্যাদি করে আমরা যেন আর আত্মপ্রবঞ্চনা না করি। আমাদের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচিত হবে জনপদভিত্তিক, মধ্যযুগের ইতিহাস হবে অঞ্চলভিত্তিক, আধুনিক যুগের ইতিহাস হবে বাঙালি জাতিসত্তার চেতনা ও পরিচিতিভিত্তিক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজব জীবিকা পদ্ধতিতে এবং সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র দর্শনে, মধ্যযুগে খুঁজব জীবন-জীবিকার অরি-মিত্র দেবকল্পনায় ও বিদেশি প্রভাবে এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসে সন্ধান করব ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা। আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করলে, চেষ্টা করলে বাঙালি উন্নতি করবেই – এটা বিশ্বাস করি। (আহমদ শরীফ, ২০১৬ : ৪৯)

এমন নানা বাস্তবতায় আবুল কাসেম ফজলুল হক মনে করিয়ে দেন, সমাজের খেটে খাওয়া মানুষেরা সবদিক থেকেই পশ্চাৎবর্তী। আর আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি অবক্ষয়ক্লিষ্ট। তবে, পশ্চাৎবর্তীতার সমস্যা আর অবক্ষয়ক্লিষ্টতার সমস্যা এক ব্যাপার নয়, উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

> পশ্চাৎবর্তী জাতি উন্নতিশীল হতে পারে; কিন্তু অবক্ষয়ক্লিষ্ট জাতি অবক্ষয়ের ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারলেই কেবল উন্নতির উপায় করতে পারে। বাংলাদেশে জনগণের সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটলে গণবিরোধী নেতৃত্ব আর বাইরের আধিপত্যবাদী শক্তি নানা ষড়যন্ত্রের দ্বারা অচিরেই তাকে বিকৃত করে দেয়। জনগণের মধ্য থেকে, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা সৃষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত

> রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণচেতনার বিকাশ ঘটলেই অপসংস্কৃতির স্থলে সংস্কৃতির সূচনা হবে। (আবুল কাসেম, ২০১৬ : ৬৪-৬৫)

মানুষ যা চায়, তাতে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী জেনেও, ইতিহাসের সাফল্য তুলে ধরে তিনি যোগ করেন, সমূহ ধ্বংসের আয়োজনও আমাদের ধ্বংস করতে পারেনি। কারণ আমাদের অবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে এবং অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সবাই সচেষ্ট। সে জন্যই মানুষ চিন্তা করে, কাজ করে, গড়ে উঠতে ও গড়ে তুলতে চায়। নিজেদের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুললে জয় সুনিশ্চিত বলে মনে করেন তিনি।

মানুষের অপার সম্ভাবনার প্রতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছেন রবীন্দ্রনাথও। তাঁর সভ্যতার সংকটে আছে সেই স্তুতি :

> আশা করব – মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৭৪৪)

এ যাবৎ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বাংলা ভূখণ্ডে যত জাতি, ধর্মের বা ভাষাভাষি জনগণের আগমন ঘটেছে, তার বিশেষ প্রভাব রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর। সে অর্থে বাঙালি সংস্কৃতি মূলত সমন্বয়বাদী। এই সমন্বয় ধর্মীতার প্রভাব আছে সমাজ, শিল্প, কারুকলা, স্থাপত্যসহ সব বিষয়ে।

ধারণা করা হয়, আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারীরা হয়তো সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে শুরু করে আবির্ভাব ঘটে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মের। তাই ধর্ম, লোকাচার, অভ্যাস, মূল্যবোধ বা ব্যবহার্য উপকরণে একটি বিশেষ ছাপ, বাঙালি হিসেবে তার সংস্কৃতিকে বিশিষ্ট্য ও মহিমান্বিত করে।

আলোচনায় বাঙালি কারা, জাতি হিসেবে তার উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য, বাঙালি সংস্কৃতির সতন্ত্র রূপ, সময়ের সাথে তার বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা পাওয়া দূরূহ। তবে একথা বলা যায়, প্রাচীন কালের গুহাচিত্র সংস্কৃতি থেকে আজকের নগর সভ্যতায় পৌঁছুতে মানবিক ও প্রাকৃতিক সবকিছুই একটি জাতির সংস্কৃতির অন্তর্গত। সেই ধারায় ইতিহাসের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাঙালি তার ভাষা-সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প নৈপূণ্যে তৈরি করতে পেরেছে সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ।

ইতিহাস পর্যালোচনায় বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণে অনেক সীমাবদ্ধতা, নেতিবাচক দিক ও ভ্রান্তচিন্তার নজির পাওয়া যায়। বাঙালির হাজার বছরের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার

গভীর ষড়যন্ত্র, ভাষা বিকৃতির অপচেষ্টা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দেবার মতো অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে হতাশা আর সংকট আবর্তিত হলেও, সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে দেখা মিলেছে অমিত সম্ভাবনার। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জাতিগত সংকীর্ণ সীমানা আর সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারীগণ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন নিজেদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়। মনন ও দর্শনে, কৃষ্টি ও সাহিত্যে, ইতিহাস ও চেতনায় বাঙালির যে নিজস্বতা, তা চর্চার মাধ্যমেই পরিশীলিত হতে পারে উন্নত চেতনার প্রকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উৎসব : উদ্ভব ও বিকাশ

উৎসব

প্রাত্যহিকতার মাঝে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যাপিত জীবনে উৎসব নিয়ে আসে প্রত্যাশার আলো। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে জীবনবোধের অঙ্গীকার নিয়ে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায় উৎসব। জীবনে উৎসব না থাকা মানে জীবনের বর্ণ, বৈচিত্র্য ও আশীর্বাদকে যেন দূরে ঠেলে দেওয়া। প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মাঝে স্থিতি আর আনন্দঘন সম্মিলনের তৃপ্তি পেতেই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে আহ্বান করে তার সহগামীকে।

উৎসবের মিলনে সত্যের উপলব্ধি, প্রেমের পূর্ণতা আর সেখানেই উৎসবের সার্থকতা; বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *উৎসব* প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন – এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। ... মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। ... এই প্রেমই উৎসবের দেবতা–মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ :৩৩৫)

তাই উৎসব একার নয়। এ এক কল্যাণী অনুভূতি, প্রেমের আনন্দ উপলব্ধি ও বিকশিত করার সমন্বয়ী প্রতিভা। আর বাঙালি সেই প্রাণপ্রাচুর্যের ধারক, কারণ সে উৎসবে উৎসাহী। আর উৎসবের ইতিবাচক দিক হল, তা সব ধর্মকে সম্মান জানাতে শেখায়। এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> The Bengalis were religious but they had hardly shown interest for religious reasond only. Due to the infiltration of a lot of popular elements in their religion and festival there has been a growth of tolerance among the different communities and people have learnt to respect each other's religion. (Muntassir, 1996 : 13)

উৎসবকে আনন্দের সহযাত্রী বলেছেন আতোয়ার রহমান (১৯৮৫ : ১)। কিন্তু সেই আনন্দের স্বরূপ আর ব্যাপকতার বিষয়ে বাংলা অভিধানেও স্পষ্ট ধারণা নেই, এমন আক্ষেপ করে উৎসব সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন তিনি। পারিবারিক আঙিনায় সীমিত ব্যক্তিগত আনন্দানুষ্ঠান যেমন উৎসব, তেমনি সমাজের দশজনকে নিয়ে বা সর্বজনীন অনুষ্ঠানও উৎসব (১৯৮৫ : ২)।

আভিধানিক সংজ্ঞায় বিয়ে আর নববর্ষের আনুষ্ঠানিকতা, উৎসবের বিচারে সগোত্র। ইংরেজি অভিধানে উৎসব, 'a joyful or honorific celebration' হলেও সে সংজ্ঞায় ভোজও সংযুক্ত; উল্লেখপূর্বক আতোয়ার

রহমান যোগ করেন, ব্যক্তি বা পরিবার ছাপিয়ে, ওই উৎসবগুলোয় সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা মুখ্য। বাঙালি উৎসব সেখানে নির্দিষ্ট ঋতু বা দিনের অনুষ্ঠানমালার সমাহার। এসব অর্থে উৎসব ব্যক্তি, পরিবার বা স্থানের সীমার উর্ধ্বে। 'প্রধানত সর্বসাধারণ বা বহুজনের জন্যে নির্দিষ্ট দিন, সময় বা ঋতুতে এক বা একাধিক স্থান কিংবা বিশেষ কোনো সমাজে বা সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠেয় আনন্দজনক ক্রিয়াকর্মই উৎসব।' (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ২-৩)

ফোকলোরবিদ উইলিয়াম উইগিনস উৎসবের সঙ্গে মুক্তির বিষয়টি যুক্ত করেছেন, উল্লেখ করে শামসুজ্জামান খান (২০১৩ : ১৫) সে উদ্ধৃতি তুলে ধরেন : '... the festival of freedom was an event which the community understood to be an essentional part of its past and present.'

আভিধানিক অর্থে উৎসব আনন্দময় অনুষ্ঠান হলেও, সে আনন্দের ভাবাদর্শ সবক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হয় না উল্লেখ করে, খোন্দকার রিয়াজুল হক (১৯৯৫ : ভূমিকা) লিখেছেন; উৎসবে সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদানই শুধু নয়, এতে মিশে আছে মানুষে মানুষে সম্পর্কের উত্তম দিকগুলোও। জনজীবনের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান মেলে উৎসবে। তাই দেশের জনজীবনের সঠিক পরিচয় জানতে সে দেশের উৎসবের উৎস, স্বরূপ ও ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা জরুরি। দেশব্যাপী উৎসবে সমগ্র দেশ ও জাতি বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতিতে যেন নিজের স্বার্থকতা খুঁজে পায়।

সমাজজীবনের সঙ্গে উৎসবের যোগসূত্রের বিষয়টি সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : উৎসবের 'মধ্য দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনের একটা আন্দাজ পাচ্ছি।' এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এডিস টার্নারের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি বলেন, উৎসবকে কেন্দ্র করে সমাজ নিজেকে প্রসারিত করে। সে নিজের দিকে তাকায়, সেই সঙ্গে বৃহত্তর জগতের দিকে মেলে ধরে তার দৃষ্টি। ফলে উৎসব হয়ে দাঁড়ায় এক ধরণের আত্ম-প্রতিফলন (সুমহান, ২০১৪ : ৯১, ৯৩)। লেভিনসন এবং এম্বার-এর কোষগ্রন্থে উৎসব নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গক্রম তুলে ধরেন তিনি। যেখানে বলা হয়েছে, মানবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল উৎসব। যা কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার আবশ্যিক উপাদানগুলিকে প্রকাশ করে। সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধরনের দিকগুলোকে বলেন সামাজিক সংস্থান – অর্থাৎ প্রথাগত, নির্দিষ্ট আচার সমন্বিত, নিয়মিত সংঘটিত ব্যবহার-রীতি। (সুমহান, ২০১৪ : ৯১)

উৎসবের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভব নয় বলে মনে করেন মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। তিনি লিখেছেন (২০০৭ : ৭৯), ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারিত এলাকার বসবাসরত মানবজাতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট উপলক্ষকে কেন্দ্র করে যৌথ উপলব্ধিতে আনন্দ বিনিময় ক্রিয়াই উৎসব। তবে সিরাজুল ইসলামের উৎসবের সংজ্ঞায় আনন্দ সম্মিলনের পাশাপাশি বেদনাবোধে একাত্ম হবার বিষয়টিও সম্পৃক্ত। বিশদভাবে তিনি উল্লেখ করেন :

> মানব জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ব্রতাচার, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশে দল-মত নির্বিশেষে সকলের ঐকান্তিক মিলন মেলার সংযোগে সকলের মনে আনন্দের ঢেউ কিংবা বেদনার বার্তা সকলের মধ্যে মিলিয়ে দেয়ার মাঝে তথা সমবেত হওয়ার যাবতীয় ক্রিয়াকর্মকে উৎসব বলে। কোনো নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অথবা বাহিরে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং গোত্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচারের সম্পৃক্ত সর্বজনীন অনুষ্ঠান, যেখানে আগত দর্শক অংশগ্রহণকারী আমজনগণকে আনন্দ দান করে অথবা হর্ষ-বিষাদের মাঝে একই সূত্রে গ্রথিত করে সকলের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে তাকে উৎসব বলে। (সিরাজুল, ২০০৭ : ৮০)

কোনো বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ধর্মমত, গোত্র, বর্ণ এবং জাতিভেদে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জনসমাগম এবং আনন্দ-বেদনার সমবন্টনই উৎসব। সেই আয়োজনে প্রচলিত বিধি নিয়ম এবং ব্রতাচারের আনুষ্ঠানিক রীতি সম্পাদনও উৎসবের অংশ বলে মনে করেন সিরাজুল ইসলাম।

মানুষের প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছে উৎসব করার বৈশিষ্ট্য। উৎসবকে সর্বজনের মিলন ক্ষেত্র উল্লেখ করে একে অসংকোচ ও উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ বলে বিশেষায়িত করেছেন আলী আনোয়ার (২০০৮ : ১৬১)। তাঁর মতে, উৎসবে আনন্দমাত্রই সংক্রামক, যা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাইকে এক উন্মুক্ত চাতালে আহ্বান করে। যে আহ্বান অগ্রাহ্য করা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে দুর্দমনীয়। মূলত সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা পারিবারিক সমাবেশে মানুষে মানুষে বিরোধমুক্ত ও সংস্কারমুক্ত আনন্দ আয়োজন উৎসব। একের আবেগ, অনুভূতি ও শুভভাবনা অপরের সাথে ভাগ করে, অখণ্ড ঐক্যের চেতনাবোধে অন্তরাত্মাকে পরিপূর্ণ করে তোলাই উৎসবের মাহাত্ম্য।

সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম-সম্প্রদায়গত ভাবনায় সকল ক্ষুদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতার উর্ধ্বে উঠে উৎসবের আশ্রয় হয় মানব ধর্ম। ক্ষমা আর ত্যাগের মহিমায় একে অপরের সহযোগি হয়ে, মননের উৎকর্ষ সাধন প্রক্রিয়ার অপর নাম উৎসব। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব।' (১৯৬৭ : ৩৩৯)

উৎসব মূলত সমষ্টি-চেতনার ফল। একে অতি প্রাচীন সাংস্কৃতিক রীতি উল্লেখ করে শামসুজ্জামান খান (২০১৩ : ১৭) লিখেছেন, পৃথিবী জুড়ে উৎসবের রয়েছে নানা রূপ, বৈচিত্র ও স্থিতিস্থাপকতা। তবে পঞ্জিকার দিনক্ষণ অনুযায়ীই উদযাপিত হয় উৎসব। পারিবারিক, সম্প্রদায়গত বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উৎসবগুলো রীতি-প্রথা অনুযায়ী আলাদা হলেও, সমবেত আয়োজনে সম্পন্ন উৎসবে মানুষে মানুষে মিলন এবং আনন্দলাভই মুখ্য। তিনি যোগ করেন (২০১৩ : ১৭), 'মানুষের সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যসাধন ছাড়াও ব্যক্তিপ্রতিভার জীবন-বন্দনায় অন্য মানুষের আনন্দলাভও উৎসবের আর এক বড় অংশ।'

উৎসবের দিনে আমরা প্রতিদিনের কৃপণতা পরিহার করে যে উদারতার মানসিকতায় বহু লোকে মিলিত হই, সত্যি অর্থে তা আনন্দ এবং প্রেম। তাই উৎসবের দিনে ওঠে সাজ সাজ রব। হয়তো এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎসব অপরূপ :

> উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি। এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৩৮)

মনুষ্য সমাজে বিশেষ উপলক্ষের প্রায় অংশ জুড়ে যে আন্তরিক আনন্দযজ্ঞ, সেই আনন্দের কার্যকারণ ও দৃশ্যমান ক্রিয়া সবটার ভাষাগত প্রকাশ-উৎসব; যা একটি জাতির লোকধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যবান উপাদান।

কৃষিকাজের শুরুতে জীবিকার উৎসব থেকে শুরু করে, উৎসবের রূপরেখায় প্রাধান্য পেয়েছে ধর্ম, সংস্কৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, স্মরণানুষ্ঠান, পারিবারিক লোকাচারসহ বিবিধ প্রসঙ্গ। কালের অনন্ত প্রবাহে বাঙালির উৎসবে পড়েছে প্রাদেশিকতার ছাপ, বিবর্তিত সংস্কৃতির প্রভাব। কখনো উৎসব পেয়েছে নাগরিক রূপ; যেখানে যুক্ত হয়েছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাত্রা।

এমনি ভাবেই নিয়ত অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তনের শত-সহস্র স্রোত মানুষের জীবন ও সমাজের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। কালের গরিমায় অনেক কিছু বিবর্তিত হলেও, ম্লান হয় না উৎসবের ঐতিহ্য। এই উৎসব যেন প্রাচুর্য আর স্মৃতি কাতর আমেজ নিয়ে অতীত থেকে বর্তমানে টেনে দেয় মায়ারেখা। ইতিহাসে কান পাতলে শোনা যায় সেই উৎসব উদ্ভবের বিচিত্র গল্পের কথা।

উৎসবের শুরুর কথা

এ যাবৎকাল যে সব উৎসব উদযাপিত হয়ে এসেছে, এগুলো বহু দিনের সংস্কারের ফল এবং বিভিন্ন যুগে নানা বর্ণপ্রথার মানুষের বৈচিত্র্যময় সমাজব্যবস্থায় এর উদ্ভব – এমন দাবি সমাজ বিজ্ঞানীদের। তবে উৎসবের উদ্ভবকাল বিষয়ে নিখুঁত ধারণা দেয়াও প্রায় অসম্ভব বলে মনে করেন তাঁরা। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় আহমদ শরীফের লেখায় :

> এই বহু ও বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বণ, প্রথা-পদ্ধতি, দারু-টোনা-ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-মাদুলী-বাণ-উচাটন প্রভৃতির সম্ভাব্য উৎস নির্দেশ, তার আদি ও রূপান্তর নিরূপণ, টোটেম-টেবু-যাদুর জড় আবিষ্কার প্রভৃতি আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য বা প্রায় অসাধ্য বটে।' (আহমদ শরীফ, ২০০৬ : ১৬)

উৎসব উদ্ভবের আদি ইতিহাস খুঁজতে নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে সমৃদ্ধ তথ্য পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা হয়েছে। তাঁদের তথ্যমতে, উৎসবের উদ্ভব হঠাৎ করে একদিনে হয়নি। মানব জাতির পৃথিবীতে আগমনকাল থেকেই এর গোড়াপত্তন; এমন ধারণা দেন মাধুরী সরকার :

> বিচিত্র বাধা-বিপত্তিসঙ্কুল প্রকৃতির বুকে যেদিন থেকে মানুষের উৎপত্তি,– সেদিন থেকেই সে ক্ষুধার শিকার। তাই যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়েছে খাদ্য এবং প্রকাশিত হয়েছে খাদ্যপ্রাপ্তির উল্লাস। আমাদের পাওয়া সবেচেয়ে প্রাচীন প্রমাণ-স্বরূপ গুহাচিত্রগুলির মধ্যে লক্ষিত হয় শিকারজীবী মানুষের শিকার প্রাপ্তির উল্লাস এবং সেই শিকারে পাওয়া জীবজন্তুকে যখন পুড়িয়ে খাওয়া শুরু হয়েছে, তখন আগুন জ্বালিয়ে খাদ্য হিসেবে প্রাপ্ত পশুটিকে পোড়াতে দিয়ে তার চারপাশে বহু অপেক্ষিত মানুষের জমায়েত। খাদ্যকেন্দ্রিক এই একত্রিত হওয়া মানবসভ্যতায় জন্ম দিয়েছিল বর্ণনাভিত্তিক বাক্য বিনিময়, – কালক্রমে গল্পকথা। এছাড়া শিকার ধরার অভিজ্ঞতার বর্ণনার অঙ্গভঙ্গি জন্ম দিল অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস এবং কালক্রমে নৃত্যশিল্পের, – যার অনেকটাই জুড়ে আছে পশুচালের মুদ্রা। (মাধুরী, ২০১৪ : ৭৫)

আদিম মানুষ অজ্ঞ, আনাড়ি ও অসহায় ছিল বলে, তারা ছিল একান্তই প্রকৃতির আনুকূল্য-নির্ভর। আর এমন দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতির নানা উপাদান সম্পর্কে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয় অনুভব করত উল্লেখ করে আহমদ শরীফ বলেছেন :

> ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা-শৈত্য-খরা-কম্পন ছাড়াও ছিল অপ্রতিরোধ্যশ্বাপদ-সরীসৃপ আর নিনাদবিহীন লঘু-গুরু নানান রোগ। গা-পা যেমন ছিল নিরাবরণ, মন-মেজাজও তেমনি ছিল আত্মপ্রত্যয়বিহীন। এমন মানুষ ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রবণ হয়, আর বিশ্বাস-ভরসা রাখে ও বরাভয় খোঁজে অদৃশ্য অরিমিত্র দেবশক্তিতে। তার চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতির ও ব্যর্থতার এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির কিংবা বিকলতার অভিজ্ঞতা থেকেই এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের ও প্রভাবের ধারণা অর্জন করে সে। তখন থেকেই তার জীবন-জীবিকা ইহ-পরলোকে প্রসারিত। (আহমদ শরীফ, ২০০৬ : ১২)

প্রকৃতির ভয়াল পরিস্থিতিতে বসবাসকারী মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়কে যেমন ভয় পেয়েছে তেমনই আবার প্রকৃতির কাছেই খুঁজে পেয়েছে নিরাপত্তার আশ্রয়। মাধুরী সরকার (২০১৪ : ৭৬) লিখেছেন; এই ভয় ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত এক অনুভূতি থেকে জন্ম নিয়েছে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস। যে বিশ্বাসের কারণেই প্রাকৃতিক সমস্ত সম্পদ বা পশু, পাখি, গাছপালা – যা মানুষের উপকারে এসেছে অথবা নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তারই মধ্যে মানুষ কল্পনা করেছে মানা-র (Mana) বা দেবতার – যাঁরা তাকে যেমন শাস্তিও দিতে পারেন, আবার দিতে পারেন নিরাপত্তা, খাদ্য, শক্তি, সন্তান (ঐশ্বর্য) প্রভৃতি। এমন কাল্পনিক শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার উপায় হিসেবে মানুষ বেছে নিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি খাদ্যকে সেই শক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা :

> মানুষের জৈবিক চহিদার সর্বপ্রথম ক্ষুধার অন্ন (খাদ্য) কে সে ভাগ করে নিয়েছে তার আরাধ্যের সঙ্গে। এই একই কারণে ফলদানকারী বৃক্ষ, শস্যদানকারী ওষধি, উচ্ছিষ্ট খাদ্যদানকারী পশু,– এরা সবাই মানা (Mana) এবং কালক্রমে দেবতা,–যাদের সন্তুষ্টির জন্য দান করা হয়ে এসেছে প্রাপ্ত খাদ্যের প্রথম অংশ, মানুষের ভবিষ্যৎ খাদ্যপ্রাপ্তির নিরাপত্তার কথা মনে রেখে। (মাধুরী, ২০১৪ : ৭৬)

নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই বলেই জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ও স্বচ্ছন্দ্য কামনা তাকে দৈবাশ্রিত হতে বাধ্য করেছে। তবে তার সহজাত বুদ্ধি, নিরাপত্তা-প্রয়াস, জীবিকা-চেতনা এবং অনন্য মননশক্তি তাকে একান্তই প্রবৃত্তি-নির্ভর প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র্য করে বলে মনে করেন আহমদ শরীফ (২০০৬ : ১২)।

এমন কথার মিল আছে অতুল সুরের লেখায় :

> মানুষের প্রথম সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। জীবন-সংগ্রামের এই সমস্যা সমাধানের জন্য, তাকে তৈরী করতে হয়েছিল আয়ুধ। আয়ুধগুলো একখণ্ড পাথর অপর একখণ্ড পাথরের সাহায্যে তার চাকলা তুলে হাতকুঠার ও অন্য আকারে নির্মিত হত। ... আয়ুধ নির্মান ছাড়া, প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার, পরিবার গঠন, পশু শিকার সুগম করার জন্য পর্বত-গুহায় বা পর্বতগাত্রে পশুর চিত্রাঙ্কন দ্বারা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ ও আগুনের ব্যবহার। (অতুল, ২০০৮ :৬)

প্রকৃতি তাকে খাদ্য ও আশ্রয় দিত বলে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং এক প্রকার ভয় তাকে প্রকৃতির নানা সজীব ও নির্জীব উপকরণকে পূজা করতে শেখায়, উল্লেখপূর্বক ইন্দুভূষণ অধিকারী (১৯৮৮) জানান, বৃক্ষ এবং জন্তুপূজা সেই আদিমতম পূজার অন্যতম :

> চারপাশের ঘটনা প্রবাহ কখনো কখনো তাকে ধন্দের মধ্যে ফেলে দিত; কার্য ও কারণকে বুদ্ধি দিয়ে যুক্ত করতে পারত না সে। এই শূণ্যস্থানে যাদু-বিশ্বসের জন্ম। নিজের শক্তিসামর্থের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধির সাথে সাথে নানা পূজাচার ও যাদু-ক্রিয়ার মাধ্যমে বিরুদ্ধ ও প্রাকৃতিক শক্তিকে পোষ মানতে বা কল্যাণধর্মী করতে সচেষ্ট হয়েছে। টেটেম-পূজাও শুরু হয়েছে। (ইন্দুভূষণ অধিকারী, ১৯৮৮)

হাজার বছর আগের সেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিবর্তিত রূপ-ই হয়তো আজকের ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো; যা বাঙালি জীবনের একটা বিশাল অংশজুড়ে বিরাজমান।

নৃতাত্ত্বিক তথ্য মতে সভ্যতা পূর্ব সময়ে, বলা যায় ভাষা সৃষ্টিরও আগে, আনন্দ প্রকাশের জন্য মানুষ নৃত্য বা দেহভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়ে আনন্দের আমেজ তৈরি করত, উল্লেখ করে মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (২০০৭ : ৭৮, ৮০-৮১) লিখেছেন- দুহাতে তালি, মুখে বিশেষ ধরনের শব্দ এবং পেটে হাত চাপড়িয়ে বিশেষ বাদ্য সৃষ্টি করে এক ধরনের আবহ তৈরি করত তারা। যা ছিল উৎসবের আদি আয়োজন। মানুষের উৎসব আর উৎসব প্রীতির ইতিহাস তার নিজের সমবয়সী উল্লেখ করে তিনি আরও লিখেছেন :

> অতীতে উৎসবে জাঁকজমকের ব্যবস্থা না রেখে উপলক্ষ বিচারে নৃত্য-সঙ্গীত, দেহভঙ্গী প্রকাশ শেষে ভাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের রীতি ছিল। বিশেষ করে পশু-বধ, পশু-শিকার, জুম ক্ষেতে কৃষি-কাজ শুরু এবং মানুষের জন্ম ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হত উৎসব। (সিরাজুল, ২০০৭ : ৮২)

মানবশিশুর মাতৃগর্ভে আসা থেকে জন্ম এবং তার মৃত্যুপরবর্তী আত্মার কল্যাণে নানা আনুষ্ঠানিকতার যে রীতি এখনও প্রচলিত, ধারণা করা যায়, এর উৎপত্তি হয়তো তখন থেকেই।

আদিম মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারগুলো সে সময় তার কাছে ছিল খাদ্য সংগ্রহের হাতিয়ার। সেই বিশ্বাসের ধারায় প্রথম কৃষি উৎসবগুলি ছিল অভিনয়মূলক এবং বিনোদনের উৎস; এই মর্মে আতোয়ার রহমান জানান :

> খাদ্য সংগ্রহের বাস্তব অনুকরণ যখন কিছুটা নিয়মবদ্ধ অভিনয় বা নৃত্যগীতে রূপ নেয় তখন এই অভিনয় হয়ে ওঠে তার মানসিক খোরাক। সেগুলো স্থূল, অমার্জিত বা রূপরেখা বর্জিত হলেও, ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবনে, দিন যাপনের গ্লানি অপসারণে তাই ছিল আদি সহায়ক, এক কথায় আশীর্বাদ। (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ৮৭)

তখন প্রকৃতির কৃপাপ্রত্যাশী মানুষ শিকারের প্রয়োজনেই যূথশক্তিতে আবদ্ধ হয়। হিংস্র পশু বধে এই যূথবদ্ধতা এক 'ফলপ্রসূ অস্ত্র' হিসেবে তাকে খাদ্য আহরণে শক্তিমান করে। আত্মরক্ষার প্রয়োজন-জ্ঞানেই তৈরি হয় যুথের ওপর নির্ভরশীলতা,আর সেখানেও শুরু হয় কিছু আনুষ্ঠানিকতার। আতোয়ার রহমান যোগ করেন :

> জ্ঞান যখন গভীর হয়, তখন সে যূথশক্তি বৃদ্ধির স্বার্থে আপন যুথের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে থাকে। এর ফল যুথে মানবশিশুর জন্মে আনন্দ। পরবর্তী কালে যা শিশু তথা মানবজীবনের সাথে জড়িত একাধিক শ্রেণির উৎসবের জন্ম দেয়। যেগুলির একটি- জন্মোৎসব-এখন সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত। (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ৭-৮)

যূথশক্তি চেতনায় অন্তত আরও দুই ধরনের উৎসবের উদ্ভব ঘটে; উল্লেখ করে আতোয়ার রহমান (১৯৮৫ : ৭-৮) জানাচ্ছেন, একটি শিকারের দেবদেবীর পূজামূলক, একটি যুদ্ধের দেবদেবীর পূজাকেন্দ্রিক।

সভ্যতার সৃষ্টিলগ্নে মানুষের সব উৎসবই যে শিকার-কেন্দ্রিক ছিল, এর প্রমাণ- মানুষ তার জীবিকাসংগ্রহ চেষ্টার প্রথম অভিনয় শুরু করে শিকারের চিত্র দিয়ে। শিকারে কখনো সাফল্য লাভ, কখনো ব্যর্থ হওয়ার ফলে এক পর্যায়ে শিকারি মানবযূথের মনে প্রশ্ন জাগে, তার সাফল্য বা ব্যর্থতা কোনো অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কি না! এই ভাবনা তাকে তাড়িত করে অদৃশ্য কিছু শুভ-অশুভ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনায়।
কালক্রমে এই শক্তিগুলিই পরিণত হয় শিকারের দেবদেবীতে। পরবর্তীতে তাদের তুষ্টি বিধানের চেষ্টার মাধ্যমেই উদ্ভব ঘটে তাদের সাড়ম্বর পূজা তথা উৎসবের।

উৎসব শুরুর ইতিহাসের খোঁজে ঠিক কবে থেকে মানুষ শিল্প সৃষ্টি করেছে তা জানতে আদিম সংঘবদ্ধ মানুষের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলি সমন্ধে অবহিত হবার গুরুত্ব তুলে ধরেন সাধনকুমার ভট্টাচার্য। তিনি (১৯৬৩ : ১২, ১৫) ধারণা করেন, আদিম সমাজের চেতনা সমষ্টিগত চেতনা, গোষ্ঠীর প্রত্যেক ব্যক্তির মন যেন একক, একটি গোষ্ঠী যেন মনেরই অংশ, তার স্বাধীন কোনো সত্তা ছিল না। ফলে খাদ্য আহরণ, আত্মরক্ষা, আত্মপ্রজনন, মৌলিক, জৈবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রয়োজন তারা

সমষ্টিগতভাবেই সম্পন্ন করেছে। গোষ্ঠীর জীবিকার্জনের শ্রমে যোগদান করা, গোষ্ঠীর নানা বিধি-নিষেধ মেনে চলাসহ জীবন সংগ্রামের পদ্ধতিতে গোষ্ঠীর সাথেই তাকে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। তাই মনে করা হয়, 'শিল্পের জন্ম কোনো ব্যক্তি মনের আত্মসমাহিত ধ্যান-কল্পনা থেকে হয়নি। সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রসার বা শিল্প জন্মেছে গোষ্ঠী-মনের সামষ্টিগত আবেগ প্রকাশের যৌথ প্রচেষ্টা থেকে' (সাধন কুমার, ১৯৬৩ : ১৫)। মূলত আদিম মানুষ দলবদ্ধভাবে অভিযোজন করতে সচেষ্ট হবার পাশাপাশি দলবদ্ধভাবেই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট করবার জন্য অনুষ্ঠান করেছে। যা ছিল, যৌথভাবে আনন্দ উপভোগ বা যৌথ দুঃখভোগ।

পশু শিকার যুগের অনেক পরে কৃষি কাজের সূচনায়ও অবচেতনভাবেই সে প্রভাবিত হয় কৃষি সম্পর্কিত নানা ভাবনায়। আতোয়ার রহমান (১৯৮৫ : ৯) লিখেছেন, নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রকৃতির পরিবর্তন, সূর্যের প্রদক্ষিণে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, সেইসাথে কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব, ঋতুভেদে ফল-ফসলের বৈচিত্র দৃষ্টে মানুষের বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, তার অনুকূলে বা প্রতিকূলে অদৃশ্য কিছু শক্তি তার কৃষিকাজের নিয়ামক। সেখান থেকেই হয়তো তৈরি হয় জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের ধারণা, বিরুদ্ধ প্রকৃতিতে টিকে থাকার সংগ্রাম।

উপর্যুক্ত তথ্যের মিল পাওয়া যায় প্রদ্যোত কুমার মাইতির লেখায়ও :

> বিভিন্ন ঋতুর নানা রকম ছোটখাট ঘটনা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করত, চঞ্চল করত ও ভাবিয়ে তুলত;– এই আকর্ষণ, চঞ্চলতা ও ভাবনা থেকেই মানুষ বহু দেবতা, অপদেবতা সৃষ্টি করে কখনও বা অনুকরণ-প্রবন আচার অনুষ্ঠান (imitative rite) উদ্‌যাপন করে পৃথিবীর প্রাচীনকাল থেকে নানা কামনা-বাসনা চরিতার্থের জন্যে ব্রত উদযাপন করে চলেছে। এদের মধ্যে শস্য কামনা, বৃষ্টি কামনা,সৌভাগ্য কামনা, সন্তান কামনা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (প্রদ্যোত কুমার, ১৯৮৮ :১৫২)

তবে, এই ব্রতগুলির উৎপত্তি কখন হয়েছিল তা বলা কঠিন হলেও, এ কথা বলা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এর নিদর্শন এখনও আছে। বিজ্ঞজনেরা মনে করেন, 'এ ধরনের ব্রত উৎসব প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় থেকে সমাজে চলে আসছে।' (প্রদ্যোত কুমার, ১৯৮৮ : ১৫২)।

এসব মত পর্যবেক্ষণে বলা যেতে পারে, শিকার এবং কৃষি থেকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম উৎসবগুলোর উদ্ভব। যার কোথাও মিশে আছে লাঙলের ফলার দাগ, কোথাও ঐন্দ্রজালিক আচার বা যাদুবিশ্বাস, কোথাও বা সামাজিক রীতি-প্রথা, রাজনীতির আঁচড়।

তবে, পুরাতন প্রস্তর যুগে গুহাবাসী মানুষ অতিপ্রাকৃত বা যাদুবিশ্বাসের সংস্কৃতিতে প্রভাবিত থাকলেও এর সাথে ধর্মের যোগসূত্র ছিল না। ধর্মের মতো পবিত্র জ্ঞানেই সব আচার ও রীতি পালিত হতো, এমন ধারণা বুলবন ওসমানের। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুলবন জানান :

> যাদুবিশ্বাস আর কিছু নয়, প্রাকৃতিক ক্ষমতা বা অর্থনীতিক ব্যবস্থার নকল তোলা। গুহাচিত্রের পেছনেও আমরা এই একই মানসিকতার পরিচয় পাই। পশুশিকারের চিত্র তৎকালীন মানুষের আশা পূরণের প্রতিফলন। অর্থাৎ গুহাবাসীর বিশ্বাস- রেখার মাধ্যমে যে বাইসনের চিত্র আঁকা হচ্ছে তার ফলে উক্ত প্রাণী মায়াজালে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে, সুতরাং তাকে শিকার করা সহজ। (ওসমান, ২০০১ : ৪৯)

'উৎসবের ভিত্তি যৌথ রিচ্যুয়াল' এমন মত মুনতাসীর মামুনেরও। তিনি তাঁর *বাংলাদেশের উৎসব* গ্রন্থের ভূমিকা অংশে Rabert Briffault এর `Festivals', Encyclopadeia of the Social Science.vol 6, New York. P1931, pp 198-201-এ প্রাচীন উৎসবের ভাবনায় ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাসের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ছিল চন্দ্রের প্রভাব, এমন তথ্য তুলে ধরেছেন :

> প্রাচীন আমলে, ম্যাজিকের ওপর বিশ্বাস অভিঘাত হেনেছে পরিবার বা গোষ্ঠীর ওপর এবং সে কারণে, অধিকাংশ প্রাচীন রিচ্যুয়ালই যৌথ কর্ম। মানুষের প্রধান কর্ম কৃষির সঙ্গেও যোগ ছিল অনেক রিচ্যুয়াল, উৎসবের। শুধু তাই নয়, এসব রিচ্যুয়াল নিয়ন্ত্রিত হ'ত চান্দ্রমাসের দ্বারা। প্রাচীন যৌথ রিচ্যুয়াল ছিল অতি প্রাকৃতিককে বশে আনার ম্যাজিকাল প্রক্রিয়া। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃতিতে সেই প্রক্রিয়ার চারিত্রিক উপাদান রয়ে গেছে। (মুনতাসীর, ১৯৯৪ : ভূমিকা)

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃশ্যগত বৈচিত্র উৎসবকে আকর্ষণীয় এবং বর্ণাঢ্য করলেও, উৎসবের উৎস আজও অনুসন্ধেয়, এমন মত শামসুজ্জামান খানের (২০১৩ : ১৭)। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্ত করেন (২০১৩ : ১১), উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যাপার। তবে এর ইতিহাস, উদ্ভব, রূপান্তর প্রক্রিয়া ও বিকশিত রূপ খুঁজে বের করা খুব জটিল। জাদুবিশ্বাস, আচারক্রিয়া,ধর্মীয় উপাদান, অর্থনৈতিক বিষয় এবং বিশ্বাস-সংস্কারসহ কোনো কোনো স্পর্শকাতর বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে মনে করা হয়। সেই সঙ্গে আনন্দময়তা, ঐতিহ্যে অংশ নেওয়া এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংযোগ ও সংহতিও উৎসবের মৌল উপাদানের অন্তর্গত।

সময়ের পরিক্রমায় নানা সংস্কার, আচার বা যৌথ জীবনব্যবস্থায় উৎসবের সূচনা এক অর্থে প্রয়োজনের অনুসঙ্গ হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেয়েছেন উৎসব উদ্ভবের রহস্য। *উৎসবের দিন* প্রবন্ধে লিখেছেন, 'জগতের যেখানে অব্যাহত শক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেখানেই যেন মূর্তীমান উৎসব' (১৯৬৭ : ৩৯২)। উৎসব আয়োজনে প্রকৃতির শক্তি আর মনুষ্য শক্তির মাঝে কবি সাদৃশ্য খুঁজেছেন এভাবে :

> হেমন্তের সূর্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্কশস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে – সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই। মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। ... প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী – কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৯২-৩৯৩)

প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য উৎসবের মতো, মনুষ্যত্বের গৌরবে গরীয়ান মানুষও স্বার্থপরতার বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে করে তুলতে পারে অবারিত। তখনই জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে মনুষ্য শক্তির জয়ধ্বনিতেই হতে পারে উৎসবের সূচনা। 'সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহোৎসব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৯৭)। মনুষ্যশক্তির এই গৌরব যেন উৎসব ধ্বনি হিসেবে অনুরণিত হয় মানবাত্মায়- এমন আহ্বানের মাঝে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন; হিংসা, ভয়, জরা, শোক কাটিয়ে মানব মনের মঙ্গল শক্তিকে অনুভব করাই উৎসব।

বাংলাদেশের উৎসব

বারো মাসে তেরো পার্বণ আর বৈচিত্রময় উৎসব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গৌরময় ঐতিহ্যের অধিকারী। ভৌগোলিক অবস্থান বা জলবায়ুর প্রভাব এমনকি অর্থনীতি উৎসবের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখে বলে মনে করেন প্রত্নতাত্ত্বিক আর সমাজবিদরা। এছাড়া রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কারণেও উৎসব সংগঠিত হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে এ এক স্বভাবিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে প্রচলিত উৎসব বাংলার ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতির সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমাজবিদদের রায় মেনে নিয়ে আতোয়ার রহমান (১৯৮৫ : ১৪) উৎসবকে শ্রেণিকরণ করেছেন ৬টি পর্যায়ে :

১. জীবিকার উৎসব : বৃষ্টি কামনার উৎসব, নবান্ন ইত্যাদি।
২. ধর্মীয় উৎসব : ইদ, বড়দিন, দুর্গোৎসব, পৌষমেলা ইত্যাদি।
৩. সাংস্কৃতিক উৎসব : নববর্ষের উৎসব, বিভিন্ন দেশের এবং যুগের নাট্যোৎসব ইত্যাদি।
৪. ঐতিহাসিক বা স্মরণ উৎসব : নদীয়ার ঘোষপাড়া গ্রামে দোলপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বাউল সমাবেশ, নেপালে অনুষ্ঠিত রামের বিয়ে, মোহররম, একুশে ফেব্রুয়ারি, অক্টোবর বিপ্লব দিবস, মে দিবস ইত্যাদি।
৫. রাজনৈতিক উৎসব : বিভিন্ন দেশের জাতীয় দিবসের উৎসব, যুব উৎসব ইত্যাদি।
৬. সামাজিক-পারিবারিক উৎসব : বিয়ে, জন্মদিন, আকিকা, অন্নপ্রাশন, খাৎনা ইত্যাদি উপলক্ষের অনুষ্ঠান, মলুটির রায় পরিবারের দেবী মৌলীক্ষার পুজো উপলক্ষে উৎসব।

অপর এক তথ্যে (উইকিপিডিয়া, বাংলাদেশের উৎসবের তালিকা), বাংলাদেশের উৎসব সমূহের নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায় :

ধর্মীয় উদ্‌যাপন

ইসলামী

- ইদুল ফিতর – ইসলামী পঞ্জিকা অনুযায়ী শাওয়াল মাসের প্রথম দিন
- ইদুল আযহা – ইসলামী পঞ্জিকা অনুযায়ী জিলহজ্জ মাসের দশম দিন
- চাঁদ রাত – ইসলামী পঞ্জিকা অনুযায়ী রমজান ২৯ বা ৩০তম রাত
- আশুরা – ইসলামী পঞ্জিকা অনুযায়ী মুহররম মাসের দশম দিন।
- ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী – হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ও ওফাত দিবস
- শব-ই-কদর
- শব-ই-বরাত
- বিশ্ব ইজতেমা

হিন্দু

- দুর্গাপূজা – বাংলা মাস অনুযায়ী কার্তিক মাসের ২য় দিন থেকে ১০ম দিন
- কালীপূজা
- সরস্বতী পূজা
- রথযাত্রা
- দোলযাত্রা
- জন্মাষ্টমী- হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের জন্মদিন উদ্‌যাপন

বৌদ্ধ

- বুদ্ধ পূর্ণিমা
- মধু পূর্ণিমা
- কঠিন চীবর দান
- মাঘী পূর্ণিমা

খ্রিষ্টান

- বড়দিন
- মানচিতালি
- ইস্টার

দেশাত্মবোধক ও জাতীয়

- ভাষা-শহিদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- স্বাধীনতা দিবস
- সশস্ত্র বাহিনী দিবস
- শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস
- বিজয় দিবস

দেশীয় ঐতিহ্য

- বাংলা নববর্ষ – পহেলা বৈশাখ
- বর্ষা উৎসব
- নবান্ন উৎসব
- পৌষ মেলা
- বসন্ত বরণ – পহেলা ফাল্গুন
- নৌকা বাইচ
- বাউল উৎসব
- জাতীয় পিঠা উৎসব
- ঘুড়ি উৎসব

অন্যান্য

- জাতীয় লোকজ উৎসব (সোনারগাঁ)
- ফোক সঙ্গীত উৎসব
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, ঢাকা
- রবীন্দ্রজয়ন্তী
- নজরুল জয়ন্তী
- অমর একুশে গ্রন্থমেলা
- বৈসাবি – বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান ৩টি আদিবাসী সমাজের বর্ষবরণ উৎসব

স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত উৎসব

- লালন উৎসব
- মধুমেলা
- জসিম মেলা
- হাসন রাজা উৎসব
- বাউল আব্দুল করিম লোকজ উৎসব

'বিশ্বজুড়ে উৎসব পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এর রয়েছে কমপক্ষে ৫টি উপাদান : সজ্জা,সম্মিলন, শুভেচ্ছা, সম্পাদন ও ভোজ, যার যোগফলে সৃষ্ট হয় সামাজিক আনন্দ যা কখনও ব্যক্তিগতভাবে সৃষ্টি করা যায় না। উল্লিখিত এই ৫টি উপাদান ছাড়া উৎসব হয় না।' – এমন তথ্য দেন মাসুদ রানা (২০১৬), তাঁর 'উৎসব-জাতি-সম্প্রদায়-সম্প্রীতি' নিবন্ধে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরে মাসুদ লিখেছেন, বাহ্যিক উপকরণ সহযোগে সাধারণ রূপের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হল সজ্জা। উৎসবে গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোনো গণস্থানে কেন্দ্রীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের আয়োজন হল সম্মিলন। সেখানে অন্যের সঙ্গে নিজের সুখ ও আনন্দ বিনিময়ের মাধ্যমকে শুভেচ্ছা বলেছেন তিনি। উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ডের সংঘটনে উৎসবের সম্পাদন এবং সেখানে থাকবে আকর্ষণীয় কিছু উৎসবী খাবার। প্রাণি হিসেবে মানুষের আনন্দ আয়োজন খাদ্য বর্জিত হয় না বলেও মত তাঁর।

বিভিন্ন পর্যায়ে উদযাপিত বাঙালি উৎসবের তালিকাদৃষ্টে একথা অনুমেয় যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরে উৎসব। তাই উৎসবে এত বৈচিত্র্য। সেই আদিম সমাজ থেকে আবেগের প্রকাশগুলো, ধীরে ধীরে প্রাণচঞ্চল রূপ গ্রহণ করে। প্রীতি সম্মিলন প্রগাঢ় করে আত্মিক মিলনের বাসনা, আর এভাবেই সমৃদ্ধ ও আনন্দময় হয় উৎসব।

উৎসবের বিকাশ

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। একথা উৎসবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উৎসব বিকাশের উপযুক্ত কারণ ও পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে এই ধারণা করা যায়, প্রবহমানতার চিরন্তন প্রক্রিয়াই এর কারণ।

এর কারণ হিসেবে শাহাবুদ্দীন আহ্মদ লিখেছেন :

> আজকের সংস্কৃতি শুধু দেশীয় বা ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে স্বস্তি পায় না। মানব-প্রকৃতি সব সময় ঊর্ধ্বারোহী। প্রাণীর মধ্যে যেহেতু মানুষ সর্বোত্তম সে জন্যে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে থাকাটা তার স্বভাব বিরুদ্ধতা। নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করা এবং স্থানকে অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়াতে সে আনন্দ পায় বলে সে আত্মচিন্তার বা আত্মসম্প্রসারে উন্মুখ থাকে। ... অন্ধকার থেকে আলোয়, অস্পষ্ট

> আলো থেকে সুস্পষ্ট আলোয় উত্তরণে মানুষের অবিরাম চেষ্টায় মানুষের জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে সামাজিক রূপান্তর ঘটায় মানুষের নতুন সমাজ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে আর তা শিল্পে সাহিত্যে কাব্যে সংগীতে রূপ লাভ করে। (শাহাবুদ্দীন, ২০০৪ : ৯৯)

আদর্শগত ধারণা, ঐতিহাসিক তেজস্বিতা বা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত অনড় হতে পারে। কিংবা নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী সম্প্রদায়ের সহজাত কিছু বৈশিষ্ট্যাবলী মৌলিক হতে পারে। তারপরও শেষাবধি তা অকৃত্রিম থাকবে এমনটা নয়। এর কারণ হিসেবে কে. এম. মোহসীন (২০০৭ : ৬২১) জানাচ্ছেন, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, চাকরি বাজারের বিস্তার, শিক্ষার প্রভাব, গণমাধ্যম ও মুদ্রণশিল্প প্রসারের সাথে সাথে সমাজের রূপান্তর এবং পরিবর্তন ঘটে। একই সাথে তিনি এও মনে করেন, মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো নতুনকে কামনা করা, জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান অর্জন করা ইত্যাদি। যে বৈশিষ্ট্য রেখাপাত করে সামাজিক-সংস্কৃতিক জীবনে। আর সমাজ যেহেতু চলমান এক সংগঠন, তাই সমাজ পরিবর্তনে অনুঘটক হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে বেশ কিছু বিষয়। মোহসীন উল্লখ করেন :

> পরিবেশগত উপাদান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক বলয়ের উন্নয়ন, সভ্যতা, গোষ্ঠীগত ও জাতিগত কুসংস্কার, ধর্মীয় আবেগ, শ্রেষ্ঠত্ব ও বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কারণেও সমাজ পরিবর্তিত হয়। অভিবাসী, ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা, মিশনারি, ভাগ্যান্বেষী এবং বাংলায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাকারীরা সমাজের কাঠামোগত গঠনে পরিবর্তন ঘটায় এবং সমাজে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে যথেষ্ট অবদান রাখে। তারা গতানুগতিক প্রথা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং স্থানীয় লোকদের আচারাদিতে পরিবর্তন আনে। সংস্কৃতির পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়া কখনো শেষ হয় না। (মোহসীন,২০০৭ :৬২১)

উৎসবের বিবর্তন বা বিকাশ হতে সময় লাগে হাজার হাজার বছর। একথা সত্যি যে, বহিস্থ সংস্কৃতি দেশীয় সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। তাই দেশীয় উৎসবের মৌল কাঠামোয়ও খানিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়! এছাড়া প্রাণি হিসেবে মানুষের সহজাত বুদ্ধি, জীবন প্রবণতা, ভাষার ব্যবহার এবং সৃষ্টিশীলতাও উৎসব বিকাশে সহায়ক। আহমদ শরীফের (২০০৬ : ১৪) মতে, 'মনন শক্তির বিকাশে, যুক্তি-বুদ্ধির ও রুচির উন্মেষে টোটেম পেয়েছে স্রষ্টার ও দেবতার মর্যাদা, সংস্কার উন্নীত হয়েছে শাস্ত্রে, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ধ্রুব সত্যে।' তিনি এও মনে করেন :

> অনেক আচার সংস্কারই হয়ে পড়েছে আপাত নিরুদ্দিষ্ট ও তাৎপর্যহীন। ফলে সম্পর্ক-স্বরূপ নির্ণয় হয়েছে দুঃসাধ্য। যেমন নাচ-গান-চিত্র– এগুলো ছিল আদিতে শিকার-সাফল্যের, অনুকূল রোদ-বৃষ্টির আবহসৃষ্টির ও বিপদমুক্তির প্রাকৃত বা দৈবিক আবহসৃষ্টির বাঞ্ছাপ্রসূত উদ্ভাবন। এখন নাচ-গান-চিত্র আমাদের মানসিক-নান্দনিক বিলাসক্রিয়া মাত্র।' (আহমদ শরীফ : ২০০৬ : ১৭)

আর মাধুরী সরকার উল্লেখ করেন :

> ভিজে মাটির ওপর পাখির পায়ের ছাপ একদিন শিকারজীবী মানুষকে খাদ্যের সন্ধান দিয়ে মানুষের বিশ্বাসে জাদুচিহ্নে পরিণত হয়েছিল। সেই পাখির পদচিহ্নই কালক্রমে লক্ষ্মীর পদচিহ্নে রূপান্তরিত হয়ছে, – একথা বলার কোনো অবকাশ রাখে না। পাখির পায়ের চিহ্নের জাদু থেকে ক্রমশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত পাখিই হয়ে উঠেছে আরাধ্য। তাই 'নবান্ন'-র আলপনায় পেঁচা বা কাকের পদচিহ্ন আঁকার রীতি সুন্দরবন অঞ্চলের

> পরিবারগুলির মধ্যে লক্ষিত হয়। ... উর্বরতাতন্ত্রেও বিশ্বাসের ওপর ভর করে আলপনায় এসেছে কলা গাছ, ধান, ধানের শীষ, সর্পিল রেখা (সাপপেরই রূপান্তর) প্রভৃতি। আলপনায় এ ধরনের বিষয়গুলি এসেছে এমনই এক জাদুবিশ্বাস থেকে, যেখানে মানুষ মনে করে বেশি সংখ্যায় ফসল বা সন্তান উৎপাদনকারী গাছ অথবা প্রাণীকে আঁকলে তাঁদেও নিজেদেরও সমৃদ্ধি ঘটবে। ... যথার্থভাবে কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতায় পদার্পণের পর মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুভাশুভ এবং জাদুবিশ্বাসের পর্যন্ত রূপ বদল ঘটেছে। আলপনায় তাই শুধুমাত্র আদিম জাদুবিশ্বাস সম্বলিত বিষয় ছাড়া 'নবান্ন'-র আলপনায় স্থান পেয়েছে চাষের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (লাঙ্গল, জোয়াল, মই), ধান মাপার কুনকে, ধান ঝাড়ার কুলো এবং ধান রাখার পাত্র ধামা প্রভৃতি। (মাধুরী, ২০১৪ : ৮০-৮১)

উৎসবও এভাবেই নবকলেবরে বিকশিক হয়ে নতুর রূপ নেয়। সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে দেশে দেশে উৎসব সৃষ্টি হয়ে ক্রমবিবর্তন হয় উল্লেখ করে সিরাজুল ইসলাম (২০০৭ : ৮১) বলেছেন, নতুন নতুন উপলক্ষে নানা উৎসব সৃষ্টি হয়, বংশ পরম্পরায় অবারিত থাকে, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সকলের অংশগ্রহণ অব্যহত থাকে, যার কারণে নিশ্চিত করে বলা যায় তখন থেকেই উৎসবের ক্রমবিকাশ ঘটে।

উল্লেখিত বক্তব্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে একথা প্রতীয়মান, অতীতের অনেক সাক্ষ্যের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে উৎসবের অস্তিত্ব। সভ্যতার ঊষালগ্নে জীবিকা কেন্দ্রীক আচার, জাদুবিশ্বাস, শক্তিপূজা এবং নানা লোকাচারের মধ্যে তা বিকশিত হয়; সংস্কার ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি করে নিজস্ব ধারা। পাশাপাশি উৎসবের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গোত্র। গোত্রে সংঘবদ্ধ মানুষ দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করত। যা জোরালো ভূমিকা রেখেছে সংস্কৃতি তথা উৎসব বিকাশে। এভাবেই, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়ণ, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্মেষ, ধর্মের সৃষ্টি, সংস্কৃতির উৎপত্তি, মানবজাতির মানসিক উন্নয়ন, জাতিতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ ইত্যাদি কারণের পরিপ্রেক্ষিতে উৎসবের ধারা বিকশিত হয়।

উৎসবের অর্থনৈতিক ভূমিকা

আর্থিক টানাপোড়েন আর সীমাবদ্ধতায় হোঁচট খাওয়া ক্লান্তিকর জীবনে উৎসব-পার্বণ যেন সঞ্জীবনী। বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বড় চালিকাশক্তি এই উৎসব, যা কৃষি বা শিল্প খাতেতর মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন অর্থনীতি বিশ্লেষকরা। উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে, দেখা দেয় নব কর্মপ্রেরণা। উৎসবে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়, শ্রমিক সরবরাহ বাড়ে। মুদ্রা সরবরাহে গতিশীলতা আসার ফলে দেশজ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধিও পাশাপাশি জাতীয় জীবনযাত্রায় উন্নয়নমূলক পরিবর্তন সূচিত হয়। এটিকে ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব হিসেবে দেখেন অর্থনীতিবিদরা।

দিবস ও উৎসবের সঙ্গে অর্থনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতির গতিপ্রবাহে যে কোনো ব্যয়ই অর্থনীতির জন্য আয়। তেমনি উৎসব আয়োজনে যে ব্যয়, তা দেশজ উৎপাদনে অনিবার্য অবদান রাখে, উল্লেখ করে 'উৎসবের অর্থনীতি' নিয়ে মতামত প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আবদুল মজিদ লিখেছেন :

> যে কোনো উৎসব অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন করে, মানুষ জেগে উঠে নানা কর্মকাণ্ডে, সম্পদ বন্টন ব্যবস্থায় একটা স্বতঃপ্রণোদিত আবহ সৃষ্টি হয়। এই আবহকে স্বতঃপ্রণোদিত গতিতে চলতে দেয়ায় দেখভাল করতে পারলে অর্থাৎ সামষ্টিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও পারঙ্গমতা দেখাতে পারলে এই কর্মকাণ্ড এই মুদ্রা সরবরাহ, ব্যাঙ্কের এই তারল্য তারতম্য, পরিবহন খাতের এই ব্যয় প্রবাহ একে স্বাভাবিক গতিতে ধরে রাখতে পারলে অর্থনীতির জন্য তা পুষ্টিকর প্রতিভাত হতে পারে। (মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, ২০১৯)

উৎসব তো কেবল ঈদ, পূজা আর বর্ষবরণ নয়, চলচ্চিত্র উৎসব, নাচ-গান-নাটকের উৎসব, আছে মা দিবস, বাবা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, বন্ধু দিবসের মতো অনেক অনেক উৎসবের দিন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ভগ্ন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে উৎসব।

আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত দেশের উন্নতি। 'উৎসবের অর্থনীতি' বিষয়ে পান্থ আফজাল (১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, দৈনিক জনকণ্ঠ) লিখেছেন, উৎসব ঘিরে নানা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক গতি প্রবাহ বাড়িয়ে তোলে। দিন দিন মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে ক্রয়ক্ষমতা। ফলে ব্যবসার আকার বাড়ছেই শুধু নয়, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ব্যবসা বাণিজ্য সেক্টরে যে মূল্যস্ফীতি হয়, তাতে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হয় অর্থ। ব্যাঙ্ক লেনদেন বৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের পাঠানো অর্থে রেমিটেন্সের পরিমানও বাড়ে। ব্যবসার সাথে বিভিন্ন সেবাখাত, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতেও সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধি পায়। জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পাশাপাশি সৃষ্টি হয় নতুন কর্মসংস্থান।

সর্বজনীন উৎসবগুলো দেশব্যাপী উদযাপিত হওয়ায় গতি আসে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও, উল্লেখ করে নিতাই চন্দ্র রায় (এপ্রিল ১৪, ২০১৮, শেয়ার বিজ) 'গ্রামীণ অর্থনীতিতে পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব' নিবন্ধে লিখেছেন, উৎসবের অর্থনীতি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায় না। তাই উৎসব ঘিরে কী পরিমান অর্থের লেনদেন হয়, তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও এটা নিশ্চিত যে, এর পরিমাণ বিশাল। উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ শিল্পীদের তৎপরতা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার করে, প্রচার ও প্রসার ঘটে লোকজশিল্পের। লাভবান হয় বিনোদন কেন্দ্র। উৎসব মৌসুমে দেশের মধ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি বিনিয়োগও বাড়ে।

তবে, সামষ্টিক ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হলে নানা দৃষ্টিতে উৎসব-সম্মেলন-মেলা, পূজা-পার্বণ উদযাপনের ইতিবাচক দিক মাত্রাতিক্রমনের ফলে নেতিবাচক হয়ে পড়তে পারে, উল্লেখ করে 'ঈদের আর্থ-সামাজিক

তাৎপর্য' শিরোনামে অপর এক প্রবন্ধে মোহাম্মদ আবদুল মজিদ (২৫ জুন, ২০১৭, কালের কণ্ঠ) লিখেছেন :

> উৎসবে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে আবাসনসহ সব ভোগ্যপণ্যে ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা বেড়ে যায়, সেবাগ্রহণকারী আকর্ষণে ব্যর্থ হলে পর্যটন শিল্পে ধ্বস নামতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ হতে পারে, পুঁজির সংকট সৃষ্টি হতে পারে এবং ব্যয় প্রাক্কলনে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যা নেতিবাচক প্রভাবেরই নামান্তর।

শুধু তাই নয়, উৎসব উদযাপনকারীদের মধ্যে অবনিবনার পরিবেশ সৃষ্টি হলে, আক্রমণাত্মক কিংবা বিরোধাত্মক মনোভাব উদ্ভব হলে, সাংস্কৃতিক অবসন্নতা বা বিরোধাত্মক প্রতিকূল পরিবেশের উদ্ভব ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা অর্থনীতিবিদদের। পাশাপাশি উৎসব পালনকারীদের মধ্যে কিংবা তাদের সঙ্গে অন্যদের অবনিবনা ও ভুল বোঝাবুঝির পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গেলে উৎসব উদ্‌যাপনের নেতিবাচক প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে করেন তাঁরা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, উৎসব একান্ত নিজের মতো করে গড়ে ওঠে না। ধর্ম, জীবনদর্শন, আর মতবাদই উৎসবের উদ্ভব ও বিকাশের অবলম্বন। মূলত পরিবার-কেন্দ্রিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আনুষ্ঠানিকতাগুলোই বাঙালির উৎসব। ধারণা করা হয় উৎসব এক প্রাচীন রীতি এবং মানুষের উৎসব উদ্ভবের ইতিহাস তার পৃথিবীতে আবির্ভাবের সমপর্যায়ের। অর্থাৎ, ভাষা সৃষ্টিরও আগের। নিয়ত অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের সাথে সাথে প্রভাবিত হয়েছে উৎসব। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর বা অর্থনীতির মতো অনুঘটকগুলো উৎসবের প্রসারে যেমন ভূমিকা রেখেছে, তেমনি এর মাত্রাতিরিক্ত চাহিদায়, বিলুপ্তির মুখেও পতিত হয়েছে অনেক উৎসব।

ধর্মীয় উৎসব, দেশাত্মবোধক বা জাতীয় উৎসব, স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত উৎসব বা ঐতিহ্যবাহী উৎসবের বাইরে আরও কিছু উৎসব উপলক্ষ হয়ে এসেছে বাঙালির জীবনে। স্বামীকে ভগবান জ্ঞানে জামাইষষ্ঠী উৎসব, ভাইবোনের সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করতে রাখিবন্ধন উৎসব, ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে ভাইফোঁটার মতো লোকাচার উৎসব তো আছেই। আছে আকিকা, মুখেভাত বা জন্মোৎসবের মতো পারিবারিক উৎসব।

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাঙালির জীবনে আনে উৎসবের বারতা। ঋতু পরিবর্তনের সাথে মানুষের যে সার্বিক পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনের সহগামী উৎসব। প্রতিটি সমাজেই নিজ নিজ সংস্কৃতি ও অবকাঠামোয় উদযাপিত হয় উৎসব, যেখানে মানবতার উৎকর্ষ সাধন, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মানবিক চেতনা-প্রসূত মূল্যবোধ এবং সম্প্রীতির বিকাশ ঘটে, মতপার্থক্যের অবসানে তৈরি হয় সমঝোতার পরিবেশ। উৎসব উদ্ভবের প্রাথমিক লগ্নে এত আয়োজন যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না উৎসব কেন্দ্রীক অর্থনৈতিক তৎপরতাও। কালক্রমে উৎসবে ঘটে নানান মিশ্রণ। উৎসবে সঞ্চারিত আনন্দ সকল নৈরাজ্য ও অস্থিরতা কাটিয়ে হৃদয়কে করে প্রসারিত। যুগে যুগে উৎসবের এই প্রসারতা লাভ করতে পেরিয়ে গেছে অনেকটা কাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলায় ষড়ঋতুর উৎসব : উৎস অনুসন্ধান

বাংলায় ষড়ঋতুর উৎসব

বিশেষ একটি দিনের সুন্দর ও শুভ সূচনা প্রাণিত করে সব বাঙালিকেই। সে দিনটি অন্য সব দিনের থেকে ভিন্ন, কারণ সেখানে থাকে আশাদীপ্ত মঙ্গলের প্রত্যাশা। বাঙালির বিশেষ সেই দিন-উৎসবের দিন। এ দিনের মধ্যে অনেকগুলোই প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ, ঋতু উৎসবের দিন। যে দিনে প্রকৃতিকে শুধু ভালোবাসার উচ্ছ্বলতা প্রকাশই নয়, বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রকৃতির কৃপা লাভের কৃতজ্ঞতারও। সামাজিক বিধি নিষেধ, লোকাচারের বাড়াবাড়ি কখনো ঠাঁই পায় না এই উৎসবে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা যায়, উৎসব এক প্রাচীন সাংস্কৃতিক রীতি। নৃ-বিজ্ঞানীরা এর উদ্ভবকাল বিষয়ে নিখুঁত ধারণা দেয়া প্রায় অসম্ভব মনে করলেও, অতীতের অনেক নিদর্শন থেকে তাঁরা এই মতে পৌঁছেন; মানুষের উৎসব উদ্ভবের ইতিহাস মানব জাতির পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময় থেকেই। পর্যায়ক্রমে সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে সে সব উৎসব।

উৎসব উদ্ভবের মতো বাংলায় ঋতুভিত্তিক উৎসবের উদ্ভব ঠিক কবে থেকে, তার দালিলিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইতিহাসবিদদের আলোচনার সূত্রে প্রতীয়মান হয় যে- প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির ফুল-ফল ভক্ষণ, পশুশিকারকেন্দ্রিক খাদ্যসংগ্রহ, আগুনের আবিষ্কার এবং যৌথ কৃষি কার্যক্রমে শুরু হওয়া মানুষের দলীয় জীবনের বাঁকে বাঁকেই এর উদ্ভব। তাই বলা যায়, বাঙালি জনরুচিও গড়ে উঠেছে বাংলা বারো মাস আর ছয় ঋতুর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে।

অনুমান করা হয়, চতুর্থ শতকের দিকে গঙ্গা নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা নতুন জনপদ 'গঙ্গারিড'ই মূলত প্রাচীন বাংলাদেশ (মৃত্যুঞ্জয়, ২০১০ : ১৩)। সভ্যতার বিকাশ ধারায় এ দেশে নানা যুগের শাসন আমল – বৌদ্ধ, হিন্দু, সুলতানী, মুঘল এবং দীর্ঘদিন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, আপন সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে বাঙালি জাতি স্বতন্ত্র্যভাবে খুঁজে পেয়েছে আত্মপরিচয়, নিজের উৎসব। পারিবারিক আনন্দ আবহ থেকে শুরু করে, সমাজ ও ধর্মীয় রীতি-প্রথা পালনের পাশাপাশি প্রকৃতির ঋতুভিত্তিক উৎসব-উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় উৎসবপ্রিয় বাঙালি জাতির মনে। হাজার বছরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে আপন শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েই হয়তো বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

ভালো ফসল প্রাপ্তির কামনা এবং ফললাভের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শুরু হয় নানা লোকাচার; উল্লেখ করে মৃত্যুঞ্জয় রায় লিখেছেন :

> বৈশাখে যেমন পালন করা হয় বিষু উৎসব ও পুণ্যিপুকুর ব্রত, তেমনি শ্রাবণে বারি বর্ষণের জন্য দেয়া হয় বরুণ দেবের পূজা বা শিব পূজা, পৌষে করা হয় বাস্তু পূজা। তেমনি অতীতে গোকুল ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, জয়মঙ্গল ব্রত, ভাদ্র মাসে ভাদুরি ব্রত, চৈত্রে সোমেশ্বরীর ব্রত ইত্যাদিও প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে হল প্রবাহ, জালাকাছানি, সাইতরোয়া, কীরবাস, গোছোরবোনা, আগধান ইত্যাদি কৃষিব্রতের প্রচলন লক্ষ করা যায়। (মৃত্যুঞ্জয়, ২০১০ : ২০-২১)

যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির পালাবদল ও ঋতুর বৈচিত্র্য গভীর প্রভাব ফেলে চলেছে এ দেশের মানুষের জীবনে। গ্রামাঞ্চলে সময় গণনায় ঋতু ও বাংলা মাসের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু প্রবাহের ধরন, প্রাণির জীবনচক্র, জীবিকার উৎসব বা জীবন ধারণে বৈচিত্র্য – সবই প্রভাবিত হয় ঋতুচক্র দ্বারা।

'বিপর্যস্ত ঋতুচক্র' প্রবন্ধে দীপিকা ঘোষ (২০১৪) লিখেছেন, ঋতুচক্রের আবর্তনক্রিয়া মহাবিশ্বের অন্য কোনো গ্রহে অস্তিত্বমান রয়েছে বলে এখনো জানা যায়নি। তাই মহাবিশ্বে আবিষ্কৃত গ্রহগুলোর মধ্যে এখনো অবধি পৃথিবী নামক গ্রহেই জলবায়ু ও আবহাওয়ার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি বজায় থাকায়, সব ধরনের প্রাণ টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান। এদিকে, মহাদেশগুলোর মধ্যে শুধু এশিয়া মহাদেশের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশে সুস্পষ্ট পার্থক্যে ছয় ঋতুর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভব করা যায় বলে উল্লেখ করেন দীপিকা।

এই ষড়ঋতুর রূপ ও প্রকৃতি বন্দনায়, সুদূর অতীত থেকেই বাঙালি কবি-সাহিত্যিকেরা অবগাহন করেছেন। যেমন- মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলিতে বিদ্যাপতি লিখেছেন, 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/ এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর'। এই বিরহের অনুভূতি গাঢ় হতে পেরেছে বর্ষা-ঋতুর প্রভাবে। মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্য 'মেঘদূত'-এ একখণ্ড মেঘ হয়ে ওঠে বিরহীর বার্তাবাহক। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান – 'শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন আমলকির এই ডালে ডালে' বা 'রোদন-ভরা এ বসন্ত, সখি,/ কখনো আসেনি বুঝি আগে'; শুনলেই বোঝা যায়, ঋতু কবি-মনে কতখানি প্রভাব ফেলতে পেরেছে। কিংবা প্রকৃতিই কাজী নজরুল ইসলামকে উচ্চারণ করিয়েছে, 'এসো শারদ প্রাতের পথিক/ এসো শিউলি বিছান পথে/ এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে/ এসো অরুণ কিরণ রথে'। বেগম সুফিয়া কামাল সাঁঝের মায়া কাব্যগ্রন্থে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় স্মৃতিকাতর হয়ে লেখেন, 'কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী/ গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে/ রিক্ত হস্তে'।

বাংলার মানুষের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরিচয়ে অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে বার বারই এসেছে ঋতুবন্দনা। আর একে উৎসবে পরিণত করতে কবিগুরুর বিশেষ অবদান রয়েছে; তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ঋতু উৎসবের

আয়োজন করতেন বেশ ঘটা করেই। সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত শরৎ উৎসব-১৪২৮ বঙ্গাব্দের স্মরণিকায়, রবীন্দ্রনাথের উৎসব-ভাবনা প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান (২০২১) লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উৎসবপ্রিয়। তাঁর জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে ঋতু-উৎসব থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপন ও হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব উৎসব যে কবি নিজেই প্রবর্তন করেছিলেন, তা নয়। যেমন, ১৯০৭ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম যে ঋতু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তার উদ্‌যোগ করেছিলেন কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথ – মৃত্যুর কয়েক মাস আগে। পরের বছর ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে কবি দিয়েছিলেন বর্ষামঙ্গল উৎসব আয়োজনের ভার। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য তাতে যোগ দিতে পারেননি – তিনি শিলাইদহে ব্যস্ত ছিলেন পল্লী পুনর্গঠনের কাজে। অনুপস্থিতির সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তিনি শারদোৎসবের আয়োজন করেন এবং সেই থেকে – *শারদোৎসব* নাটকের মতো – প্রত্যেক ঋতুতেই তার উপযোগী নাটক ও গান রচনা করেন : বসন্ত আসে *রাজা* ও *ফাল্গুনীতে*, বর্ষা *অচলায়তনে*, ছয় ঋতুর সমাবেশ হয় *নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায়*। (আনিসুজ্জামান, ২০২১)

আনিসুজ্জামান লিখেছেন, বর্ষা-শরৎ-বসন্তে নানা উৎসবের সাজ দেখা যায় প্রকৃতিতে। নব আনন্দ, নব উৎসব সবকিছুই বিরাজমান। শুদ্ধচিত্তে প্রবেশের অপেক্ষা শুধু। 'বসন্ত উৎসব – রবীন্দ্রনাথের আদর্শ' শীর্ষক এক লেখায় পাওয়া যায় :

> দুর্গাপুজো এড়িয়ে শারদোৎসব, বিশ্বকর্মাকে সম্মান দিয়ে শিল্পোৎসব – বাংলাভাষা ও সমাজে শান্তিনিকেতন নতুন শব্দ ও ভাবনার সংযোজন করেছে। নববর্ষের দিন শ্রীগণেশ বা এলাহি ভরসা, আমপাতা-সিঁদুর, পঞ্জিকা, হালখাতা আর লাড্ডু ছাড়াও যে নববর্ষ পালন হতে পারে সেটা শিখিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন। আজকের বাংলাদেশ সেই ধর্মীয়-অনুষঙ্গহীন অনুষ্ঠানকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান-বিবর্তন হল এই বসন্তোৎসব। তখন থেকেই দেশ-বিদেশের নানা অতিথির পাশাপাশি উৎসবে সামিল করা হতো আদিবাসীদেরও। সেই প্রথা আজও চলছে। (২০২০)

সেই প্রথার রেষ ধরে বলা যায়, বাঙালির স্বতন্ত্র ভাষা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও নিজস্ব সংস্কৃতির ধারার সাথে যুক্ত তার ধর্ম, ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্য, পারিবারিক কাঠামো, শ্রেণিগত সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক কাঠামো। সাথে যোগ হয়েছে সময় গণনার রীতি, বিভিন্ন লৌকিক ক্রীড়া, লোক-উৎসব, মেলা, লোকশিল্প, লোকগীতি, নৃত্য ও বাদ্য। তাই ঋতু ঋতুউৎসবের উৎস সন্ধানে এ দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যগুলোর পর্যবেক্ষণ জরুরি।

ঋতুভিত্তিক উৎসবের সূচনা

বাংলা বছরকে ঘিরে বাঙালির নানা উৎসব আয়োজনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। গ্রামাঞ্চলে লোকমুখে বলা হয়ে থাকে 'রত' শব্দ থেকে 'ঋতু' শব্দটির উৎপত্তি। 'দুই মাস নিয়ে এক একটি পর্ব রত বলে, দুই মাসে এক ঋতু' – এমন তথ্য দেন সাইমন জাকারিয়া। 'বাংলা ঋতু-মাসের নামবিচার' (২০১১) প্রবন্ধে 'ঋতু' শব্দের অর্থ আরোপ ও ব্যবহার বিধির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বাংলা অভিধান প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন : 'অগ্রহায়ণ হইতে দুই দুই মাস যথাক্রমে শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হিম – বৎসরে এই ছয় ঋতু।' অর্থাৎ এক সময় অগ্রহায়ণ থেকে বাংলা বর্ষ গণনা শুরু হয়ে ধারাবাহিক ভাবে শিশির বা শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম,

বর্ষা, শরৎ ও হিম তথা হেমন্ত দিয়ে বর্ষ গণনা শেষ করা হতো পুরোনো ঋতু আবর্তনে। পাশাপাশি বাংলা ঋতু গণনার অন্য মতান্তরে বাংলার প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম বলেও উল্লেখ করেছেন হরিচরণ। এই আলোচনা থেকে প্রাচীন বাংলার প্রথম ঋতু অগ্রহায়ণ না বৈশাখ, সে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে প্রথম ঋতু উৎসব উদ্‌যাপনের বিষয়ে আরও তথ্য সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

অবিভক্ত বাংলাদেশের কৃষির উৎপত্তি হয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগের শুরুতেই (৩০০০–২৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দ)- এমন তথ্য দেন মাধুরী সরকার (২০১৪ : ৭৭)। প্রাচীন বাংলায় ধানই প্রধান শস্য হওয়ায়, আমন ধান তোলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আদিম খাদ্যপ্রাপ্তির উৎসবের এক বিবর্তিত রূপ, যেখানে মানুষের বিশ্বাসে খাদ্য অর্থাৎ অতি আদরের ধান হয়ে উঠেছে স্বয়ং শস্যদেবী লক্ষ্মী। মাধুরী সরকার লিখেছেন :

> সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী মানব সমাজ শুধু ফসলকে দেবীরূপে পুজো করেই ক্ষান্ত নয়। ধান গাছকে একজন পরিপূর্ণ রমণীর মতো সম্মান প্রদান করেছে। রমণীর সন্তান ধারণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাদু-বিশ্বাস, – যা প্রচলিত মনুষ্য সমাজে, তা আদৃত হয়েছে ধান-চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি, রীতি রেওয়াজ ও সংস্কারের মধ্যে। ফসলের মাস অগ্রহায়ণ-পৌষ। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নববর্ষ শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাসে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে নববর্ষ স্থানান্তরিত হয় বৈশাখ মাসে। আজও শ্যামদেশে অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ পালিত হয়। এই অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস উল্লেখযোগ্য ফসল প্রাপ্তির সময়। এই ফসল প্রাপ্তিকেন্দ্রিক যে উল্লাস, – তা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'নবান্ন' নামক শস্যোৎসব। এই উৎসব মাঠের ফসল ঘরে তোলার চাঞ্চল্য ও মাটির সঙ্গে একাত্মতার উৎসব। বাংলার প্রধান ফসল আমন ধান ঘরে ওঠার সময় পালিত হয় তোষলা, নবান্ন, পৌষালী, টুসু প্রভৃতি সমজাতীয় ব্রতগুলি। শুধুমাত্র সময় ও নামের সামান্য হেরফেরে এই ব্রতগুলি প্রত্যেকটিই নব অন্ন (খাদ্য) প্রাপ্তির উৎসব,– পিঠেপুলির পার্বণ। (মাধুরী, ২০১৪ :৭৭)

শস্য ও জীবন একার্থক বিধায় সুপ্রাচীন কাল থেকে শস্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে শস্য উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রদ্যোত কুমার (১৯৮৮ : ১৩৭) যোগ করেন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শস্যের সমাগমে মানুষ মুখর হয়ে ওঠে। তাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে এই ভাবনায় শস্যগুলিকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে তারা নানা রকম উৎসব ও পূজাচারের আয়োজন করে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন শস্যের সঙ্গে অনেক দেবদেবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা করে নেওয়ার জন্যে শস্য উৎসবের কদর অনেক বেশি, যেটা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

প্রাচীন বাংলায় প্রাণবাদে বিশ্বাসী মানুষ কৃষিব্যবস্থায় শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্কার, ব্রত, উৎসব, পার্বণ ইত্যাদি পালন করতো। শস্যকে দেবতা জ্ঞানে বিভিন্ন পূজা বা ব্রতও উদযাপিত হতো নানা আড়ম্বরে, উল্লেখ করে মৃত্যুঞ্জয় রায় লিখেছেন :

> প্রাচীন বাংলায় হাল চাষের দিন শুরু হতো চাষের অনুষ্ঠান : জমিকে উর্বর ও উৎপাদনক্ষম করার অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে কৃষকেরা একজোড়া আনাড়ি ষাঁড়ের গলায় নতুন ফলাযুক্ত লাঙ্গল জুড়ে দিত। ষাঁড় তাড়া খেয়ে এলাপাথাড়ি দৌড়ে যতগুলো ক্ষেত স্পর্শ করত আসন্ন মৌসুমে সেসব জমিতে ভালো ফসল ফলবে বলে লোকেরা বিশ্বাস করত। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে জমি ঋতুবতী হয় বলে তারা বিশ্বাস করত এবং এজন্য তারা সে সময় জমিতে চাষ করত

না। প্রাচীন রোমের 'দিয়া' পূজার মতো এদেশেও অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানিয়ে পূজা দেয়া হতো। ধান গাছ গর্ভবতী হলে বা শিষ দেখা দিলে ধানকে সাধ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সাধারণত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতেই মেয়েরা এ দিন শিষ ভরা মাঠে গিয়ে ধানকে সাধভক্ষণ করাত। ওল, মানকচু, রাইসরিষা, আউশের আতপ চাল, ঘি, মধু, হলুদ বাঁটা, সর্ষের তেল ক্ষেতে ছিটিয়ে তারা বলত–

'ধানরে ধান, সাধ খা
পেকে ফুল বাড়ি যা।'

এরপর আসত ধান পাকা ও পাকা ধান কাটা-মাড়াইয়ের অনুষ্ঠান। (মৃত্যুঞ্জয়, ২০১০ : ১৯)

এমন তথ্য উপাত্ত থেকে ধারণা করা যায় ঋতুভিত্তিক উৎসব আয়োজনের ধারণা হয়তো অগ্রহায়ণ থেকেই শুরু হয়েছিল।

বঙ্গ অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে নবান্ন উৎসব পালনের রীতি চলে আসছে, এমন তথ্য সূত্রসহ উল্লেখ করেন শামসুজ্জামান খান :

পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতু গড় উৎখননে ফলে নবান্ন উৎসবের চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর ওই ঐতিহাসিক স্থান গুপ্তযুগের স্মৃতি বহন করছে। এই অনুষ্ঠানের পেছনে আদিম সংস্কার এবং যাদু বিশ্বাসের প্রভাব থাকাও খুবই সম্ভব। (শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ৫৮-৫৯)

গ্রামবাংলায় নবান্ন উৎসব লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির একটি অংশমাত্র এবং এর উৎপত্তি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার থেকেই; এমনটি উল্লেখ করে তিতাস চৌধুরী (২০১৪ : ৪৭) নবান্নকে মূলত লেকাচার (ritual) সম্পৃক্ত উৎসব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। লোকাচারে সাধারণত ম্যাজিক, ট্যাবু, টোটেম, অ্যানিমিজম প্রভৃতি আদিম বিশ্বাস ও চেনারই প্রতিফলন ঘটে।

নবান্ন উৎসবে লোকাচার প্রাধান্য পেতো, এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিজনকুমার মণ্ডলের লেখায়। প্রাচীন বিশ্বাস মতে, নতুন ধান উৎপন্নের সময় পিতৃপুরুষেরা অন্ন প্রার্থনা করে। নবান্ন শ্রাদ্ধ না করে নতুন অন্ন গ্রহণ করলে পাপের ভাগী হতে হবে, এই জ্ঞানে নতুন অন্ন প্রথমে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং কাককে নৈবেদ্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে পরিবেশন করার রীতি প্রচলিত ছিল- উল্লেখ করে বিজনকুমার লেখেন :

ভারতীয় পুরাণ ও শাস্ত্র অনুযায়ী যমের পরিকল্পনা, ঋগ্বেদে যম-পরলোকের রাজা – 'পিতৃপতি'। পরলোকে পিতৃগণ যমের সঙ্গে মিলিত হন। কাক হল মৃত্যু দেবতা যমের প্রতিনিধি। তাছাড়া বিশ্বাস মানুষের মৃত্যু হলে তার আত্মা যে পাখি বিশেষত কাক হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই অনুযায়ী শ্রদ্ধা পর্যন্ত প্রতিদিন পুকুরে ভাসানো পিণ্ডের প্রতি মৃতের আত্মীয়রা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত, কোনো দাঁড়কাক তা খাচ্ছে কিনা। এই বিশ্বাস বাংলায় সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে। সাধারণের ভাষায় মৃতের প্রতি ঐ পিণ্ডদানকে বলা হয় 'কাকবলি।' তাই মনে করা হয় শুভ উৎসব নবান্নের অর্ঘ্য আগে দিতে হয় কাককে। (বিজনকুমার, ২০১৪ : ৬১)

আদিম বিশ্বাস মতে, নশ্বর দেহ মৃত্যুর পর বিনাশ হয়ে গেলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। এ বিশ্বাস হিন্দুদের ভেতর আছে এবং প্রতিবেশী মুসলমানরাও এই ভাবনায় প্রভাবিত ছিলেন উল্লেখ করে মোমেন চৌধুরী বলেন, 'লোকবিশ্বাস মতে অবিনশ্বর আত্মা বৃক্ষ বা পশুপাখিকে আশ্রয় করে টিকে থাকে এবং মৃত পিতৃপুরুষেরা তাদের ছদ্মাবরণে বাসগৃহে আসেন। তাঁদের অন্ন দিয়ে আশীর্বাদ কামনাই হল এর উদ্দেশ্য। ...পিতৃতর্পনের সংস্কার থেকে এর উদ্ভব।' (মোমেন, ২০১৪ : ৪১)

প্রচীনকালে ভারতবর্ষে নববর্ষ শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাসে। অগ্র অর্থ আগে, আর হায়ণ অর্থ বছর। বছর শুরুর মাস বলেই হয়তো এই নামকরণ। তবে অগ্রহায়ণ শব্দের আভিধানিক অর্থ; যে সময় শ্রেষ্ঠ ব্রীহি (ধান) উৎপন্ন হয়। মূলত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস ছিল উল্লেখযোগ্য ফসলপ্রাপ্তির সময়।

বিজনকুমার মণ্ডল (২০১৪ : ৬০) লিখেছেন, মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা বছর শুভারম্ভের মাস অগ্রহায়ণ ছিল বিধায়, এই মাসকে বলা হয় মাগশীর্ষ। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যে মাসে বছরের নতুন শস্য বাড়িতে আনা হয় এবং যে মাসে নবান্ন উৎসব হয়, সেই মাস বছরের প্রথম মাস হওয়াটাই ছিল স্বভাবিক নিয়ম।

'আধুনিককালের কোনো কোনো গবেষক দুর্গাপূজাকে কৃষি উৎসব বলে মনে করেন' – এমন ধারণা প্রদ্যোত কুমারের (১৯৮৮ : ১৩৬)। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, দুর্গাপূজায় নবপত্রিকার ব্যবহার ও নবপত্রিকাকে গঙ্গায় স্নান করানোর প্রথাই যথেষ্ট ইঙ্গিত বহুল। তাছাড়া বর্ষণের পরে শস্য প্রাপ্তির প্রাক্কালে এ পূজোর প্রচলনও শস্য ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেয়। আবার কেউ নবপত্রিকার ব্যবহার দেখে এবং শরৎকালে আউশ ধানের সংগ্রহ থেকে অনুমান করেন দুর্গাপূজা নবান্নের উৎসব।

লোকউৎসব 'নবান্ন' বাঙালি ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সাথে হৃদয়ের বন্ধনকে অটুট রাখার এক চেতনার নাম। আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, উৎসব, পার্বণ এবং জীবনধারার সবটাতে কৃষি অর্থাৎ প্রধান খাদ্যশস্য 'ধান' জীবনধারণের মূল শক্তি বলে বিবেচিত হতো বিধায়, প্রধান ও অনেক উৎসব শস্যকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হতো। 'নবান্ন' এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

গ্রীষ্মকালীন উৎসবের সূচনা

ইংরেজি বছরের পাশাপাশি বাংলা বছর যখন শুরু হলো, তখন থেকেই তা পালিত হতো। তবে পহেলা বৈশাখ থেকে বাংলা বছর গণনা শুরু করা নিতান্তই প্রয়োজনে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহর লেখায়। তিনি (২০০১ : ৪৬-৪৭) লিখেছেন, ১২০১ সালে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ জয়ের পর মুসলমান শাসন আমলে তৎকালীন প্রচলিত শকাব্দ ও লক্ষণাব্দ সনের পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে হিজরি সনের প্রচলন শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বকালের আগ পর্যন্ত হিজরি সনই প্রচলিত ছিল। ১৫৭৬ সালে

বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনভুক্ত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে ও ফসলের মৌসুমের দিকে লক্ষ্য রেখে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে হিজরি সনের পরিবর্তে ঋতুভিত্তিক সৌর সনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তখনকার প্রচলিত হিজরি সনকে 'ফসলি সন' হিসেবে নামকরণ হয়। যার মাধ্যমে বর্তমান বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের জন্ম হয়। এতদসংক্রান্ত সম্রাট আকবরের নির্দেশনামা জারি হয় ৯৯৩ হিজরি, ৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১০ মার্চ ১৫৮৫ সালে এবং তা কার্যকরী করা হয় সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের স্মারক বর্ষ ১৫৫৬ সাল মোতাবেক হিজরি ৯৬৩ চান্দ্র সনকে ৯৬৩ বাংলা সৌর সনে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে। বাংলা সনের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত থাকলেও ৯৯৩ হিজরির ১৪ রবিউসসানি মোতাবেক ১৫৮৫ সালের ১১ বা ১২ এপ্রিল। ভারত উপমহাদেশে বাংলাভাষী অঞ্চলে এই বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ প্রচলিত আছে। (তকীয়ুল্লাহ, ২০০১ : ৪৬-৪৭)

আবার মুনতাসীর মামুন (১৯৯৪ : ৯৪) জানাচ্ছেন, বাংলা নববর্ষের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। খুব সম্ভব বাংলা সনের সঙ্গে যোগ আছে বাংলা নববর্ষ পালনের। সম্রাট আকবর বাংলায় বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন ১৫৮৫ সালে, কিন্তু তার হিসাব ধরা হয় ১৫৫৬ সাল অর্থাৎ তাঁর সিংহাসনারোহনের সময় থেকে। বাংলা সনের ভিত্তি হিজরি চান্দ্রসন ও বাংলা সৌরসন। বাংলার তৃণমূল পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল বাংলা সন। এর একটি কারণ হতে পারে এই, বাংলা সনের ভিত্তি কৃষি এবং বাংলা সনের শুরুর সময়টা কৃষকের খাজনা আদায়ের। যেমন, চৈত্রে বৃষ্টি হলেও কিন্তু কৃষক লাঙল দেয় না খেতে, লাঙল দেয়া হয় সাধারণত বৈশাখে, বৃষ্টির কামনাও সেজন্য। অবশ্য, চৈত্রে বৃষ্টি হলেও লাঙল দেয়া হয়। তবে, যাই হোক, এখনও সাধারণ মানুষ তাঁর নিত্যকর্ম সম্পাদন করেন বাংলা সনের নিরিখে।

মুনতাসীর মামুনের (১৯৯৪ : ৯৫) মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একেক ঋতুতে নববর্ষ শুরু হয়। বাংলা নববর্ষ গ্রীষ্মে, যেটা খুব মনোরম মাস নয়। উৎসব ও আনন্দও তেমন হতে পারে না তখন, যেমন হতে পারে শীত বা বসন্তের শুরুতে। অনেকের ধারণা, কৃষির দিক বিবেচনা করলে বাংলা নববর্ষ অগ্রহায়ণেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। যেমন, অগ্রহায়ণ ফসল কাটার মাস। কিন্তু, নতুন বছর শুরু হচ্ছে বৈশাখে।

এ প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্তের উদ্ধৃতি তুলে ধরে মুনতাসীর (১৯৯৪ : ৯৫) লিখেছেন, 'হয় হেমন্তে, নয় বসন্তে অর্থাৎ শস্য এবং ফুল-ফল যখন নতুন করে জন্মাতে শুরু করে, তখন থেকেই নতুন বছরের হিসাব ধরা। এটিই ছিল প্রাথমিক রেওয়াজ। পরে নানান ব্যবহারিক প্রয়োজনে সেটি অন্যান্য ঋতুতে সরে গেছে কালের বিবর্তনে। পয়লা জানুয়ারি বা পয়লা বৈশাখ থেকে বছর আরম্ভ করার রেওয়াজ তাই অনেক অর্বাচীন।' এনামুল হকের উদ্ধৃতি তুলে ধরে মুনতাসীর আরও লিখেছেন :

> যেখানে যে ঋতু প্রধান্য পেয়েছে, সেখানে সে ঋতুকেই কেন্দ্র করে প্রধান উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। তদুপরি ছোটখাট, আর্তব উৎসব তো নিয়মিতভাবে চলতই। এ বিষয়ে বাংলার স্থান নিয়ে স্বতন্ত্র ছিল। তার প্রধান 'আর্তব উৎসব' যে গ্রীষ্মকালে ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর সর্বত্র যেমন প্রধান 'আর্তব উৎসব' নববর্ষের উৎসব রূপে পরিগণিত হয়েছে, আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালীন প্রধান উৎসবও নববর্ষের উৎসব

> রূপে পরিগণিত হয়ে থাকবে, আমার মনে হয়, কাল-বৈশাখীর তান্ডব লীলা ও তার পরে পরেই প্রকৃতির নতুন সৃষ্টির যে রূপটি বাংলাদেশে দেখা দিয়ে থাকে, তাই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে গ্রীষ্মকালের এবং গ্রীষ্মকালীন উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্বীকার করে ডিনতে বাধ্য করেছিল। নইলে, এখানকার নববর্ষের অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি ধর্মের প্রভাবে বিপুলভাবে প্রভাবিত হ'ত। কেননা, আমাদের দেশ আদিম অধিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃস্টান অধ্যুষিত দেশ। অথচ এ সমস্ত ধর্মের কোনো বিশিষ্ট প্রভাব আমাদের নববর্ষের অনুষ্ঠানে ও উৎসবে দেখা যায় না। (মুনতাসীর মামুন, ১৯৯৪ : ৯৫-৯৬)

নববর্ষ উৎসবকে প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো উল্লেখ করে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০১ : ৬০) বলেন, সারা পৃথিবীতে বহু যুগ ধরে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নববর্ষের উৎসব এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আসছে। বিশ্বনিখিলে সৃষ্টি ও সংহারের যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়, তাকে গ্রহণ করে সৃষ্টির যে বার্ষিকী পালন করা হয়, তাকে ঘিরে জমে ওঠে নববর্ষ উৎসব।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৯ : ২৫৪) মনে করেন, ইংরেজদের দেখাদেখি শতাধিক বছর পূর্ব থেকে বাঙালি আড়ম্বর করে নববর্ষ উদযাপন শুরু করে। যার পেছনে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদী চেতনা। রাজনারায়ণ বসু নিজেকে এই উৎসবের প্রবর্তক বলে দাবি করেন, এমন উল্লেখ করে বিশ্বজিৎ ঘোষ আরও লিখেছেন, এর বহু আগে থেকেই ঘরোয়া পর্যায়ে এবং রাজস্ব আদায়-সূত্রে বাঙালি সমাজে নববর্ষ উদযাপিত হতে থাকে।

নববর্ষের উৎসবের সঙ্গে শুরু থেকেই আছে কৃষির সম্পর্ক, আবহাওয়ার সম্পর্ক, গ্রামীণ জীবনের প্রতিদিনের সম্পর্ক। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পহেলা বৈশাখ উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত কলকাতা শহরে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত হিন্দু বা মুসলমান পরিবারে, বাংলা নববর্ষ উদযাপনে উৎসাহ দেখা যায়নি উল্লেখ পূর্বক, সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতিচারণ করে বলেন, সে সময় কলকাতা শহরে ইংরেজদের দাপটে ইংরেজি নববর্ষ এবং বড়দিন পালনে জাঁকজমক দেখা যেত :

> আমি তখন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতাম। আমার দ্বায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি দায়িত্ব ছিল আরবি মাস এবং বাংলা মাসের খোঁজ-খবর রাখা এবং সেসব মাসগুলোতে কি কি পূজা-পার্বণ আছে সেগুলোর ঘোষণা রেডিও থেকে দেয়া। আমার অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আরেকটি অনুষ্ঠান ছিল প্রতি রবিবার সকালে 'সাহিত্য বাসর' এ সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা করা। বাংলা নববর্ষ এলে তার নিকটবর্তী সাহিত্য বাসরে আমি নববর্ষের অনুষ্ঠান করতাম। (আলী আহসান, ২০০১ : ৩৩)

বাংলা কাব্যের মধ্যযুগে নববর্ষ পালন বলে কিছু নেই উল্লেখ করে আলী আহসান (২০০১ : ৩২) আরও যোগ করেন, মধ্যযুগের কাব্যে ঋতুর বর্ণনা আছে, আবার বারোমাসি আছে। ঋতুর বর্ণনায় বসন্তঋতুর ক্ষেত্রে চৈত্র ও বৈশাখ – এ দুটি মাসের কথা আসত। তবে বসন্ত ঋতুর মাসের হিসেবে বৈশাখের উল্লেখ থাকলেও বৈশাখকে সুস্পষ্টভাবে 'বারোমাসি'তেই পাওয়া যায়। আলী আহসান বলেন, 'বারোমাসি' হিন্দি কাব্যেও আছে, বাংলাতেও আছে। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায়'ও 'বারোমাসি' আছে। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে আরও যোগ

করেন, মধ্যযুগের কাব্যে পহেলা বৈশাখের চর্চা নেই। পহেলা বৈশাখটি আধুনিক সময়ের সৃষ্টি – উনিশ শতকে এই উৎসব নাগরিকতা পায়।

কবে, কোথায় বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয়, সে কথা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, আ. ন. ম.নুরুল হক (২০০১ : ১২১) বলেন, বাংলা সনের প্রবর্তক হচ্ছেন সম্রাট আকবর। ইংরেজি ১১ এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া বাংলা সনের শুভযাত্রায় এই সনের নাম ছিল 'ফসলি বছর'। ফসল কাটার মৌসুমে বাদশাহী খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যই তিনি এই সনের প্রবর্তন করেছিলেন।

মুনতাসীর মামুন (১৯৯৪ : ৯৭) মনে করেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি উপাদান হিসেবে পহেলা বৈশাখ পালন শুরু হয়। আইয়ুব আমলে, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ শুরু হলে, ছায়ানট ১লা বৈশাখে নববর্ষ পালন উপলক্ষে রমনার বটমূলে আয়োজন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের। গোঁড়া ধর্মবাদের বিরুদ্ধে তা ছিল প্রতিবাদ। ছায়ানটের এই প্রচেষ্টা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠীর আদর্শের প্রতিবাদে ঘটা করে বাংলা নববর্ষ পালিত হতে থাকে। এভাবে তৃণমূল পর্যায়ের নববর্ষ পালনের সঙ্গে যুক্ত হয় শাহরিক প্রচেষ্টা।

বাঙালি মুসলমানদের নববর্ষমনস্ক হয়ে ওঠার পেছনে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন গভীর সম্পর্কিত ছিল। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০০১ : ৯২) মনে করেন, বাঙালির মজ্জাগত বাঙালিত্ববোধ তার সত্তায় মিশে থাকলেও, দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক উচ্চারণ ছিল অবদমিত। দীর্ঘকালের সুপ্ত সেই জাতিসত্তাবোধ নিজেকে প্রকাশের সুযোগ পায় উনিশশ সাতচল্লিশের পর থেকে। মাতৃভাষা বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আঘাত ছিল এর মূল কারণ। তিনি বলেন, 'ভূমিকম্পের আঘাতে যেমন নদীর উৎসমুখ খুলে যায়, ভাষা আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় আঘাত সেভাবেই কাজ করেছিল, বাঙালি সংস্কৃতির স্রোতে তখন থেকেই আমাদের অবগাহনের শুরু।' (জিল্লুর, ২০০১ : ৯২)

বাংলা বছরের প্রথম দিনটি পুণ্যাহ নামে প্রচলিত ছিল। পুণ্য দিন বা পুণ্য কর্ম দ্বারা উদ্‌যাপনীয় বিধায় দিনটিকে বলা হত পুণ্যাহ। করুণাময় গোস্বামী (২০০১ : ৬৮) বলেন, ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে বাংলা বছরের প্রথম দিন পুণ্যাহ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। যেদিন জমিদারগণ আনুষ্ঠানিকভাবে খাজনা আদায় শুরু করতেন। শুধু সেই দিনটিই নয়, পুরো আয়োজনটিও পরিচিত ছিল পুণ্যাহ নামে। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া বিবরণের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে যে কোনো দিনকে পুণ্য কর্ম দ্বারা পুণ্যাহ হিসেবে উদ্‌যাপন করতে পারেন। তাই সেই অর্থবছরে পুণ্যাহ একাধিক দিনও হতে পারত। করুণাময় গোস্বামী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষে* উল্লেখিত পুণ্যাহের অর্থ তুলে ধরেন এভাবে – বাংলায় জমিদারদের নববর্ষের শুভ প্রথমদিন, যে দিন নববর্ষের খাজনা আদায় করা হতো।

করুণাময় (২০০১ : ৭০) আরও উল্লেখ করেন, ময়মনসিংহের গৌরিপুর জমিদার বাড়িতে পুণ্যাহতে প্রথিতযশা হিন্দুস্তানীরা সমবেত হয়ে আসর বসাতেন। এই নিয়মের প্রচলন ছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদার বাড়িতেও। মিলনের আদর্শে উজ্জীবিত হতেই রবীন্দ্রনাথ নববর্ষসহ নানা ঋতু উৎসবের প্রচলন করেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিমণ্ডলে। এই আবহ বিরাজ করত জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের কাছারি বাড়িতেও। নববর্ষ প্রভাতে চলত পুণ্যাহর আয়োজন।

কৃষির সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর বিশেষ উৎসবের দিন পহেলা বৈশাখ। আর পহেলা বৈশাখে উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন হালখাতা। বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা সম্ভবত 'হালখাতা' থেকেই – এমন মন্তব্য করে আ. ন. ম. নুরুল হক বলেন :

> সেকালে ক্রেতাগণ নির্দিষ্ট কোন দোকান থেকে বাকিতে কেনাকাটা করতেন। দোকানি একটা লাল রঙের খেরো খাতায় বাকির হিসাব লিখে রাখতেন। নববর্ষের 'হালখাতা' অনুষ্ঠানে কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রন জানানো হত ক্রেতাগণকে। ক্রেতাগণ কখনো পুরা পাওনা, কখনো আংশিক পাওনা পরিশোধ করতেন। দোকানি মিষ্টি দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করতেন। (নুরুল, ২০০১ : ১২২)

সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট' পহেলা বৈশাখের ভোরে নববর্ষকে বরণ করে আসছে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। রাজধানী ঢাকার রমনা লেকের বটমূলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথে প্রভাত বীণায় মুখর হয়ে ওঠে শিল্পী-শ্রোতা বেষ্টিত পরিবেশ। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি এবং আবৃত্তি পরিবেশনায় হাজারো মানুষের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে রমনা বটমূলের গাছ-গাছালি ঘেরা সবুজ চত্বর।

'১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার ব্যাপারে সংস্কৃতি কর্মীরা সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তারই অঙ্গ হিসেবে শুরু হয় নববর্ষ উদ্‌যাপন। যার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে ছায়ানট' – এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করে আনিসুজ্জামান (২০০১ : ৩১৪) বলেন, একথা অনস্বীকার্য, তখন পরিবেশ ছিল অবরুদ্ধ। আর এই পরিবেশই মনের জোরকে যেন বাড়িয়ে দেয়, করে তোলে প্রতিবাদী। এই প্রতিবাদ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। নববর্ষ একটা সামাজিক মিলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে শুরু করে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ছায়ানটের বর্ষবরণ শুরুর সময়টা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। রমনার অশত্থ তলে নববর্ষের সঙ্গীতানুষ্ঠানটি ১৯৬৮ সালে শুরু হলেও, ১৯৬৩ সাল থেকে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনের আবহে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করত – এমন তথ্য হাবিবুর রহমানের (২০০১ : ৬২)। অজয় দাশগুপ্ত (২০০১ : ৮৬) উল্লেখ করেন, ১৯৬৪ সালে রমনার অশত্থমূলে এর সূচনা।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের প্রেরণা থেকে ছায়ানট রমনার বটমূলে নববর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেয় (করুণাময়, ২০০১ : ৭১)। রমনার বটমূল বেছে নেয়ার ধারণায় ছিল – একটি নিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে বিপুল সংখ্যক মানুষকে উৎসবে সমবেত হতে উজ্জীবিত করা। ততদিনে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামের বিস্তার লাভের পাশাপাশি জোরালো হয়েছে 'বাংলাদেশ বোধ'। ফলে নববর্ষ উদযাপনের ভাবাদর্শ দারুণভাবে প্রভাবিত করে বাঙালিকে। এর ফলাফল তুলে ধরে করুণাময় লেখেন :

> সেই যে সূচনা ঘটলো, এর পর থেকে শুধুই এগিয়ে চলা, শুধুই বিস্তার, শধুই বহুমাত্রিক বিকাশ এই নববার্ষিক উৎসবের। সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, নববর্ষ পালনের অঙ্গীকারকে বৃহত্তর পটভূমি রচনা করে দিল। রমনার বটমূলকে কেন্দ্র করে আজ সারা বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব বিস্তার লাভ করেছে। নতুন নতুন সৃজনশীল উদ্যোগ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। (করুণাময়, ২০০১ : ৭১)

পহেলা বৈশাখের সকালে, নানা ধরণের ভাস্কর্য, মুখোশ ও প্ল্যাকার্ড হাতে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে চারুকলা অনুষদ থেকে ছাত্র-শিক্ষকের একটি শোভাযাত্রা বের হয়; যা মঙ্গল শোভাযাত্রা নামে পরিচিত।

পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মঙ্গল শোভাযাত্রা একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। যশোরে প্রথম শুরু হওয়া শৈল্পিক এই আয়োজন ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে বাঙালি জীবনের ঐতিহ্য। মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার নং ৫) থেকে এই আয়োজনের উদ্ভবকাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাংলা ১৩৯৫ সালের চৈত্র মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চারুকলা ইন্সটিটিউটের কয়েকজন শিক্ষার্থী বাংলা বর্ষবরণে এক উৎসবের আয়োজ করে। লোকজ শিল্পের রঙ, রূপ, আকার, সাজ ও কাঠামোগত বিশাল নির্মাণই এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য। প্রথম বছরর শিল্পি হাসেম খান এ উৎসবের নাম দেন আনন্দ শোভাযাত্রা। পরের বছর এই নাম পরিবর্তন করে ভাষা সৈনিক-চিত্রশিল্পী ইমদাদ হোসেন উৎসবটি মঙ্গল শোভাযাত্রা নামে পরিচয় করান সারা দেশে। সেই থেকেই পালিত হয়ে আসছে উৎসব; মঙ্গল শোভাযাত্রা।

সেখানে গৃহীত এক সাক্ষাৎকারে আমিনুল হাসান লিটু, যিনি প্রথমবার আয়োজিত আনন্দ শোভাযাত্রা উদ্যোক্তাদের একজন, জানান – প্রথমে উদ্যোগ ছিল খুব ছোট আকারে উৎসব করার। উদ্দেশ্য ছিল লোকজ ঐতিহ্যকে এবং লোকজ শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে আনন্দ শোভাযাত্রায় উপস্থাপন করা। পরবর্তী কালে যে এটা এত বড় হয়ে ছড়িয়ে যাবে সেটা তখন ছিল ভাবনাতীত। তখন ভাবনায় ছিল কিছু একটা করতে হবে।

সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক একটি বড় উৎসব বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা, দেশ ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এর উদ্দীপনা উদ্বেলিত করে বাঙালিকে। বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদন (১৩ এপ্রিল ২০১৭) থেকে জানা যায়, মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, বিশেষ করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালে সচেতন শিল্পী ও নাগরিক সমাজ এই আয়োজন শুরু করে। প্রতি বছর উৎসবের বর্ণাঢ্যতা ও অংশগ্রহণের বিচারে, ২০১৬ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর বিশ্ব

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নেয়। এই শোভাযাত্রা সকল অপসংস্কৃতি ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক এক আনন্দ আয়োজন। প্রতিবেদনে চারুকলা অনুষদের ডিন নিসার হোসেনের বক্তব্য তুলে ধরে বলা হয়, আশির দশকের স্বৈরাচার সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে ধর্মকে অপব্যবহার শুরু করলে, এর বিপরীতে সব ধর্মের মানুষের জন্য বাঙালি সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা ছিল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। সেই প্রচেষ্টা থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন। প্রতিবছর একটি মূল ভাবনা থেকে আয়োজন করা হয় এই শোভাযাত্রা।

চারুকলার নবীন-প্রবীন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিলিত প্রয়াসে, বাঁশ-বেত-কাগজ দিয়ে ভাস্কর্য তৈরির ধরণ প্রসঙ্গে নিসার হোসেন বলেন, 'লোকসংস্কৃতির ধর্ম নিরপেক্ষ উপাদানগুলো যেমন – সোনারগাঁয়ের লোকজ খেলনা পুতুল, ময়মনসিংহের ট্যাপা পুতুল, নকশি পাখা, যাত্রার ঘোড়া এসব নেয়া হয়েছিল।'

সর্বপ্রথম, ১৯৮৫ সালে, যশোরে চারুপীঠ নামে একটি সংগঠন এ ধরণের একটি শোভাযাত্রার আয়োজন শুরু করে, যার নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা – এমন তথ্যের উল্লেখ করে প্রতিবেদনে জানানো হয়, যশোরের শোভাযাত্রার ধারাবাহিকতায় তৎকালীন উদ্যোক্তরা প্রথমে ঢাকায়, পরবর্তীকালে চারুকলায় মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রচলন করেন। এই মঙ্গল শোভাযাত্রা দেশের গন্ডি ছাপিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ অসাম্প্রদায়িক উৎসব।

ঋতুভিত্তিক অন্যান্য উৎসব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম শান্তিনিকেতনে দিয়ে গেছেন ঋতু-অবগাহনে আনন্দলোক উদ্‌যাপন করার শিক্ষা। গানে কবিতায় রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টি উৎসবের আবেদন, বিশ্বপ্রকৃতির ছাত্র হবার আহ্বান। প্রকৃতির সাথে মিলে সহজে আনন্দ করার শক্তিটাই তাঁর কাছে ঋতু উৎসবের সামিল। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আনন্দ ধারার প্রধান প্রস্রবণই যে এই উৎসব অনুষ্ঠান, তার পরিচয় উঠে আসে সাত্ত্বকি দত্তর (১৪ অগাস্ট ২০১৬) 'বর্ষামঙ্গল' নিবন্ধে। তাঁর লেখায় পাই, সে সময় আনুষ্ঠানিকভাবে ঋতু উদ্‌যাপনের কোনো রীতি না থাকলেও, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এক ঋতুর এক এক রকম আবেদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকৃতির সাশে মেশার সহজ শিক্ষাটুকু ছিল। তবে ঋতু-উৎসব আয়োজনের নেপথ্য কারিগর কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথ; উল্লেখপূর্বক সাত্ত্বকি লিখেছেন :

> বালক শমী তাঁর সহজ রসবোধ থেকে যে ঋতু উৎসবের আয়াজন করেছিলেন, তার মধ্যে হয়ত কোনো বিশেষ সংস্কৃতির বিশেষ রূপটি প্রকাশের কোনো অভিপ্রায় ছিল না, বিশুদ্ধ আনন্দের প্রকাশই ছিল একমাত্র অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য। ১৩১৩ সালে পঞ্চমীর দিন শমীর উদ্যোগেই শান্তিনিকেতনে প্রথম ঋতু উৎসব হল। সে উৎসবে শমী আর দুজন সাজে বসন্ত, তিনজন সাজে শরৎ। এই উৎসবের নয়মাস পরেই শমী আকস্মিকভাবে মারা যায়। এর আটমাস পরেই বর্ষা ঋতুতে শান্তিনিকেতনে পুনরায় ঋতু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে, আসলে শমীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসবের ধারণাটি গভীরভাবে নাড়া দেয় কবি

হৃদয়কে – তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের অন্তরে পৌরাণিক ঋতু-উৎসবের প্রতি একটা আকর্ষণ তো ছিলই প্রথম থেকে।

সাত্ত্বকি দত্ত (২০১৭) আরও উল্লেখ করেছেন, শান্তিনিকেতনে এর পর থেকে প্রতি বছরই বর্ষা উৎসব পালন করা হয়। প্রিয় ঋতু বর্ষার সঙ্গে প্রিয়জনের মৃত্যু জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কোনো উৎসব বন্ধ করেননি।

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল আয়োজন করতেন রবীন্দ্রনাথ। ধরণীকে সবুজে ভরিয়ে তুলতে সেদিন চারাগাছ রোপন করতেন তিনি। সেই পথ ধরে উদীচীতে শুরু হয় বর্ষা বরণের আয়োজন। সন্ধ্যায় বউবসন্তী নাটক শুরুর আগে বিকেলে অনুষ্ঠিত হতো বর্ষাবরণ। তবে প্রথমবারই শুধু এই উৎসব আয়োজন করা হয় উদীচীর প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে। এর পর থেকে বরাবরই চারুকলায়। রাজধানীতে আষাঢ়ের প্রথম দিনে নববর্ষাকে উদযাপন করতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠী। প্রায় ১৫ বছর ধরে চলছে এই অনুষ্ঠান।

রাজধানীতে শরৎ উৎসব কিছু দিন চারুকলায় উদযাপন করেছে ছায়ানট। এরপর তা অনিয়মিত হয়ে যায়। এরপর সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রায় ১৪ বছর যাবৎ শরৎ উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর শারদীয় দূর্গাপূজার আগে সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের শুরুতে এই উৎসব পালিত হয়।

শুধু শান্তিনিকেতন কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবান্নর উচ্ছ্বসিত প্রসংশায় মুখর। তিনি পল্লীবাংলার ধান-চাল ঘিরে নানা উৎসবকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই বিশ্বভারতীতে নবান্ন উৎসব আয়োজিত হতো সাড়ম্বরে। ১৯৩৫ সালে *বিশ্বভারতী নিউজ* এর ডিসেম্বর সংখ্যার উদাহরণ দিয়ে দীপককুমার বড় পণ্ডা (২০১৪ : ৬৬) তখনকার নবান্ন বিষয়ে লিখেছেন।

সংহত সমাজের সৃষ্টি বলেই সমগ্র সমাজের বাসনালোক মুক্তি পায় উৎসব-কলায়,– মানুষের আচার, আচরণে, নাচে, গানে, এমন মত মাধুরী সরকারের (২০১৪ : ৮০)। সেই ধারাবাহিকতায় বর্ষবিদায় থেকে বর্ষবরণে ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো মানুষের প্রকৃতগত চেতনার আনন্দমুখর অভিব্যক্তি, মানুষে মানুষে ঐক্য ও মিলনের প্রতীক। রূপবৈচিত্র্যে ভরা এ দেশকে আরও প্রাণবন্ত করেছে ষড়ঋতুর উৎসব।

শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

ইতিহাস থেকে জানা যায় হিন্দু-মুসলমান পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন জোরদার হওয়ার আগে গ্রামাঞ্চলের দুর্গাপূজায় যোগ দিতেন আপামর জনতা। তবে শরৎকালে শারদীয় দুর্গাপূজার উৎস বিচার ও বিকাশের ধারা

নিয়ে দ্বিধা আছে ইতিহাসবিদদের। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'র উদ্ধৃতি দিয়ে মুনতাসির মামুন (১৯৯৪ : ৮১-৮২) জানাচ্ছেন, শরৎকালে রামকে দিয়ে অকাল বোধন করিয়ে দুর্গাপূজা করানো হয়। আবার পুরাণে আছে, বসন্তকালে রাজা সুরথ করিয়েছিলেন দুর্গাপূজা, যা বর্তমানে বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। রমাপ্রসাদ চন্দর বিবরণ থেকে মুনতাসীর আরো জানান, দুর্গাপূজার যত প্রাচীন উৎসই খুঁজি না কেন, এর প্রাচীনতম মহিষমর্দিনীর মুর্তিটি পঞ্চদশ শতকের।

মুনতাসীর মামুন (১৯৯৪ : ৮২-৮৩) লিখেছেন, কথিত আছে, আষাঢ় থেকে কার্তিক – এ ক'মাস দক্ষিণায়নে নিদ্রিত থাকেন দেবতা। সময়টি দেবীপক্ষ এবং পূজার সহায়ক কাল। অপর দিকে আষাঢ় আলস্যের মাস। তাই শারদীয় উৎসবের উৎসাহে এই তামসিকতা পরিহার করতে পূজার আড়ম্বর। এমনও শোনা যায়, আকবরের চোপদার রাজা কংসনারায়ণ ষোড়শ শতকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হলে তিনি প্রায় আট-নয় লক্ষ টাকা খরচ করে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করেন। সেই থেকেই এর প্রচলন।

বসন্ত উৎসব

মাঘের শেষে শীত শীত ভাব যখন কিছুটা হালকা হয়, উত্তুরে বাতাসও পালটে যেতে শুরু করে। আরম্ভ হয় বসন্তকে বরণ করার আয়োজন। 'বসন্ত উৎসব ইতিহাস ও করণীয়' (২০২০) নিবন্ধে এইচ এম মুশফিকুর রহমান ইতিহাসের সূত্র ধরে লিখেছেন, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন আর্য জাতির হাত ধরে এই উৎসবের গোড়াপত্তন। খ্রিষ্টের জন্মেরও কয়েকশ বছর আগে থেকে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে এই উৎসবটি। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে পাথরের উপর খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে এর নমুনা। যদিও এই তথ্যের গ্রহণযোগ্য সূত্র লেখক উল্লেখ করেননি।

মুশফিকুর রহমান আরও লেখেন, (২০২০) এখন যে দোল উৎসব পালিত হয়, এর নেপথ্যে রয়েছে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কিছু আদি বিশ্বাস। যে বিশ্বাসের অন্যতম দোল পূর্ণিমার দিনে (ফাল্গুণী পূর্ণিমার অপর নাম) বৃন্দাবনে আবির ও গুলাল নিয়ে রাধা ও অন্যান্য গোপিদের সাথে রঙ ছোঁড়াছুড়ির খেলায় মেতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আর সে কারণেই এখন দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তিকে আবির গুলালে স্নাত করিয়ে, দোলনায় চড়িয়ে বের করা হয় শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা শেষ হলে ভক্তেরা এবার নিজেরাও পরস্পরের গায়ে রং মাখানোর খেলায় মেতে ওঠেন।

বাংলায় বসন্ত উৎসব শুরুর ইতিহাস প্রসঙ্গে মুশফিকুর (২০২০) লিখেছেন, পুরীতে ফাল্গুন মাসে যে দোল উৎসব হতো, তার অনুকরণে বাংলায় এ উৎসব পালনের রেওয়াজ শুরু হয়। বাংলায় বসন্তকালে রাসমেলা বা রাসযাত্রারও প্রচলন হয় মধ্যযুগে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য খ্যাত নবদ্বীপেই রাসমেলার উৎপত্তি। এছাড়া,

বাংলাদেশের খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে রাসমেলায় কীর্তন আর নাচের আসর বসে। আরও উল্লেখ আছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ফাল্গুনী পূর্ণিমা উদযাপনের মাধ্যমে বসন্তকে বরণ করে নিত।

১৫৮৫ সালে সম্রাট আকবর বাংলা বর্ষপঞ্জী হিসেবে আকবরি সন বা ফসলী সনের প্রবর্তন করার পাশাপাশি প্রতি বছর ১৮টি উৎসব পালনের রীতিও প্রবর্তন করেন, যার অন্যতম বসন্ত উৎসব।

আজ সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বসন্তের প্রথম দিন পহেলা ফাল্গুন উদযাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের অবদান উল্লেখ করে মুশফিকুর লিখেছেন, ১৯৯১ সালে অনেকটা পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই বসন্ত বরণ উৎসব পালন করেন অনুষদের কয়েক শিক্ষার্থী। ফাল্গুনের আগের রাতে মৈত্রী হলে রাত জেগে শাড়িতে ব্লকপ্রিন্ট করে, পরদিন সেই শাড়ি পরে, নিজ বিভাগে উদযাপন করেন ফাল্গুন। সে সময় অদূরে, বাংলা একাডেমিতে চলমান গ্রন্থমেলা, তৈরি করে উৎসব আবহ। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের শিক্ষার্থীরাও আগ্রহী হয়ে উঠলে ১৯৯৪ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চারুকলা অনুষদে শুরু হয় বসন্ত উৎসব উদযাপন।

এদিকে, বসন্ত উৎসব মানেই রং আর আবিরে রাঙা হয়ে ওঠা সকাল। 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল' গানে গানে বসন্ত উৎসব পূর্ণতা পায় রঙের উৎসব 'হোলি' বা 'হোরী' খেলার দিনে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের 'দোলযাত্রা' তিথিতে। 'বসন্ত উৎসব–রবীন্দ্রনাথের আদর্শ' (২০২০) প্রবন্ধে পাওয়া তথ্যমতে :

> কেউ কেউ মনে করেন, ১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, বসন্ত পঞ্চমীতে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে, যে ঋতু উৎসবের সূচনা হয়, তারই পরিবর্তীত ও মার্জিত রূপ শান্তিনিকেতনের আজকের এই বসন্ত উৎসব বা বসন্তোৎসব। সরস্বতী পূজার দিন শুরু হলেও পরবর্তীকালে সে অনুষ্ঠান বিভিন্ন বছর ভিন্ন ভিন্ন তারিখ ও তিথিতে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা বা অন্য আরও দিক মাথায় রেখে কোন এক নির্দিষ্ট দিনে আশ্রমবাসী মিলিত হতেন বসন্তের আনন্দ অনুষ্ঠানে।

'শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব' (২০১৭) শিরোনামে অপর এক লেখায় আছে : আগে বসন্তের যেকোনো দিন অনুষ্ঠিত হতো এ উৎসব। পরবর্তীকালে বসন্ত পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। এ উৎসব ঋতুরাজ বসন্তে স্বাগত জানানোর উৎসব। বিশ্বভারতী উপাচার্য স্বপন কুমার দত্তের উদ্ধৃতি তুলে লেখা হয়, 'আমাদের সবার মাথায় রাখতে হবে আজকের উৎসব বসন্ত উৎসব। হোলি উৎসব নয়। বসন্তকে স্বগত জানানোর উৎসব।'

বাংলাদেশে যে উৎসব একেবারেই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে দোল পূর্ণিমার দিন বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। যা অনেকাংশে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। বিবর্তনের ধারায় এখন বাংলাদেশের বাঙালি বসন্ত উৎসব উদযাপনে আরও স্বাধীন। শীতের ঝরা পাতাকে বিদায় জানিয়ে গাছে গাছে দেখা দেয় নতুন কুঁড়ি, ঋতুরাজ বসন্তে ফুলের মেলা, দখিনা বাতাসে কোকিলের কুহুতান মোহিত করে বাঙালিকে। ফাল্গুনের প্রথম দিনেই এই উৎসব আয়োজন। বসন্ত উৎসবের ধারাবাহিকতায় রূপ পেল পৌষমেলার মতো অন্যান্য উৎসব।

মূলত বাঙালির জীবনে ঋতু উৎসব যেন চিরপুরাতনের মধ্যে নতুনের আবির্ভাব। এই নতুনত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই, এর জয়ধ্বনির জন্য। তাই দিনটি সবার কাছেই খুব কাঙ্ক্ষিত। উৎসব প্রচলিত জীবনে হঠাৎ নব আলোর স্ফুরণ ঘটায় বলে, এক স্বতঃস্ফূর্ত আমেজে জীবনকে প্রেরণাদায়ক মনে হয়। বাঙালির আত্মপরিচয়ের স্বরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি এ এক ধর্মবিভেদনাসী সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা, জাতির ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াস।

পৌষমেলা

বাংলাদেশে ঋতু উৎসব শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। এমন তথ্য দেন মানজারুল ইসলাম চৌধুরী সুইট। 'ফিরে দেখা পৌষমেলা' (২০১৭) নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, ধারণা করা হয় ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বাবা প্রিন্স দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রামে প্রথম পৌষমেলার আয়োজন করেন। 'পৌষমেলাই শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি করেছে।' রবীন্দ্রনাথের এমন উক্তির রেষ ধরে মানজারুল ইসলাম লিখেছেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পাঠের শুরু থেকে আজ অবধি যেমন পৌষমেলা জমজমাট রূপে পালিত হয়ে আসছে, তেমনি তার প্রচলন ছিল বাংলার গ্রামে-গঞ্জেও। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন :

> নবান্নে ধান কাটা শেষে গোলা ভরা ধান থাকে কৃষকের ঘরে। এ সময় নিকট কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করা হয় পিঠা পুলি খাবার জন্য। মেলা বসে হাট-বাজারে। প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র থেকে শুরু করে ঢেঁকি, কুলা ও কৃষকের নানান সরঞ্জাম, তৈজস এবং নানা ধরণের শুকনো খাবারের পসরা জমে। পাশাপাশি লোকজ সংস্কৃতির নানা উপাদান যুক্ত হয়। যেমন যাত্রপালা, লাঠি খেলা, কবিগান, সংযাত্র ইত্যাদি।এরই ধারাবাহিকতায় নগর জীবনে পৌষ মেলার আয়োজন করা হয়।

মানজারুল ইসলাম চৌধুরী সুইটের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার নং ২) থেকে জানা যায়, ১৯৯৯ সালে রমনার বটমূলে শুরু হয় পৌষমেলার যাত্রা। তখন একদিনের উৎসব হলেও, পরবর্তী সময়ে সরকার কর্তৃক রমনা বটমূল স্থানকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করায়, বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত হচ্ছে পৌষমেলা। ইতোমধ্যে এই মেলা দেশের সকল ধারার সংস্কৃতি কর্মীদের শ্রমের ফসল হিসেবে মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। উৎসব প্রাঙ্গনের প্রায় অর্ধশত স্টলে নানা নকশা ও স্বাদের পিঠেপুলির সম্ভার দেখা যায়। এ প্রজন্ম কখনো দেখেইনি আগের দিনে দাদি-নানির হাতে বানানো পিঠার মাধুর্য। নতুন ঐতিহ্যের সাথে লোকশিল্পের দারুণ এক মেলবন্ধন এ যাবৎকালের পৌষমেলা।

পৌষে কৃষকের সমৃদ্ধি, প্রকৃতিও অনুকূলে। আর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ণে ঢাকার বাইরে জেলা শহরগুলোতেও এখন আয়োজিত হয় পৌষমেলা। পৌষের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙালি জীবনে উত্তাপ নেয়ার

বিষয় আছে বাড়িতে বাড়িতে। আগে গ্রামাঞ্চলে আইলা জ্বালিয়ে উত্তাপ নেয়া হতো। সেই প্রতীক হিসেবে শহুরে এই অনুষ্ঠানে আইলা জ্বালানোর প্রথা দেখা যায়। এই উৎসবের মাধ্যমে প্রত্যাশা করা হয় সুবিধা বঞ্চিত প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে যেন সমৃদ্ধির আলো ছড়িয়ে যায়। উৎসবের স্বকীয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রাখতে বাণিজ্যকরণের হাত থেকে উৎসবগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করা এখন সময়ের দাবি।

বাংলার ঋতুভিত্তিক আয়োজনগুলো আমাদের প্রকৃত বাঙালিত্বের কাছে নিয়ে যায়, খেটে খাওয়া মানুষের কাছে নিয়ে যায়, সভ্যতার কাছে নিয়ে যায়, ইতিহাসের কাছে নিয়ে যায়, পূর্বপুরুষের কাছে নিয়ে যায়। এটাই বাঙালির অস্তিত্ব, এটাই স্বকীয়তা। তাই বাঙালি জাতির যে উৎসবগুলো আছে, যে ঐতিহ্যগুলো আছে, সেগুলোকে লালন করা, বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই প্রয়োজন। সে কারণেই হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির এই উপাদানগুলো ধরে রাখতে সচেষ্ট হওয়া উচিত সবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঋতুভিত্তিক উৎসবের ঐতিহ্য : বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার ধারক। এ দেশে বছরে ছয়টি ঋতুর আমেজ অনুভব করা যায়। প্রকৃতির পালাবদলের যে সৌন্দর্য তা মূলত গ্রামাঞ্চলে দৃশ্যমান হলেও, শহুরে জীবনে তার ক্ষণিক প্রভাব রীতিমতো সাড়া ফেলে। তাই ঋতু পরিক্রমার সাথে এক আকর্ষণ তৈরি হয় উৎসবের। এই উৎসব একেবারে লৌকিক এবং অনেকটাই প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

ঋতুভিত্তিক উৎসব ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালির দ্বিধাহীন এক মহামিলনের উৎসব। এ উৎসব জাতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত, অনাদিকালের বহু প্রতীক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ঋতুভিত্তিক উৎসবের সৃষ্টিশীলতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বাঙালিকে ঐতিহ্য নির্মাণে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, সামাজিক মিলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, জাগিয়েছে দেশবোধ ও বিশ্ববোধ। ধর্মের সীমানা পেরিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, স্থান, কাল আর জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ঋতুউৎসব পেয়েছে সর্বজনীনতা। বৈচিত্রময় আচার-অনুষ্ঠান আর লৌকিক সংস্কারে উদযাপিত ঋতুভিত্তিক উৎসব বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছে 'মঙ্গলসূচক'।

Festivals of Bangladesh গ্রন্থের ভূমিকায় আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

> Festivals tell us a lot about a nation- its history and tradition, religious beliefs and cultural patterns, ways of life and aesthetic development. Bangladesh is a new country but an old land. It has been a part of a changing whole known as Bengal. Its history goes back to over three millenia. It is home to Muslims, Hindus, Buddhists, Christians and followers of other faihs. Peoples of various ethnic origins live here. It is no wonder, therefore, that the festivals of Bangladesh should reflect this diversity. (Anisuzzaman, Foreword)

সংস্কৃতির আদান প্রদান আর উৎসবের ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ উৎসব আয়োজনকে যেমন স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে, তেমনি এ উৎসব যুথবদ্ধ সমাজজীবনে মানুষকে করেছে মানবিক, সহমর্মী, সহনশীল ও একাত্ম; দূর করেছে জাতিগত বিভেদচিহ্ন। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে ঋতু উৎসবগুলো পর্যায়ক্রমে বাঙালির মননে প্রথিত হয়ে পরিণত হয়েছে প্রাণের উৎসবে। সময়ের সাথে উৎসবের আঙ্গিকগত বিবর্তন হলেও, বাঙালির আত্মপরিচয়ের সূত্র অনুসন্ধানে এই উৎসবের ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক অর্থে পারস্পরিক সংস্কৃতিগত ভিন্নতার রূপ তুলে ধরে তাকে উপায়, উপকরণ ও বোধের সাথে যুক্ত করে। তাই একে শ্রদ্ধা করা সকল দেশেরই দ্বায়িত্ব, বলে মনে করেন ওমর বিশ্বাস। এ

প্রসঙ্গে তিনি (২০০৪ : ৩১৬) *Goals of Culture and Art* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'Cultural heritage is a key to understanding how each culture has its own principles of knowledge organization interpretation and expression.' এখানে আরও বলা হয়েছে, জানা, দেখা ও বোঝার মাধ্যমে এবং নিপুণতার সাথে অনুশীলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক এই উপলব্ধি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে। ওমর বিশ্বাসের মতে, বাঙালি যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তার ঐতিহ্যের প্রতিনিধি, তাই স্বাতন্ত্র্যবোধ তার বজায় রাখা উচিত।

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ধারণার মূল প্রবক্তা এস. এরিকসনের (S. Erixon) মতে, সকল সংস্কৃতির মধ্যে ঐতিহ্যিক উপাদান রয়েছে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসূচক অনুষঙ্গ, এমন তথ্য পাওয়া যায় ফিরোজ মাহমুদের (২০০৭ : ৪৮৪-৪৮৫) লেখায়। এরিকসনের উদ্ধৃতি এভাবে ব্যাখ্যা করেন ফিরোজ : সমাজের সকল স্তরেই এমন কিছু প্রথাগত সংস্কৃতি রয়েছে যা ঐতিহ্যগত হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি দীর্ঘদিন ধরে একই আঙ্গিকে এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে প্রচলিত হয়ে আসছে। যে সংস্কৃতির ভিত্তি যত বেশি মজবুত, সে সংস্কৃতি তত বেশি ঐতিহ্যনির্ভর। দৃষ্টান্তস্বরূপ আধুনিক সংস্কৃতির তুলনায় লোকসংস্কৃতি গভীরভাবে ঐতিহ্যনির্ভর বলেও উল্লেখ করা হয়।

তবে, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, শিল্প, প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং মানুষের যাবতীয় কর্মের ও সৃষ্টিশীলতার সামগ্রিক প্রকাশ। সংস্কৃতির সেই ধারায় বাংলা বারো মাস এবং ছয় ঋতুর উৎসবগুলো তার ঐতিহ্য ধারণ করে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

ক. ঋতুভিত্তিক উৎসবের ঐতিহ্য : বাঙালি

বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে বছরের প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। আর বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস নিয়ে গ্রীষ্মকালীন ঋতু উৎসবমুখর হয় পহেলা বৈশাখে, বর্ষবরণের বর্ণাঢ্য আয়োজনে। বাঙালির প্রধান উৎসবের তালিকায় পহেলা বৈশাখে ঐতিহ্যবাহী আয়োজনে বাংলা বর্ষবরণসহ অন্যান্য ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উৎসবের অংশ।

পহেলা বৈশাখ

ঋতু বৈচিত্র্যের এই বাংলাদেশে মানুষের জীবনে যে বর্ষপরিক্রমা, তার শেকড় প্রোথিত এই বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখে। তাই নববর্ষের এই আয়োজন কেবলই বাঙালি জাতির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, তা বাঙালি জাতির মানবিক মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা চর্চার পথ প্রদর্শক। যা যুগে যুগে মানুষকে জীবন বোধে উজ্জীবিত করেছে। তাই কাঙ্ক্ষিত এই ক্ষণকে আপন আলোয় বরণ করতে দেখা যায় নানা আয়োজন।

অনাদিকাল থেকে বৈশাখের প্রথম দিনটি পালিত হয়ে আসছে বাংলা নববর্ষ বরণের দিন হিসেবে। এ দিনটি এলে একটি নতুন আনন্দ মানবজীবনকে ঘিরে রাখে। নতুন একটি বছরের আগমন, জাতিগত উপলব্ধিতে বয়ে আনে নতুন আশা, খুলে দেয় সম্ভাবনার দ্বার। জীবনের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি আর অর্জনের হিসেবের পাশে, সমৃদ্ধ অতীতের অভিজ্ঞতাপুষ্ট জাতি, আগত বছরটিকে প্রত্যাশিত করে তুলতে চায় অভিন্ন উদ্‌যাপনের মাধ্যমে। বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ ক্ষণিকের জন্য হলেও তৈরি করে তেমনি এক মিলনক্ষেত্র।

চৈত্র-অবসানে বর্ষবিদায়ের সাথে শুরু হয় নববর্ষের সূচনা। আর এই নববর্ষকে বরণ করে নেয়ার আয়োজনই হলো পহেলা বৈশাখ। অনাগত ভবিষ্যতের শুভ কামনা জানানোই নববর্ষের প্রধান শিক্ষা; এমনটাই মনে করেন মোহম্মদ আব্দুল কাইউম :

> এক অর্থে নববর্ষের দিন হচ্ছে হিসেব মেলানোর দিন। চাষী হিসেব করে তার ফসলের, জমিদার হিসেব করে তার খাজনার আয়-ব্যায়ের, আর দোকানদার করে তার লাভ-লোকসানের হিসেব। সাধারণ মানুষ এর ব্যতিক্রম নয়, তাদের জন্যও নববর্ষ হিসেব মেলানোর দিন। জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার অঙ্ক কষে তারা নতুন আশা-আনন্দে, হাসিমুখে নববর্ষকে আহ্বান জানায়। (কাইউম, ২০০১ : ৩৩৩)

এভাবেই 'অতীতের সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে বাঙালি প্রার্থনা জানায় নতুন বছরের সূর্যোদয়ে আর একটি পরিপূর্ণ সফল বছরকে প্রত্যক্ষ করার আশায়। তাই তো বিভিন্ন উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে তারা বরণ করে নেয় নতুন বছরকে' (শামসুল হুদা, ২০০১ : ১৬২)। এই কথার সূত্র ধরে বলা যায়, বাংলা নববর্ষের এই উৎসব-ঐতিহ্য প্রাচীন হলেও সময়ের সাথে এর সংস্কার, উদযাপনের বিশেষত্ব, সৃষ্টিশীল আয়োজন আর জাতিগত সম্মিলনের আবহে পহেলা বৈশাখ যুগে যুগে ধরা দেয় নতুন রূপে।

নববর্ষের প্রথম দিন শুচিতা, শুদ্ধতা ও পূর্ণতার পথে জীবনের প্রত্যাশিত স্বপ্ন ও শপথ নবায়নের দিন। একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্মিলন প্রয়াসের সফল প্রকাশ নববর্ষ – এমন মত দিয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০০১ : ৬৬-৬৭) বাঙালির বর্ষবরণ উৎসবকে তার জাতিসত্তাগত স্বাতন্ত্র্য এবং অখণ্ডতা উদযাপনের উৎসব বলে সংজ্ঞায়িত করেন।

বাংলা নববর্ষকে 'পৃথিবীর এক বিরল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসব' হিসেবে বিশেষায়িত করে, মুনতাসির মামুন (২০০১ : ৯৬) একে একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠান এবং খাঁটি বাঙালি উৎসব বলে মত দেন। তৃণমূল থেকে শহরের সব পর্যায়ে নববর্ষ পালিত হয় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে। এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে মুনতাসির বলেন, 'মুসলিম অধ্যুষিত একটি ভুখণ্ডের উৎসব সত্ত্বেও তা বিষাদময় নয়; রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল হলেও এ ক্ষেত্রে পারেনি ধর্মজ উপাদান যোগ করতে। শুধু তাই নয়, এখনও এ নববর্ষ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও যোগ করে নতুন মাত্রা।' (মুনতাসির, ২০০১ : ৯৬)

নববর্ষ পালনের প্রাচীন ও আধুনিক রীতিনীতির প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, গোড়ায় নববর্ষ ছিল মানুষের 'আর্তব উৎসব' বা ঋতুধর্মী উৎসব। ফজল খান (২০০১ : ৩২৬) এ প্রসঙ্গে বলেন, ঋতুধর্মী বলে কৃষির সাথেও এর সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ।

নববর্ষের তাৎপর্য সমাজৈতিহাসিক এবং সে কারণেই এর ব্যঞ্জনা অনেক গভীর। এই মতের সাথে শফি আহমেদ যুক্ত করেন, নবান্ন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিত উৎসবের সুগন্ধ। সেই কাল থেকে নববর্ষ আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক বা নৃতাত্ত্বিক অর্থে একে বলে ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার; আচরণের, সংস্কৃতির, মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের। নববর্ষ ছিল সকলের, কৃষকের, দিনমজুরের, দোকানদারের, জমিদারের, কবিয়ালের, ভিক্ষুকের এবং দাতার। (শফি, ২০০১ : ২১৭)

তবে, পহেলা বৈশাখ উদযাপনের একটি লক্ষ্য থাকা উচিৎ বলে মনে করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যে লক্ষ্য বাঙালিকে দেবে তার শেকড়ের সন্ধান :

> লক্ষ্যটা কেবল যে অনুভব তা নয়, সে একটা আকাঙ্ক্ষাও বটে। আকাঙ্ক্ষার জন্যই সে তাৎপর্যপূর্ণ। ... আমরা চাই নতুন বছর পুরাতন বছর থেকে ভিন্ন হবে; নতুন বছরে সুখ আসবে উন্নতি দেখা দেবে। আমরা এগুতে পারব নতুন একটি সমাজের দিকে। সেখানে আনন্দ থাকবে একদিনের নয়। প্রতিদিনের। আর সেই সুখের অন্তরে থাকবে আত্মপরিচয়ের গৌরব ও আশ্রয় লাভের স্বস্তি এবং তা পূর্ণ হবে ঐক্যে। কেবল মিলন নয়। ঐক্যও। অন্যসব বাঙালির সঙ্গে স্থায়ীভাবে মিলবো আমরা, ঐক্যবদ্ধ হবো প্রকৃতি এবং পরিবেশের সঙ্গেও। (সিরাজুল, ২০০১ : ৩৪৭)

ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রতিবছর নববর্ষ উদযাপনের সময়টায় প্রকৃতির বৈরী আবহাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির আশঙ্কা থেকে যায়। ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে নববর্ষকে নবরূপে বরণ করা অনেকটাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তারপরও থেমে থাকে না নাগরিক জীবনে বর্ষ-আবাহন। এ বিষয়ে হাবিবুর রহমান বলেন, 'পুরাতনের মধ্যে যে জীর্ণতা আছে তা তো ধ্বংস হবেই, তাই বলে পুরাতনের মধ্যে যে চিরনবীনতা রয়েছে তাকে কেন আমরা আমন্ত্রণ জানাব না!' (হাবিবুর, ২০০১ : ৬২)

ঐতিহ্যগতভাবেই বেশ কিছু বর্ণাঢ্য আয়োজনে মিশে আছে নববর্ষের আমেজ। সময়ের সাথে এর অনেক কিছু বিলুপ্ত বা বিবর্তিত হলেও, পহেলা বৈশাখের স্বাতন্ত্র্য বলতে এখনও গুরুত্ব বহন করে বর্ণিল, আনন্দমুখর আয়োজন।

পুণ্যাহ

বাংলা বছরের প্রথম দিনটি পুণ্যাহ নামে প্রচলিত ছিল। মূলত পুণ্য দিন বা পুণ্য কর্ম দ্বারা উদ্‌যাপনীয় বিধায় এ দিনটিকে বলা হত পুণ্যাহ।

পুণ্যাহর উদ্ভব সম্পর্কে তেমনভাবে জানা না গেলেও, মুনতাসীর মামুন মনে করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তা ছিল এবং পুণ্যাহ যুক্ত ছিল নববর্ষের সাথে। ওইদিন প্রজারা ভালো পোশাক-আশাক পরে জমিদারির কাছারিতে যেতেন খাজনা-নজরানা দিতে, যেন পুণ্য কাজ করতে যাচ্ছেন। পুণ্য থেকেই পুণ্যাহ। (মুনতাসীর, ১৯৯৪ : ৯৬)

পুণ্যাহের অনুষ্ঠানে বকেয়া খাজনাও আদায় করা হত কঠোরভাবে। এর প্রক্রিয়া ছিল দুই ধরনের, একটি সেলামি বা নমস্কারি অংশ, অপরটি বকেয়া বা হালনাগাদ খাজনা আদায় অংশ। এমনি নানা আনুষ্ঠানিকতার উল্লেখ করে করুণাময় গোস্বামী লিখেছেন :

> কাছারি মূল অনুষ্ঠানগৃহের প্রধান দরজার সামনে একটি বিশালাকার পেতলের বা তামার থালা থাকত। তাতে প্রজারা এক টাকা, দু টাকা পাঁচ টাকা করে রেখে আসত। এটাকে বলা হতো সেলামি বা নমস্কারি, এর সঙ্গে মূল খাজনা শোধের কোনো সম্পর্ক নেই। সেরেস্তায় বা খাজনা আদায়ের নির্ধারিত অফিস ঘরে নায়েব-তহসিলদাররা খাজনা রেখে রসিদ দিতেন। জমিদারি গৃহ সাজানো হত, গান-বাজনা হত, যাত্রা নাটক হত, বড়ো জমিদাররা পুণ্যাহতে বাইজি নাচের আয়োজন করতেন। আনন্দ ছিল, আপ্যায়ন ছিল, লোক সমাগমও ছিল প্রচুর। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল বকেয়া ও হালনাগাদ খাজনা আদায়। সেই আনন্দ ও আপ্যায়নের মধ্যেই সেরেস্তা ঘর ভারি হয়ে উঠত দরিদ্র কৃষকের লাঞ্ছনায়, খাজনা দিতে না পারার অপরাধে। (করুণাময়, ২০০১ : ৬৮)

এই আনুষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গে সমীররঞ্জন শীল (২০০১ : ১৯০) যোগ করেন, পুণ্যাহতে জমিদারকে একটি রুপার কাঁচা টাকা দেয়ার বিনিময়ে মিলত একজোড়া ছানা সন্দেশ। প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থানীয় লাঠিয়ালদের লাঠি খেলা দেখানো হত। তাদের ঢাল, সড়কি ও লাঠির সঙ্গে ছিল আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গি ও বজ্রকণ্ঠের হাঁক-ডাক।

জমিদারি প্রথা যতদিন চালু ছিল ততদিন বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ পুণ্যাহ হিসেবে পালিত হত। জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আনুষ্ঠানিকতা বিলোপ হলেও, এর কিছু রেষ রয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০১ : ৬২)। যার নিদর্শন, এখনও পহেলা বৈশাখ থেকে সরকারি জমিজমার ইজারা পত্তন শুরুর বিষয়টি।

প্রচীন বাংলায় পুণ্যাহ ছিল প্রজা কর্তৃক জমিদারকে আনুগত্য, নিয়মানুবর্তীতা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যম। সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থায় এই আয়োজন কার্যকর ছিল সর্বতোভাবে।

হালখাতা

অতীতে বাংলা বছরের প্রথম দিন হিন্দু ব্যবসায়ীরা লেনদেনের জন্য পুরোনো খাতা পরিবর্তন করে নতুন খাতা খুলতেন, যেটা হালখাতা নামে পরিচিত ছিল।

হালখাতা অবশ্য এখনও অটুট উল্লেখ করে মুনতাসীর মামুন (১৯৯৪ : ৯৬) লিখেছেন, প্রধানত ব্যবসায়ী মহল এটি পালন করে। নববর্ষের দিন, ব্যবসায়ীরা পুরনো বছরের হিসাব-নিকাশ সারে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে লাল কাপড়ের মলাটের এক বিশেষ খাতা ব্যবহার করে, যাকে খেরো খাতা বলা হয়। সেদিন দোকানে কেউ গেলেই মিষ্টি খাওয়ানো হয়। শুধু তাই নয়, ঢাকা শহরের অনেক মধ্যবিত্ত আজকাল নববর্ষ উপলক্ষে মিষ্টি কেনেন, ভালো খাবারের আয়োজন করেন।

দোকানদার-মহাজনদের বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে হালখাতা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, খরিদদারদের কাছ থেকে প্রাপ্তি উসুল করে মিষ্টিমুখ করানো। স্বার্থবুদ্ধির আড়ালে এই আনুষ্ঠানিকতা পাওনা আদায়ের নামান্তর – এমন অভিমত ব্যাক্ত করে করুণাময় গোস্বামী (২০০১ : ৬৯) বলেন, জমিদারদের পুণ্যাহ বা দোকানদারদের হালখাতা যে নামেই নামকরণ হোক, উভয়েরই লক্ষ ছিল বকেয়া উসুল করা।

অনেকে মনে করেন নতুন বছরের প্রথম দিনটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উৎসবের দিন। এমন ধারণার বিরোধীতা করে সৈয়দ আলী আহসান (২০০১ : ৩০-৩১) বলেন, এক সময় হিন্দু-মুসলিম উভয় জমিদাররাই বাংলা শাসন করেছেন। হিন্দু জমিদারদের সংখ্যাধিক্য থাকায়, তাঁরা ঘটা করে নববর্ষ পালন করতেন। যদিও এই আনুষ্ঠানিকতার সাথে সনাতন ধর্ম বা সেই অনুসারী লোকদের সামাজিক ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। উনিশ শতক থেকে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত যে কোনো লেনদেন, ব্যবসা এবং নানা প্রকার আড়তদারিতে হিন্দুদের অধিকার ছিল একচেটিয়া। তাই নববর্ষ উদযাপনের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের চেয়ে তাদের তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়।

বাংলা বছরের প্রথম দিন হিন্দু ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলার যে রীতি প্রচলিত ছিল, এখন ঐতিহ্য হিসেবে সে রীতি পালন করছেন মুসলমান ব্যবসায়ীরাও। এদিন ব্যবসায়ী মহলে বন্ধুদের আপ্যায়ণ করানোর রেওয়াজ বরাবরের মতোই প্রচলিত আছে। বর্তমানে ঢাকার চকবাজার, ইসলামপুর, বাদামতলী বা চুড়িহাট্টা মহল্লায় মুসলমান ব্যবসায়ীরা সেই নিয়ম ধরে রেখেছেন।

নববর্ষের আয়োজন যে শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝেই নয়, তৎকালীন মুসলমানদের আনুষ্ঠানিকতায়ও ছিল, এর স্বপক্ষে বলেছেন ওবায়দুল হক সরকারও। তিনি বলেন, ৩০ চৈত্র বাড়ির বাইরের কাছারি ঘর সাজাতে হত। রঙিন কাগজ কেটে লাগানো হত, কলাগাছ দিয়ে গেট সাজানো হত। গদি লাগানো হত খাটে। উপরে চাদোয়া টাঙাত। সেখানে পয়লা বৈশাখ ভোরে রূপার একটা বাক্স বসানো হত। সেই বাক্সে

হাল খাতার টাকা পয়সা জমা হত তিন দিনব্যাপী। হালখাতা শুরুর আগে মিলাদ মাহফিল হত। ভোরে মসজিদে বিশেষ দোয়া চাওয়া হত। (ওবায়দুল, ২০০১ : ৪৩-৪৪)

তবে, পহেলা বৈশাখের সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ ও উদ্‌যাপর রীতি কোনো ধর্মীয় চেতনাকে বিঘ্নিত করেনি। সমীররঞ্জন শীল বলেন; হালখাতার নিমন্ত্রণ পত্রে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ' যেমন লেখা থাকত তেমনি থাকত 'হাবিব সহায়'। ধর্মকে যারা এর সঙ্গে যুক্ত করেছে তারা তাদের হালখাতাসহ দৈনন্দিন জীবনের অনুষ্ঠানমালা অক্ষুন্ন রেখেও মেলার অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। (সমীর, ২০০১ : ১৯১)

মূলত, সর্বজনীন নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে হালখাতায় বাঙালির সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক এবং স্বাজাত্যবোধের মহান চেতনা প্রতীয়মান হয়।

নববর্ষের আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখ্য চাঁটগা শহরের জব্বারের বলী খেলা বা কুস্তি এমন তথ্য উল্লেখ করে মুনতাসীর মামুন (১৯৯৪ : ৯৭) জানাচ্ছেন, চাঁটগা শহরে এটি এখনও প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। রাজশাহীর গম্ভীরাও এমনি একটি অনুষ্ঠান। আরও প্রচলিত ছিল ঢাকার মুন্সীগঞ্জে গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা।

চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখী মেলা

নতুন বছরকে বরণ করার জন্য গ্রামের মানুষের একটি প্রাচীন এবং আকর্ষণীয় আনন্দ উৎসব – বৈশাখী মেলা। মধ্যরাত্রির উন্মাদনার মধ্য দিয়ে নয়, সূর্যোদয় লগ্নে, প্রভাতের স্নিগ্ধতায় শুরু বাঙালির নতুন বছর পহেলা বৈশাখ – এ কথার সাথে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০০১ : ৯১-৯২) আরও যোগ করেন, চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ছিল সেই বর্ষবিদায়ের স্মারক।

নববর্ষের মৌলিক সত্তার প্রকাশ ঘটে বৈশাখী মেলার আয়োজনে। মেলার মূল আকর্ষণ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। এখানে ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায়, পেশা নির্বিশেষে মানুষের ঢল নামে।

বৈশাখ এবং পহেলা বৈশাখের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান মেলা। এক হিসাবে জানা যায়, সারা বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখে এবং বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে প্রায় দুশো মেলা অনুষ্ঠিত হয় (মুনতাসীর, ১৯৯৪ : ৯৭)। আমাদের দেশের 'নববর্ষের' মেলাগুলোও এদেশের প্রাচীনতম 'আর্তব উৎসব' ও 'কৃষ্যৎসব' প্রভৃতির বিবর্তিত রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়, এমন কথা বলেছেন মুনতাসীর মামুন (১৯৯৪ : ৯৭)। বৈশাখী মেলার একটি বৈশিষ্ট্য : অন্যান্য মেলায় ধর্মের উপাদান প্রবেশ করলেও বাংলাদেশের মেলায় তা হয়নি। এখনও তা কুটিরজাত পণ্যাদির বেচাকেনার মেলা। ঢাকা শহরের বা শহরাঞ্চলে আয়োজিত মেলায় মাটির ও কুটিরজাত

পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থমেলারও আয়োজন করা হয়। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠান নববর্ষের শুভেচ্ছা হিসেবে মক্কেলদের উপহার হিসেবে প্রেরণ করে বই।

গ্রামবাংলায় চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষের দিনে বটগাছের নিচে, নদীর পাড়ে বা খোলা মাঠে মেলা বসত বলে উল্লেখ করেন আ. ন. ম. নুরুল হক (২০০১ : ১২২)। সববয়সী মানুষের জন্যই দারুণ আকর্ষণীয় এ মেলায় বিক্রি হত ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খাবার মুড়কি, খই-বাতাসা, কদমা-মুরালি। চিনি দিয়ে ছাঁচে তৈরি হত নকশাদার মিঠাই, শিশুদের জন্য ছুতোরের তৈরি কাঠের খেলাঘর। মেলার বাড়তি আকর্ষণ ছিল নাগরদোলা; যা ছাড়া মেলার রূপই খুলত না, বলে উল্লেখ করেন তিনি।

পহেলা বৈশাখে মূলত চৈত্র সংক্রান্তির মেলার জাঁকজমকটা ছিল পুরনো ঢাকাতেই। কাইয়ুম চৌধুরী (২০০১ : ৩১২) তাঁর স্মৃতি বর্ণনায় যুক্ত করেন, রমনার রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় হত এবং ঘুড়ি ওড়ানোটা তখন একটা সামাজিক উৎসব ছিল। পহেলা বৈশাখে কদমা, নুকুলদানা, বাঁশি, ঢোল ইত্যাদি জিনিস তরুণদের আকৃষ্ট করত।

সেকালে নববর্ষ উপলক্ষে আকর্ষণীয় খেলাধুলার মধ্যে ঘোড়দৌড় ছাড়াও ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, কুস্তি, লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, নৌকাবাইচ আরও অনেক রকম খেলাধুলার উল্লেখ পাওয়া যায়। গরুর দৌড় প্রতিযোগিতাও হত। এর পাশাপাশি কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকক্রিয়ার প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ করেন আ. ন. ম. নুরুল হক :

> জোয়ালে একজোড়া করে গরু বেঁধে তার পিছনে মই বেঁধে দেয়া হত। মইয়ের উপর বসতেন গরুর মালিক। পুরনো ঢাকায় হত পায়রা উড়ানো প্রতিযোগিতা। গিরিবাজ পায়রাদের উড়াউড়ির প্রতিযোগিতা দেখার জন্য লোকজনের ভিড় জমে যেত। নববর্ষে অনেক স্থানেই ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা হত। চৈত্রসংক্রান্তির রাতে পাট কাঠিতে আগুন জ্বেলে কিশোর ও তরুণেরা গ্রাম প্রদক্ষিণ করতো, যাতে নতুন বছরে গ্রামটিতে কোনো রোগবালাই না থাকে। (নুরুল, ২০০১ : ১২২)

চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ও গ্রামের মেলা – পহেলা বৈশাখের বৈচিত্রপূর্ণ দুটি আকর্ষণীয় দিক বলে উল্লেখ করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০১ : ৩১৫-৩১৬)। উভয় মেলাতেই যাদু প্রদর্শনী, গভীর রাতে যাত্রার আসর, কলের গান, চড়কি, ঘূর্ণির আনন্দ আয়োজনে ঘটনাহীন গ্রাম্যজীবন হয়ে উঠত ঘটনাবহুল – স্মৃতিচারণে এমনটাই জানান তিনি।

বৈশাখী মেলায় গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত সকল প্রকার কৃষিপণ্য, শিল্পপণ্য, কারুপণ্য, মৃত্তিকাপণ্য, বাঁশ-বেতের পণ্যের সমাহারের কথা উল্লেখ করেন ওবায়দুল হক সরকার (২০০১ : ৪৪)। শিশুদের মনোরঞ্জনে বাঁশি, পুতুল, মেয়েদের চুড়ি, আলতা, সৌখিন সাজের উপকরণ থেকে গৃহস্থালির নিত্য ব্যবহার্য অনুষঙ্গ মিলত

মেলায়। চিত্তবিনোদনের জন্য চড়ক, লটারি খেলার পাশাপাশি, খোলা মাঠে চালা তুলে হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে বসত গানের আসর বা কবির লড়াই। রাতভর উপোভোগ্য মেলা শেষ হত সপ্তাহান্তে।

মেলার আরেক আকর্ষণ ছিল গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রদর্শনী ও তার বেচাকেনা (আনিসুজ্জামান, ২০০১ : ৩১৫)। তালপাতা থেকে শুরু করে নকশা করা মাটির সরাই, সবকিছুর চাহিদা ছিল তুঙ্গে। যার কিছুটা প্রয়োজনে, কিছু সৌন্দর্যে-মনোরঞ্জনে।

মেলাকে কেন্দ্র করে পুতুল নাচ আর বাক্সের ভেতর সিনেমা দেখানো ছাড়াও বহুরূপীর প্রচলনের কথা উল্লেখ করেন সৈয়দ হাসান ইমাম (২০০১ : ৩১৭)। কখনো বাঘ সেজে, কখনো ভাল্লুক নেচে মেলাকে উপোভোগ্য করে তুলতো বহুরূপী।

বৈশাখী মেলার আয়োজনে তেমন নিয়মতান্ত্রিকতা বা ব্যবস্থাপনা কমিটির আয়োজন না থাকলেও, আবহমান বাংলার কুটির শিল্প এবং সংস্কৃতিকে লালন ও প্রকাশের জন্য মেলা এক অভূতপূর্ব সুযোগ বয়ে আনত শিল্পী-অংশগ্রহণকারী ও দর্শনার্থীদের জন্য – এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন শামসুল হুদা চৌধুরী (২০০১ : ১৬৪)। এগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দ মেলা, রাজশাহীর খেতুরের মেলা, চট্টগ্রামের জব্বার আলীর বলী খেলা এবং সীতাকুণ্ডের মেলার উল্লেখ করেন তিনি।

গ্রামের মেলাগুলোতে সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও বৈশাখী মেলার স্বকীয়তা একেবারে হারিয়ে যায়নি। যদিও, সময়ের সাথে মেলার পরিসর বেড়েছে, পরিবর্তন পরিবর্ধনে মেলার রূপের খানিকটা বিবর্তন ঘটেছে। তবে স্বীকার করতে হবে, বৈশাখী মেলার সাথে মিশে আছে মাটির যোগ। গ্রামবাংলার আদি ঐতিহ্য এই বৈশাখী মেলা এক বাৎসরিক আনন্দ উৎসব এবং প্রয়োজনের সামগ্রীর বিকিকিনি, ব্যবসায়ীক লেনদেন ও কৃষিভিত্তিক সমাজে পণ্য প্রবাহের ধারা বজায় রাখার বার্ষিক মিলন মেলা।

বর্ষবরণ

১৯৬৫ সাল থেকে ছায়ানট রমনার বটমূলে আয়োজন করে আসছে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। এমন তথ্য পাওয়া যায় সরকার আবদুল মান্নানের (২০০৮ : ৩৪৩-৩৪৪) লেখায়। প্রভাতি আয়োজনের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতাগুলো যোগ করে তিনি লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনী গান 'এসো হে বৈশাখ এসো, এসো,' পরিবেশনের মাধ্যমে সূর্যোদয়ের সময় বর্ষবরণ করে ছায়ানট। আইয়ুব সরকারের আমলে রবীন্দ্রসংগীত ও বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার বিরোধিতার প্রতিবাদস্বরূপ ছায়ানট বৈশাখের প্রথম দিনে যে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখান থেকেই শুরু হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক চারিত্র্য লাভ। স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের

> মাধ্যমে যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ফলে অনিবার্যভাবেই বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায়, বাঙালি সংস্কৃতির মহিমা ও মাধুর্য বিকাশে এবং এর অনন্য সৌন্দর্য ঊর্ধ্বে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। এখন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অবিতর্কিত ও অনিবার্য এক জাতীয় উৎসবের নাম। (আবদুল মান্নান, ২০০৮ : ৩৪৩-৩৪৪)

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসবের সার্থকতা এখানেই যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে অন্য ধর্মের মানুষেরা অতিথির মতো আসে। এখানে সারা বাঙালির কেউ অতিথি থাকে না। (হাসান, ২০০১ : ৩১৬)

আধুনিক বাঙালি নাগরিক সমাজে পহেলা বৈশাখকে উৎসবে পরিণত করার কৃতিত্ব অনেকটাই ছায়ানটের। বাঙালি নিজের সত্তাকে খুঁজে ফেরে এই বাঁধভাঙার উৎসবে। ছোটো ছোটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, এখন বিরাট এক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠেছে পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতি অনুষ্ঠান।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

নববর্ষের বর্ণিল নানা আনুষ্ঠানিকতায়, পহেলা বৈশাখের আরেক অনুষঙ্গ – চারুকলা অনুষদ আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা। মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য (সাক্ষাৎকার নং ৫) থেকে জানা যায়, বৈশাখের অন্যতম আকর্ষণ মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিভিন্ন প্রতীককে বাহন করে সবার মঙ্গল কামনায় শুরু হয় যাত্রা। এতে অংশ নেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষক- শিক্ষার্থীরা এবং রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নানা বয়সী ও শ্রেণি-পেশার মানুষ। বিভিন্ন লোকজ ফর্মে সংগৃহীত নমুনা থেকে রঙিন মুখোশ, বিভিন্ন প্রাণির প্রতিলিপির মাঝে প্রধান হয়ে ওঠে রাজনৈতিক সহিংসতা থেকে মুক্তির আহ্বান। সমগ্র জাতির মঙ্গল কামনায় বর্ষবরণে লোকজ ধারার এই নাগরিক উপস্থাপন, বাঙালির বর্ষবরণের ঐতিহ্যবাহী এক আয়োজনে পরিণত হয়েছে।

ছাত্ররা মনে করেন, এটা একটা বিরাট ব্যাপার যে এদেশে প্রতিবছর এমন একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই উৎসব পালন করছে। নিজেদের তৈরি জিনিষ নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়া এবং অন্যকেও এর সাথে যুক্ত করার অনুভূতিটা আলাদা এক উদ্দীপনা তৈরি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিল্পীদের অক্লান্ত ও আনন্দিত পরিশ্রমে প্রতি বছর আয়োজিত হয় নয়ন-মনোহর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সরকার আবদুল মান্নান (২০০৮ : ৩৪৩) লিখেছেন, সেই শোভাযাত্রার মধ্যে ধরা দেয় বাঙালি জীবনের হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কার-সংস্কৃতি। সকল শ্রেণির মানুষ এই শোভাযাত্রাকে উপভোগ করে গভীর এক অর্থব্যঞ্জনায়। এছাড়া বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

কর্পোরেশন, নজরুল একাডেমি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, নজরুল ইন্সটিটিউটসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতিগত ঐতিহ্যের বিভিন্ন স্বরূপকে মূর্ত করে তোলে আর সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয় বিচিত্র প্রবন্ধ-নিবন্ধসমেত ক্রোড়পত্র। বর্তমানে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলনমাত্র নয় – রাজনৈতিক আন্দোলনও বটে।

'মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে একটি বার্তা দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তা হলো – অশুভকে তাড়িত করে এক শুভাগমন ঘটানো' – এই উদ্ধৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক চিত্রশিল্পী মনিরুজ্জামানের বয়ানে। (বিবিসি বাংলা, ১৩ এপ্রিল ২০১৭)

বাঙালির ঐতিহ্য থেকে উপাদান নিয়ে, দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় শিল্পী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা। ইউনেস্কো স্বীকৃতির পর মঙ্গল শোভাযাত্রা ব্যাপকভাবে পালনের তাগিদ ও প্রত্যাশা থাকলেও, অনুষ্ঠানটির ধরণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক – এরকম মত দিয়ে বাধ সাধে কিছু ধর্মভিত্তিক সংগঠন – এমনটাও উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে।

সর্বজনীন উৎসবে ধর্মীয় অনুভূতি প্রসঙ্গে শফি আহমেদের (২০০১ : ২১৮) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'পয়লা বৈশাখের নানা ইউনিফর্ম-পরা শত্রু আছে, ঐক্যবদ্ধ জাতি যাদের কাম্য নয়। এই ঐক্য যে ধর্মকে, বিভেদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অথচ বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারলে একুশ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয়দীপ্ত ডিসেম্বর সবই নববর্ষের চেতনার দিকেই বহমান হবে, বিভেদ না থাকলে দেশ বিক্রির, সংস্কৃতি-যুদ্ধের বাজারও নষ্ট হয়ে যাবে।'

সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন, এছাড়াও,এক সময় বৃষ্টি-প্রার্থনাও ছিল বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের বিশেষ অংশ। কেননা কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে বৃষ্টির জলই ছিল চাষাবাদের একমাত্র প্রকৃতিগত সেচ ব্যবস্থা। চৈত্র মাসে যতই বৃষ্টি হোক না কেন কৃষক জমিতে লাঙল দিত বৈশাখে। তাই বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা সেও ছিল বৈাখের শুরুতে নববর্ষে। এখন কৃষিতে বেশ কিছু বিজ্ঞানসম্মত চাষবাসের বিষয় আসায় বৃষ্টির প্রতি নির্ভরতা কিছুটা কমেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনে এখনো নববর্ষ উদযাপনের সঙ্গে প্রথাগত বৃষ্টি প্রত্যাশার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। (মান্নান, ২০০৮ : ৩৪০)

আনুষঙ্গিকতায় ঐতিহ্যের নববর্ষ

বাঙালির নববর্ষ উদ্‌যাপনে বিষয় হিসেবে বরাবরই এসেছে লোকজ সংস্কৃতি। যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও গৌরব। তবে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, পহেলা বৈশাখ আধুনিক সময়ের সৃষ্টি – উনিশ শতকে এই উৎসব নাগরিকতা পেয়েছে। তাঁর মতে, নাগরিকতা পেলেও

জাতে ওঠেনি। কেননা, তখন কলিকাতা শহরে ইংরেজদের খুব দাপট ছিল। ইংরেজদের দেখাদেখি সামাজিক কৌলিন্যের দাবিদার হিন্দুরা ইংরেজি নববর্ষ পালনে বিপুলভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। (আলী আহসান, ২০০১ : ৩১)

চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে শুরু হত নতুন বছরকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি। সে সময়ের নানা আয়োজনের উল্লেখ পাওয়া যায়, নুরুল হকের লেখায় :

> গাঁয়ের বউঝিরা লেপে মুছে পরিস্কার করতো ঘরদোর। নববর্ষের দিন আটপৌরে জামাকাপড় ছেড়ে সবাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরতো। বাড়ির গরু বাছুরকেও গোসল করানো হত সেদিন। নববর্ষের দিন কেউ কারো সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি করতো না। সবাই ভাবতো বছরের প্রথম দিনটা ভালো গেলে সারা বৎসরটাই তাদের ভালো যাবে। (নুরুল, ২০০১ : ১২১)

জমিদার বাড়িতে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের স্মৃতিচারণ করে সৈয়দ আলী আহসান ফিরে যান তাঁর শৈশবে : 'আমাদের গ্রামের বাড়িতে পহেলা বৈশাখ যখন আসত তখন আমরা ঠিক পেতাম আমাদের জমিদারির নায়েব নিশিকান্ত চক্রবর্তীর সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং আচরণের মধ্য দিয়ে। তিনি আমাদের কাচারি ঘর নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন। প্রবেশ পথের চৌকাঠে পানি ছিটাতেন এবং ধুপের পাত্র হাতে নিয়ে ঘরে ধুপের ধোঁয়া দিতেন। খেরো খাতা বদলাতেন এবং সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করতেন। ...প্রজারা নববর্ষের দিনে বাড়ির ভেতরে যাবার অনুমতি পেত এবং উঠোনে যে শীতল পাটি বিছানো থাকতো সেখানে জমিদারকে দেয় দ্রব্যাদি রাখত। ... তারা পাটির ওপর রূপোর টাকা রাখতো' (আলী আহসান, ২০০১ : ৩১)। তৎকালীন সমাজজীবনে এই উৎসবের সঙ্গে অর্থনৈতিক একটা সম্পর্ক ছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

পূরবী বসু তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'মনে পড়ে ছোট বেলায় চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে কী ঘটা করে উৎসব চলত! পুরনো বছরের সমস্ত আবর্জনা দূর করার জন্যে সেদিন গ্রামের ঘরে ঘরে, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর বাড়িঘর হাঁড়িপাতিল কাপড়জামা ধোয়ার ধুম পড়ে যেত। ব্যবহৃত সব মাটির হাঁড়িপাতিল ফেলে দেয়া হত সেদিন। প্রতিটি ঘর ঝাড়মোছ করে ঝুল ঝেড়ে, বিছানা চাদর কাপড় জামা সব সাবান সোডা দিয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকোতে হত। লেপ তোষক কাঁথাও সূর্যসেঁকা করতে হত। মাটির ঘর হলে ভালো করে মেঝে, রোয়াক ও উঠোন লেপে নিতে হত। সেদিন বাড়ির মেয়েরা ঘরবাড়ি পরিষ্কারে এতটা ব্যস্ত থাকতো যে রান্না হত খুব সংক্ষিপ্ত। দিনের বেলা বেশিরভাগ বাড়িতে দই, চিড়া, মুড়ি খেয়েই কাটত। রাতে নিরামিষ, বিশেষ করে তেতো ডাল, টক ডাল রান্না হত। সেদিন স্নানের আগে দু'পায়ের ভেতর দিয়ে পেছন দিকে ছাতু ছিটিয়ে প্রতীকী শত্রু নিধন হত অর্থাৎ শত্রুর মুখে ছাই দেয়া হত।' (পূরবী, ২০০১ : ২৩৩)

তবে অতীতের নববর্ষ উদ্‌যাপন, এর সর্বজনীন আনন্দ-আয়োজন আর ঐতিহ্য ঘিরে কতটা সমৃদ্ধ ছিল, সেই প্রশ্ন ছাপিয়ে, বর্তমান নববর্ষ উদ্‌যাপনকে সময়ের সাথে কতটা অর্থবহ করে তোলা যায়, সে লক্ষেই অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন সমাজবিজ্ঞানী এবং ইতিহসিবিদগণ।

মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে জীবনকে যাপন যোগ্য করার জন্য নতুনত্ব অপরিহার্য। তাই নববর্ষের গুরুত্ব অপরিসীম উল্লেখ করে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (২০০১ : ১০১-১০২) বলেন, জীবনের গ্লানি, পরাজয় আঘাত প্রতিহত করার মাধ্যমে মানুষ নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। এজন্য নববর্ষের সূচনা বলে একটি ক্ষণকে শনাক্ত করা হয়। যার মর্মমূলে আছে অর্জনের প্রণোদনা।

বাংলাদেশে উৎসব বা ধর্মীয় উৎসবের মাঝে 'বাংলা নববর্ষ' এই একটি উৎসবই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একে অন্যের উৎসবে অংশ নিলেও, তা সর্বব্যাপী নয়। এই একটি উৎসব বাঙালি তুলে রেখেছে সবার জন্য, এমন মন্তব্য করে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে প্রধান ধর্মীয় উৎসবের কমতি নেই। কিন্তু সেগুলো সঙ্গত কারণেই সর্বজনীন নয় বিধায় ধর্মীয় উৎসবগুলোতে সংকীর্ণতার স্পর্শ লেগে থাকে। এমনকি হিন্দু জমিদারদের শাসনামলে হিন্দু ধর্মের অনেক উৎসবেও গোত্র, শ্রেণি,বর্ণ নির্বিশেষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণ উন্মুক্ত ছিল না। শুধু বাংলা নববর্ষ ছিল এর ব্যতিক্রম। (মনজুরুল, ২০০১ : ৬৫)

বাংলাদেশের মানুষ নববর্ষকে কেন্দ্র করে তাদের সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও রাজনৈতিক পরিচয়গুলি সংহত করেছে – আদায় করে নিয়েছে বিশ্বের চোখে তার জাতিসত্তাগত স্বাতন্ত্র্য। এটি সম্ভব হওয়ার কারণ হিসেবে মনজুরুল ইসলাম মনে করেন (২০০১ : ৬৭), যখন কিছু অঞ্চলভিত্তিক প্রথা ও আচার সর্বদৈশিক একটি কর্মকাণ্ডে পরিণত হল, সে হিসেব রাখা কষ্টকর হলেও বোঝা যায়, বাঙালির নববর্ষ তার জাতিসত্তাগত স্বাতন্ত্র্য এবং অখণ্ডতা উদযাপনের উৎসব। তবে শিক্ষার অভাব দেশের দরিদ্রতার জন্য দায়ী, যদিও সাংস্কৃতিক রুচি ও প্রজ্ঞার অভাব বাঙালির কখনই ছিল না। এর বলেই ঐক্য, দিক নির্দেশনা আর মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েছে বাঙালি।

পহেলা বৈশাখ আমাদের চিন্তা-চেতনার-আবেগের মধ্যে চিরকালের জন্য ধরা পড়েছে। সৈয়দ আলী আহসান (২০০১ : ৩১) বলেন, বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব পহেলা বৈশাখে উদযাপনের নানা আনুষ্ঠানিকতায় ধর্মীয় নিষ্ঠার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও হিন্দুদের হাতে থেকে তা যেমন হিন্দুদের অনুষ্ঠান হয়নি, তেমনি সময় পরিক্রমায় মুসলমানদের হাতে এসে এটা মুসলমানদের অনুষ্ঠান হয়ে যায়নি। এখানেই এর বিশেষত্ব।

নববর্ষের উৎসব ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উদযাপিত হয়। গ্রামে এ দিনটি কীভাবে উদ্‌যাপিত হয়, তা সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বর্ণনায় পাওয়া যায় :

> আমি দেখেছি, একজন কৃষকও দিনটিকে স্মরণে রাখে, এ দিনটিতে তার ঘরে সামান্য একটু বাড়তি খাবারের আয়োজন হয়। এই দিনে জামা-কাপড় কেনার বাধ্যবাধকতা নেই, যেমন ঈদে বা পূজোয় আছে, কাজেই কৃষকও থাকে ভারমুক্ত। (সৈয়দ মনজুরুল, ২০০১ : ২৫)

বাঙালি অন্তরে ধারণ করা, লালন করা এই বর্ষবরণ উৎসবে অংশগ্রহণে সম্প্রদায় বা ধর্মের ভিন্নতা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মৈত্রী-সম্প্রীতির উদার মিলন ক্ষেত্র এই উৎসবে আছে মাটি ও প্রকৃতির সম্পর্ক। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, বাংলা নববর্ষকে জাতীয় উৎসব হিসেবে পালনের মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখ আজ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের ভাষা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ দেশগুলোর পাশে, সবচেয়ে বড় সর্বজনীন উৎসব হিসেবে।

বর্ষামঙ্গল উৎসব

তপ্ত গ্রীষ্মের বিদায়ে বর্ষার বারিধারা সবার কাছেই মহা সমারোহের। বর্ষায় বাঙালির হৃদয় যেন সরস প্রকৃতির সাথে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মন হয় মেঘের সঙ্গী। নবীন বর্ষার একখণ্ড মেঘও কবির কল্পনায় প্রাণ সঞ্চার করে। মহাকবি কালিদাসের অনন্য সৃষ্টি *মেঘদূত* কাব্যে মেঘ হয়ে উঠেছে বিরহীর বার্তাবাহক, জীবন্ত দূত।

সিলেট অঞ্চলের কিংবদন্তী শিল্পী প্রয়াত বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের গানে আছে, 'বর্ষা যখন হইতো, গাজির গান আইতো, রঙে ঢঙে গাইতো, আনন্দ পাইতাম।' বর্ষায় প্রবল আনন্দে উৎসবে মেতে ওঠে বাঙালি। শুধু তাই নয়, বর্ষার সাথে মিশে আছে বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি এবং ইতিহাস।

নৌকাবাইচ

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস নিয়ে বর্ষার পুরোটা সময় জুড়ে নৌকা বাইচের আয়োজন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ভাটি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। নীরু শামসুন্নাহার (২০২০) উল্লেখ করেন, নৌকাবাইচ উৎসবে ভিন্ন ধরণের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নৌকার যেমন দেখা মেলে, তেমনি নৌকাগুলোকে রঙিন কাগজের সাহায্যে লোকশিল্পের নকশায় সজ্জিত করা হয়। বাইচের সওয়ারীদের চমকপ্রদ সাজসজ্জার সঙ্গে মূল গায়েনের রূপসজ্জাও আকর্ষণীয়। কাঁধে গেরুয়া উত্তরীয়, হাতে রুমাল ও পায়ে ঘুঙুর পরে নৌকার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে মূল গায়েন উৎসাহমূলক লোকগীতি গাইতে থাকেন। নৌকার গতি ত্বরান্বিত করতে এই সঙ্গীতকৌশল। এর সাথে নৌকার গতিতে তাল মিলিয়ে ছুটতে থাকে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু-কিশোরের দল।

প্রতি বর্ষায় সিলেটের সুরমা নদী এবং সুনামগঞ্জের কালনী নদীতে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখ করে ফয়সাল খলিলুর রহমান (২০১৬) লেখেন, সিলেট অঞ্চলে বাইচের জন্য ১৫০-২০০ ফুট লম্বা ও ৫-৬ ফুট

প্রন্থের সারেঙ্গী নৌকা ব্যবহার করা হয়। পানি থেকে ২-৩ ফুট উঁচু এ নৌকাগুলোর নামও বেশ আকর্ষণীয়; ঝড়ের পাখি, পঙ্খিরাজ, সাইমুন, তুফান মেল, ময়ূরপঙ্খি, অগ্রদূত, দীপরাজ, সোনার তরী ইত্যাদি। নৌকার বৈশিষ্ট্য : এর সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ হংসমুখী আকৃতির। নৌকাবাইচ শুরুর আগে, সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃতির কৃপা প্রার্থনা করে প্রতিযোগিরা এক সুরে গান ধরেন।

নকশিকাঁথা বুনন

গ্রামের নারীদের সৃজনশীলতা প্রকাশের একটা সুযোগ মেলে বর্ষাকালে। বর্ষার ঝুম বৃষ্টিতে ঘরবন্দী বধূরা নকশীকাঁথা বুনতেন। শামসুন্নাহার (২০২০) নিবন্ধে উল্লেখ করেন, 'ঘনঘোর বরিষায় সহজে ঘর থেকে বাইরে গিয়ে দৈনন্দিন কাজগুলো করা যায় না বলে ঘরের মা-মেয়েরা মিলে বর্ষায় সেলাই করবেন বলে সিঁকেয় তুলে রাখা গত বর্ষায় শুরু করা নকশিকাঁথা সেলাই করতে বসেন। এটিও সারা বাংলার ঘরে ঘরে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ রচনা করে। সেলাইয়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে পুরনো কাপড়ের পরতে পরতে উঠে আসতো জীবনের কথকতা।'

ধামাইল

সিলেট অঞ্চলে বেশির ভাগ বিয়ের অনুষ্ঠান হয় বর্ষাকালে। আর বিয়ে মানেই ধামাইল গান। লোকসংস্কৃতি গবেষক সুমন কুমার দাশের উদ্ধৃতি এবং ভারতের শিলচর-করিমগঞ্জ অঞ্চলের জনশ্রুতি তুলে ধরে ফয়সাল খলিলুর রহমান (২০১৬) লিখেছেন, দেশবিভাগের পূর্বে তৎকালীন সিলেট অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বর্ষাকালে অবসর সময়ে মহিলারা একত্র হয়ে গল্পগুজবে মশগুল হয়ে উঠতেন। এ মুহূর্তটাকে বলা হতো 'ধুম্বইল'। হাসিঠাট্টার চরম পর্যায়ে দেহভঙ্গিমা রূপ নিতো নৃত্যভঙ্গিমায়। এই ধুম্বইল থেকেই এসেছে ধামাইল। ফয়সাল (২০১৬) আরও উল্লেখ করেন,ধামাইল নাচের বিশেষত্ব হলো একটি বিশেষ সম্পর্কের ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নাচ পরিবেশিত হয়, তাই এ নাচে শ্যালিকা, বৌদি, দাদি-নানি সম্পর্কের মহিলারাই অংশ নেন। ঘরের ভেতরে, আঙিনায় বা সামান্য খোলা যায়গায় ১০-১৫ জন মহিলা মিলে এই গান পরিবেশন করেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধামাইল নাচ-গানের প্রচলন থালেও, সিলেট অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ে বিয়েতে আয়োজিত ধামাইল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ধামাইল আসরের পাশাপাশি থাকে কিসসা পালা, লোকনৃত্য, গাজীর গীত, সিমিস্যা গান, পুঁথি পাঠের আসর।

পালা পরিবেশন

বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত হয়। ভাটি অঞ্চলের পানিবন্দী মানুষেরা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে আয়োজন করে যাত্রা গানের। ফয়সাল খলিলুর রহমানের (২০১৬) লেখায় পাওয়া যায়, কয়েক গ্রামের মানুষ মিলে আয়োজিত যাত্রাপালায় পরিবেশিত হয় *সিরাজদ্দৌলা*, *সোহরাব রুস্তম*, *বেহুলা লক্ষ্মীন্দর*, *রূপবান* ইত্যাদি। যে গ্রামে পালার আয়োজন হয়, সেখানে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উৎসাহের সাথে পালা দেখতে আসেন অন্য গ্রামবাসী। নির্ঘুম কখনো আধোঘুম চোখে রাতভোর পালা উপোভোগ করেন শ্রোতা-দর্শক।

মনসার ভাসান

নীরু শামসুন্নাহার (২০২০) উল্লেখ করেন, বর্ষা উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ মনসার ভাসান। এখনো ভাটি অঞ্চলে কোনো কোনো কৃষক বাড়িতে মধ্যযুগের মনসা মঙ্গল কাব্যের চর্চা আছে। সেখানে রাতের বেলা বাড়ির আঙিনায় মনসার ভাসান নিয়ে গানের আসর বসে বর্ষাকালে। বাংলায় বর্ষাকালীন উৎসব-পরবের মধ্যে মনসাপূজা গুরুত্বপূর্ণ – এমন তথ্য পাওয়া যায় অতনু সিংহের (২০১৯) লেখাতেও।

রথযাত্রা

বর্ষাকালীন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব রথযাত্রা। অতনু সিংহ (২০১৯) বলেন, ঢাকার ধামরাই উপজেলায় অনেক আগে থেকে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাভার, পুরান ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, যশোরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রথযাত্রা এক বিরাট উৎসব।

বৃষ্টি নামানোর গান

বৃষ্টি নামানোর গান, ব্যাঙের বিয়ে দেয়ার মতো প্রকৃতি সম্পর্কিত মজার লোক-আয়োজন রয়েছে বর্ষার নানা পরবে; এমন মত অতনু সিংহের। রাজিউল ইসলাম (২০২১) 'বৃষ্টি নামাতে ব্যাঙ্গা ব্যাঙ্গির বিয়ে' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলেন, এই লোকাচারের বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা না থাকলেও, সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের মধ্যে এমন আয়োজন, বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

বর্ষার বিশেষ খাবার

বৃষ্টির দিনে বিশেষ কিছু খাবার, সময়কে করে তোলে উৎসবমুখর। মুখরোচক খাবার আয়োজন হিসেবে, শামসুন্নাহার (২০২০) যোগ করেন, সুগন্ধি চিনিগুঁড়া চালের ভুনাখিচুড়ির সাথে বর্ষার ইলিশের জুড়ি মেলা ভার। কলাপাতায় মোড়ানো পদ্মার ভাপা ইলিশ বা সরষে ইলিশ, কাঁচা তেঁতুলে রান্না করা বর্ষাকালীন মাছ চেলা বা পাবদার ঝোল, শেষ পাতে পায়েস কিংবা চন্দ্রপুলি পিঠার আয়োজন মেঘমেদুর বৃষ্টির দিনটিকে করে তোলে উপভোগ্য।

শরৎ উৎসব

শরতের স্নিগ্ধ পরিবেশ উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে বাঙালির ঘরে ঘরে। উৎসবের রঙ ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি ঘরে ঘরে। শরৎ মানেই শিশির সিক্ত প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য। শরৎ মানেই ভোরের আলোয় মিষ্টি শীতের হাতছানি। এই শরতেই আছে অভিমানী মেঘের ঘনঘটা। বিশাল আকাশের নীচে, দিগন্ত প্রসারিত কাশ বনে মন ছুটে যা মেঘের সাথে ভাবনাহীন। শরতে শেষ বিকেলের সূর্যটাও বিদায় নেয় গোধুলি আকাশ রাঙিয়ে।

শরৎকাল বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে (সাক্ষাৎকার ৬) বক্তারা বলেন, প্রত্যেকটা ঋতুর আলাদা আলাদা রং আছে। যদিও এই সময়ে ষড়ঋতুর আসল রূপটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপরও সেই রূপ যেন বাংলার রূপ। শরৎকালে প্রতীক্ষায় থাকেন সবাই। কারণ, শরৎকালে চারপাশ যেমন সুন্দর তেমনি চমৎকার আবহাওয়া চারপাশে। এ সময়টা না শীত, না গরম। তাই উৎসব আয়োজনের জন্য এই সময়টাই উপযুক্ত সর্বতোভাবে। এই সময়টাতেই শুরু হয় শারদীয় দুর্গাপূজা।

এছাড়াও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পকলা একাডেমি, ছায়ানটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় শরৎ উৎসব। যেখানে নাচ, গান, আবৃত্তি, পাঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে সময়টা হয়ে ওঠে উপোভোগ্য।

শারদীয় উৎসব : দুর্গাপূজা

ঢাকের বাদ্য আর প্রতিমা গড়ার মধ্য দিয়ে বাঙালি সভ্যতার ইতিহাস-ঐতিহ্য মিশে আছে দুর্গাপূজার সাথে। সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন, দুর্গাপূজা প্রচীন অনুষ্ঠানগুলোর একটি। বিভিন্ন অঞ্চলের আচার-রীতি, উদযাপন প্রথা এর সাথে মিশে শারদীয় দুর্গোৎসব বহুবর্ণিল এক ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হলেও, এর আকর্ষণ ছুঁয়ে যায় সব সম্প্রদায়ের মানুষকে। প্রাচীনকালে দুর্গাপূজার প্রকৃতি ও রূপ ভিন্ন থাকলেও বর্তমানে ভোগ, থিয়েটার,

ঢপ, সংকীর্তন, যাত্রায় তা প্রবল উৎসবে পরিণত এক আয়োজন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিন দুর্গাপূজা; বিজয়া দশমীতে বিসর্জন।

মুনতাসীর মামুন লিখেছেন :

> আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে দুর্গার বড় মেয়ে লক্ষ্মীর পূজা। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে দুর্গার পুত্র কার্তিকের পূজা। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দুর্গার ছোট মেয়ে সরস্বতীর পূজা। আশ্বিনে দুর্গাপূজা দিয়ে যার শুরু, মাঘে সরস্বতি পূজা দিয়েই তার শেষ। (মুনতাসীর, ১৯৯৪ : ৮৩)

শরতের ফসল তোলার সময় আরাধনা করা হতো মা দুর্গার। সেই থেকেই তিনি মিশে আছেন ফসল, মাটি, উর্বরতা আর আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে।

নবান্ন উৎসব

নিস্তরঙ্গ গাঁয়ের কৃষিজীবী সমাজ প্রাণ-কোলাহলে মুখর ওঠে নবান্ন উৎসবে। এই উৎসব বছরব্যাপী ধানের জন্য হাহাকার মোচনের উৎসব। সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষ প্রকৃতির কাছেই পেয়েছে ক্ষুধা মেটানোর উপকরণ। কৃষি-পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে কষ্টার্জিত শস্য ছিল কৃষিজীবী মানুষের অভাব মোচনের উৎস। নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলকে ঘটা করে বরণ করতে আয়োজিত শস্যোৎসবই নবান্ন উৎসব। মানবসভ্যতার খাদ্য-আহরণের ইতিহাস কখনো অরণ্য থেকে সংগ্রহভিত্তিক, কখনো শিকারভিত্তিক। কষ্টার্জিত এই খাবারকে সে দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করত। তাই সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী মানুষ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রথম সেই খাবার নিবেদন করেছে খাদ্যদাতা অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে বীজবপন থেকে ফসল ফলানো এবং ফসল কেটে ঘরে তোলা, কৃষিপদ্ধতির পরিণত এই আয়োজন হয়ে উঠেছে নবান্ন উৎসব। তাই 'নবান্ন' ফসল প্রাপ্তির উৎসব। এই উৎসব স্বতন্ত্র্য উৎবের গণ্ডি ছাপিয়ে বছরব্যাপী ব্রতপার্বণের পরিণতি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিশীলিত রূপ বলে মনে করেন মাধুরী সরকার (২০১৪ : ৭৫-৭৬)।

'গ্রামবাংলার সর্বত্র নতুন ধান ওঠার পরই আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। পরিশ্রমের ফল লাভ, সাফল্যের আনন্দ, অন্যদিকে অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা, রক্ষাকবচের অধিকারী হওয়া এই দ্বিবিধ কারণ সজ্জাত উৎসব হলো 'নবান্ন'; উল্লেখ করে বরুণকুমার চক্রবর্তী (২০১৪ :৩৩) লিখেছেন, শুভ দিনে, পবিত্র দিনে নতুন সংগৃহীত ধান থেকে প্রস্তুত ধান প্রথম ব্যবহার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যে উৎসব তাই নবান্ন। দীনেন্দ্রকুমার রায় (২০১৪ : ৫) নবান্নকে 'বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতেই অগ্রহায়ণের একটি আনন্দপূর্ণ মঙ্গলসূচক গার্হস্থ্য উৎসব' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সভ্যতার বিকাশে নবান্ন উৎসব 'ফসল উৎপাদন ও একে খাদ্যরূপে গ্রহণের আনন্দোৎসব' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন ফরাসি নৃবিজ্ঞানী লেভিস্ট্রস। তাঁর এমন উক্তিকে সমর্থন করে শামসুজ্জামান খান লিখেছেন :

> অনেকে বলেন, নবান্ন রন্ধনের উৎসব। রন্ধনকলা কোনো জাতির সাংস্কৃতিক ঋদ্ধির পরিচায়ক। তাই নবান্নকে ফসল উৎপাদনের সংস্কৃতি থেকে রন্ধনকলায় বিকশিত করার একটা প্রক্রিয়া হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। ...নবান্ন বাঙালি কৃষকের খাদ্যোৎসব। হতদরিদ্র কৃষকের জীবনে সমবেত উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবার দিন। (শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ৫৯)

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রদ্যোত কুমার মাইতি (২০১৪ : ৪৩) নবান্নর দিনটিকে পল্লিবাঙালির জীবনে বড় আকাঙ্ক্ষিত 'পুণ্যের দিন' এবং 'ঐক্যবহ' বলে উল্লেখ করেন। এই অর্থে যে, বাঙালির প্রধান কৃষিদ্রব্য ধানের বীজ বপন থেকে ফসল তোলা এবং ধানের চাল রন্ধনপূর্ব পর্যন্ত নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে বাঙালি। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় এই লোকাচারে বৈচিত্র্য থাকলেও সার্বিকভাবে এর মধ্যে ঐক্যের দিকটিই মুখ্য।

সৌমিত্র শেখর (২০১৪ : ১০২) নবান্ন উৎসবকে 'শস্যোৎসব' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং একে 'ধান্যোৎসব' হিসেবে বিশেষায়িত করে বলেন, বাঙালির ঘরে নতুন ধান ওঠার পর সেই ধানের খাদ্য গ্রহণ করার জন্য যে আনন্দঘন আচার-আয়োজন, সেটাই নবান্ন। তিনি যোগ করেন, বাঙালির ঘরে নতুন ধান উঠত একাধিকবার। কিন্তু বছরের সূচনা-ধানেই উৎসব হতো নবান্নের।

নবান্ন উৎসবের এই আনন্দমুখরতায় যেমন মিশে থাকে ভালো লাগা, তেমনি আকুলতা থাকে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে হওয়া এই উৎসবকে সামর্থ অনুযায়ী উদযাপন করার। অনেক অভাবের মাঝেও বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উৎসব আয়োজন বছরজুড়ে ক্ষুধার অন্ন যোগানোর এক ঐতিহাসিক মহোৎসব।

ধান কাটার উৎসব

লোকায়ত বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজে কার্তিক মাসের আগমন মানেই অবসরহীন দিনলিপি। ধানকাটার এই মৌসুমে বদলে যেত গ্রামবাসীর দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ। বর্ষার আগাছা জন্মানো পরিত্যাক্ত খামার বাড়ি, ঘরদোর, উঠান আর ঢেঁকিশালের চারপাশ গোবর-মাটিতে লেপে প্রস্তুত করা, কাস্তে-ধামা-কুলা পরিচ্ছন্ন করে রাখার ব্যস্ততা ছিল গৃহস্থ বাড়িগুলোর সহজাত দৃশ্য। তারপর ফসল কেটে আনার জন্য একটি শুভ দিনের অপেক্ষা। তিতাশ চৌধুরী লিখেছেন :

> এদিনে কৃষক কেবল একগুচ্ছ পাকা ধান কেটে মাথায় করে বাড়ি নিয়ে আসে। ...ধান কেটে ঘরে ফেরার সময় কারো সাথে কথা বলাও নিষিদ্ধ। এইদিন পাড়া-প্রতিবেশী কাউকে কিছু দেয়ারও নিয়ম নেই এবং এসবই সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। এই একগুচ্ছ ধান ঘরে এনে কৃষক তা পালার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। এটাই বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের নিয়ম। কোনো কোনো এলাকায় ফসল কাটার আগে

> বিজোড় সংখ্যক ধানে ছড়া কেটে নিয়ে ঘরের চালে বেঁধে রাখা হয়। বাকি অংশ চাল করে নতুন চালের পায়েস রান্না করা হয়। নতুন চালের এই পায়েসকেই নবান্ন বলা হয়। (তিতাশ, ২০১৪ : ৪৯)

তিতাশ চৌধুরী আরও জানান (২০১৪ : ৫০-৫১) দেশের অনেক অঞ্চলেই হেমন্তের ফসল কাটার শেষ দিন থেকে শুরু করে গোলায় ধান-ওঠানো পর্যন্ত আঙিনায় সার্বক্ষণিক একটি বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। এর সঙ্গে কিছু সুপারি ও ধান-দূর্বাও থাকে। 'ধান-ওঠা' নামক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই কৃষকের ছোট ছোট আঙিনা-গৃহ এবং গোলা সোনার ধানে ভরে ওঠে।

তবে ধানের গুচ্ছ বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখার এই নিয়মগুলো লোকসংস্কার, যার সাথে নবান্নের কোনো সম্পর্ক নেই; উল্লেখ করে সৌমিত্র শেখর (২০১৪ : ১০৬) বলেন, মূলত অবস্থাসম্পন্ন কৃষকেরা এই সংস্কার পালন করেন। কিন্তু নবান্ন উৎসবে সামিল হয় সব শ্রেণি পেশার মানুষ।

মাঠের ধান কেটে নেয়ার পর পরিত্যাক্ত জমিতে পড়ে থাকা ধানের ছড়া কুড়িয়ে নিত পাড়ার মেয়েরা। কখনো ইঁদুরের গর্তে হানা দিয়েও তারা কুড়িয়ে আনত পাকা ধানের ছড়া। কুড়ানো এই ধান শুরু করে বিনিময় যুগের। এ প্রসঙ্গে তিতাশ চৌধুরী লিখেছেন :

> ভিনগাঁ থেকে ফেরিঅলা আসে, মুড়িঅলা আসে, পাতিলঅলা আসে, কখনো মাছঅলা আসে। আর এসব ধানের বিনিময়েই কেউ মুড়কি মুড়ি, কেউ রান্নার জন্যে নতুন হাঁড়ি-পাতিল, কেউ এটা সেটা, আবার কেউ ধানের বিনিময়ে মাছ রাখে। এ সিস্টেম আবহমানকাল থেকেই বোধহয় গ্রামীণ কৃষক সমাজে প্রচলিত আছে – যাকে আমরা এ যুগে বার্টার সিস্টেম বলি। বলতেই হয় – গ্রামের কৃষক সমাজের বিনিময় যুগ শেষ হবার নয় আজো। (তিতাশ, ২০১৪ : ৪৯-৫০)

নতুন ফসল প্রাপ্তির এই উন্মাদনার পেছনে নির্মল আনন্দতো ছিলই, ছিল আর্থসামাজিক কারণ। বিগত বছরের গোলার ধান ফুরিয়ে গেলে, পরবর্তী ধান কাটা পর্যন্ত চলত গাঁয়ের মানুষের হাপিত্যেশ। তাই কষ্টার্জিত ফসলের প্রাচুর্য, অন্নের সংস্থান তাকে দিত অনাগত দিনের কিছুটা সময়ের জন্য অনিশ্চয়তা মুক্তির আশ্বাস।

নতুন ধানে নবান্ন

উঠান জুড়ে নতুন ধানের সমারোহ। সেই ধানের প্রথম রান্নাকে উপলক্ষ করে উৎসব। আয়োজনটা বেশ আগে থেকে শুরু হলেও নবান্নের পূর্ব রাত্রে থেকেই পড়ে যেত সাজ সাজ রব :

> সূর্যের আলো ফুটবার আগেই ঘর-দোর ঝেড়ে-লেপে স্নান সমাপন করে নেয় তারা। তারপর পুজোর আয়োজন। যে যেটা করে; লক্ষ্মী বা নারায়ণ। পুজোর স্থানে নতুন ধানের চাল গুঁড়ো করে যতোটা পারা যায়, আল্পনা দেয় নারীরা। পুরোহিত আসেন যথা সময়ে। ... পুজো শেষে পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানের জন্য পুজোস্থানের নির্দিষ্ট আসনে বসে বাড়ির বড় পুত্রসন্তান। পরিবারের পক্ষে সে-ই

> পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত। তার অনুপস্থিতিতে বাড়ির কনিষ্ঠ পুত্রসন্তান সে অধিকার পায়। (সৌমিত্র, ২০১৪ : ১০৭)

সৌমিত্র বলেন, পুজো ও পিণ্ড দুটো ক্ষেত্রেই নতুন চালের আয়োজন থাকে। আর থাকে নতুন চালের নৈবেদ্য, অন্ন, মিষ্টান্ন, পিঠার সমাহার।

প্রাচীন লোকসমাজে অগ্রহায়ণ বা আঘন মাসকে লক্ষ্মীর মাসও মনে করা হতো। তাই নবান্ন আর লক্ষ্মীপূজার আয়োজন হতো অগ্রহায়ণেই। লক্ষ্মীপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও এক সময় ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানেরাও এ সময় লক্ষ্মীপূজা করত বলে উল্লেখ করেন সুজন বড়ুয়া (২০১৪ : ২৬) এবং সিরাজুল ইসলাম (২০০৭ : ৩৪৪)। আগে পৌষ সংক্রান্তিতেও গৃহদেবতাকে নবান্ন নিবেদন করার প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে নবান্ন উদযাপনের করণীয় সম্বন্ধে বিধান নির্দিষ্ট করা থাকলেও বরুণকুমার চক্রবর্তী (২০১৪ : ৩৭) মনে করেন, নবান্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান নয়। এই অনুষ্ঠানে যেমন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের ভূমিকা আবশ্যিক নয়, তেমনি কোনো নির্দিষ্ট দিনে নবান্ন আয়োজিত হয় না। অগ্রহায়ণ মাসের যে কোনো একটি শুভ দিনই এ জন্য নির্বাচিত হয়।

সারা হেমন্তকাল ধরেই চলে নবান্ন উৎসবের আয়োজন। অনেক সময় পৌষ মাসেও নবান্ন উৎসব হয়। মূলত এটি ঋতু নির্ভর। ফসল পাকতে বা তুলতে দেরি হলে উৎসবও অঞ্চল ভেদে দেরিতে হয় (শামস, ২০১৪ : ৯৮)। মাধুরী সরকার বলেন,'নবান্নর বিশেষ দিন অগ্রহায়ণের পয়লা তারিখ ধরলে তা শ্রেষ্ঠ। না হলে পঞ্জিকা মতে করতে হয়।' (মাধুরী, ২০১৪ : ৮৯)

নবান্ন কৃষি-কেন্দ্রিক উৎসব হলেও, কিছু নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে প্রধান খাদ্যশস্য বাড়িতে তোলা, পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা, ধর্মীয় রীতি মেনে সাধ্যমতো উৎসব উদযাপন করা এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ত্যাগ করে ভোগ করাই বাঙালির আদর্শ; নবান্ন এর ব্যতিক্রম নয়। সর্বজনীন এই উৎসবের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যে ধর্মীয় অনুশাসন কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পারিবারিক আনন্দ, সামাজিকতায় সম্প্রীতির এক উদার মিলনক্ষেত্র নবান্ন উৎসব। শাশ্বত ঐতিহ্যের নিদর্শন এই উৎসবে একাত্ম হয় গ্রামের মানুষ। অসাম্প্রদায়িক, নির্মল এক উৎসবানন্দে মুখর হয়ে ওঠে গ্রামবাংলার প্রতিটি আঙিনা। নিয়মতান্ত্রিকতা আর উদযাপনে বৈচিত্র্য থাকলেও নতুন ধান বরণের এই উৎসবে আগ্রহটা অভিন্ন।

নবান্ন উদ্‌যাপনে বিশেষত্ব

নবান্নের আনুষ্ঠানিকতার পেছনে আর্থ-সামাজিক কারণই ছিল মুখ্য। তাই নবান্ন উৎসব উদযাপনের ব্যাপকতা ছিল চোখে পড়ার মতো। এর উল্লেখ পাওয়া যায় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের (২০১৪ : ১৭) লেখায় : 'আজ সকল

বাড়িতেই আহারাদির বিশেষ আয়োজন; পাঁচ তরকারী ঘিভাত, ভাজা, বড়া, দুই তিন রকম ডাল, ভাল মাছ, গুড়-অম্বল, দৈ, পায়েস, কোন উপকরণই আজ বাদ পরিবার যো নাই।' তিনি আরও লিখেছেন :

> এই উৎসবের দিন পাঠশালা বন্ধ, গাঁয়ের রাখাল আর কৃষকদেরও মাঠে যেতে হয় না এদিন। বাড়ি বাড়ি থাকে তাদের নিমন্ত্রণ। চাকরি স্থান থেকে নবান্ন উদযাপনের জন্য বাড়ি আসেন গৃহস্থরা। নবান্নের দিন ছেলেরা কলাপাতে অল্পপরিমান নবান্ন নিয়ে কাক, শালিক প্রভৃতি পাখিদের জন্য রেখে আসে। কেউ ঢেঁকির ঘরে ইঁদুরের গর্তে দেয়, কেউ নদীতে যায় মাছকে খাওয়াতে, বাদ যায় না গরু বাছুরদের ভাগও। শিয়ালের জন্য অল্প চাল, দুই খানা শাঁকালু আর এক টুকরা কলা নিয়ে বাঁশবন বা শ্যাওড়ার বনে ফেলে আসার উদাহরণও আছে। ... বাড়ির গৃহস্থদের নবান্ন হয়ে গেলে, ভিখারিগণও সেই রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয় না। এমনকি বাড়িতে জ্বর-প্লীহায় আক্রান্ত ছেলে মেয়েরাও খাবারের বিধি ভেঙে নবান্ন মুখে দিয়ে নিয়ম রক্ষা করে। (দীনেন্দ্রকুমার, ২০১৪ : ১১-১২, ১৬-১৭)

প্রত্যেক বাড়িতেই সাধ্যানুসারে বিভিন্ন রান্নার আয়োজন থাকে এবং গৃহস্থরা আগে নিজ বাড়িতে নবান্নের স্বাদ গ্রহণ করে তারপর অন্য বাড়িতে নবান্ন আহার গ্রহণ করতেন – এমন কথা উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (২০০৭ : ৩৪৪) এবং মোমেন চৌধুরী (২০১৪ : ৪০)। প্রত্যেক পরিবারে অন্ততপক্ষে কুড়ি থেকে চব্বিশ রকমের রান্না হতো। কয়েক প্রকারের তরকারির সাথে 'আলু কচুর শাক' ও 'শোল মূলা' এবং চন্দ্রকাইট' নামক এ প্রকারের পিঠাও এর অন্তর্ভূক্ত হতো। নবান্নে মাছ-মাংস আহার করা হতো। তবে রাতের নবান্ন নিজ বাড়িতেই করতে হতো। পরদিন সকালেও নবান্নের রেশ লেগে থাকত। একে বলা হতো 'বাস-নবান্ন' বা 'বাসি নবান্ন।' (মোমেন, ২০১৪ : ৪০)

সৌমিত্র শেখর (২০১৪ : ১০৮) বলেন, সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠানো হতো নবান্ন-প্রসাদ বা অন্ন-প্রসাদ। শীতকালীন যাবতীয় শাকসবজির সাথে বেগুন ভাজা, করলা ভাজা, বুটের ডাল থাকলেও রসুন বা পেঁয়াজের কোনো কিছু এবং মসুরির ডাল এই আয়োজনে চলে না।

বাংলাদেশে অঞ্চল বিশেষে নবান্ন উৎসবের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল তোলার পরদিনই নতুন চালের ফিরনি-পায়েস অথবা ক্ষীর তৈরি করে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ধনাঢ্য কৃষক পরিবার গরু-মহিষ জবাই করে জেয়াফতের মতো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনেক মুসলিম পরিবারে মিলাদ আর হিন্দু পরিবারে লক্ষ্মীদেবীর পূজার আয়োজন হয়। উঠানে, ঘর-দোরে বিচিত্র রকম আলপনা আঁকা, নতুন জামাইকে নিমন্ত্রণ করা বা মেয়েকে বাপের বাড়ি নায়র আনার মতো বিষয়গুলো বাঙালি সংস্কৃতির অখণ্ড রূপ বলে উল্লেখ করেন তিতাশ চৌধুরী (২০১৪ : ৫৩)।

বহু কাঙ্ক্ষিত নবান্নের দিনটি যেন বিদায় জানাত সকল কর্মব্যস্ততাকে। সেই সমাজচিত্রই তুলে ধরেন দীনেন্দ্রকুমার রায় :

> গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা হুঁকা টানিতে টানিতে দাবা ও পাশা খেলিতে বসিয়া গিয়াছেন, গড় গড় করিয়া হুঁকা ডাকিতেছে, বিসুবিয়সের ধুম-উদ্গিরণের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত ধুম উঠিতেছে; 'কিস্তী!' 'কচেবারো!' প্রভৃতি

> শব্দের বিরাম নাই। যুবক দল একটু আড়ালে বসিয়া সশব্দে তাস পিটিতেছে। ছেলেরা সমস্ত দুপুরটা বাড়ির বারান্দায়, চিলেকোটার ছাতে, অন্দরের বাগানে, গোয়াল ঘরের অন্তরালে, লুকোচুরী খেলা শেষ করিয়া বৈকালে দলে দলে দত্তবাগানে গিয়া জুটিল। ... নদীতীরবর্ত্তী সুবৃহৎ ষষ্ঠীগাছের ছায়ায় আজ গ্রামস্থ রাখাল, কৃষাণ ও মজুরেরা সমবেত হইয়াছে, বর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর আজ তাহাদের বিশ্রামের দিন; আজ কেহ কাজে যায় নাই। একদল সেখানে 'মালামো' করিতেছে, কেহ কেহ লাঠি খেলিতেছে, তিন চারিজন বাজি রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবার আশায় প্রাণপণে ছুটিতেছে। (দীনেন্দ্রকুমার, ২০১৪ : ১৭-১৮)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোনো কোনো অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় মানুষ দল বেঁধে নবান্নের আয়োজন করত বলে উল্লেখ করেন সৌমিত্র শেখর। সন্ধ্যার পর পাড়ার উৎসাহী তরুণেরা গায়েন দল নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে ধান সংগ্রহ করতো। নতুন এই ধান দিয়েই পাড়াসুদ্ধ মানুষ একত্রে নবান্ন করত। নতুন চালের ভাত নানা ব্যঞ্জনে মুখে দেয়া নিয়ে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। সেই আয়োজনের দিনে উচ্ছ্বসিত আনন্দে মশগুল থাকত গ্রামের মানুষেরা। (সৌমিত্র, ২০১৪ : ১০৮-১০৯)

অনাগত দিনে ভালো ফসল প্রাপ্তির কামনায়, ছোট ছোট নানা আনুষ্ঠানিকতায় একটি পূর্ণাঙ্গ উৎসব নবান্ন, যার রেষ থাকে পৌষ-পার্বণের নানা আয়োজনে – এমন মত পোষণ করেন মোমেন চৌধুরী (২০১৪ : ৪০-৪১)। তিনি বরিশালে আয়োজিত নবান্নে লক্ষ্মীপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, 'বীরবাঁশ', 'কাকবলি', নবান্ন ভোজন, রাতের নবান্ন এবং বাসি নবান্নর আনুষ্ঠানিকতায় নবান্ন উৎসবের চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, বীরবাঁশ-এর 'বীর' শব্দটি 'ব্রীহি' থেকে আসতে পারে। বীরবাঁশের কঞ্চিগুলোতে ধানের ছড়া বেঁধে দিয়ে অনাগত বছরে ফসলের প্রাচুর্য কামনা করা হতো। কৃষিজীবী সমাজে জ্যান্ত কই মাছ, দুধ, বাঁশ এবং ধানের ছড়া সবগুলোই উর্বরতাসূচক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। সেই অর্থে বীরবাঁশ তাৎপর্যবাহী। প্রোথিত লম্বা বাঁশ তেল দিয়ে পিচ্ছিল করে, বাঁশের মাথায় মিষ্টির হাঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। পিচ্ছিল বাঁশ বেয়ে মিষ্টান্নের হাঁড়ি নামিয়ে আনতে পারা ব্যাক্তিই 'বীর' বলে আখ্যায়িত হতো। 'বীরবাঁশ' নামক এই খেলা প্রচলিত ছিল ময়মনসিংহ, রংপুর, রাঙামাটিতেও।

কালের বিবর্তনে এখনো গ্রামীণসমাজে অগ্রহায়ণ মাসে সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো রান্না, খাওয়া, নতুন পোশাক পরিধান এবং আনুষ্ঠানিকতা পালনের রেওয়াজ আছে। নিয়মতান্ত্রিকতা আর উদযাপন ভিন্নতার কারণে মনে হতে পারে, নবান্ন প্রকৃতপক্ষেই অসাম্প্রদায়িক উৎসব কিনা। তবে নিঃসন্দেহে অগ্রহায়ণ মাসজুড়ে গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে নতুন ধান বরণের এ এক সহজাত আয়োজন, ঐতিহ্যের উৎসব।

প্রাসঙ্গিকতায় নবান্ন

অনেক প্রতিকূলতার পরও, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশে, বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে, ঐতিহ্যের নবান্ন উৎসব উদযাপনের প্রাসঙ্গিকতা কখনই শেষ হবার নয়। এ প্রসঙ্গে দীপককুমার পণ্ডা মনে

করেন (২০১৪ : ৭৩), 'আমন ধানের চাষে এখন গুরুত্ব না থাকলেও এই নবান্ন উৎসবে গ্রামবাসীর আগ্রহ কমে নি। তাই গ্রামের মানুষের কণ্ঠে থাকে নবান্ন ঘিরে উচ্ছ্বাস। এই আবেগ কিংবা নস্টালজিয়া সমস্ত বাঙালির।'

বিজনকুমার (২০১৪ : ৬৩) বলেন, গ্রামীণ সংস্কৃতিতে সমগ্র গ্রাম যে একটি যৌথ পরিবার; তার প্রমাণ মেলে এই নবান্ন উৎসবে।

গ্রামবাংলার সবচেয়ে বড় শস্যোৎসব নবান্নর মধুর স্মৃতি সঞ্জিবনী শক্তি হিসেবে ধরা দেয় যুগে যুগে। যার একটা আবহ মিশে আছে অঘ্রাণের গাঁয়ে :

> নবান্ন না করিলে প্রত্যবায় থাক না থাক দীর্ঘকাল পরে বালকবালিকাগণের কলকণ্ঠঝঙ্কারে মুখরিত স্নেহাচ্ছন্ন পল্লীগৃহে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নূতন আমনের চাউলের অন্নগ্রহণের মধ্যে এমন কোমল মাধুর্য্য ও প্রীতিকর ভাব আছে – যাহা গৃহচ্যুত প্রবাসীর বিরহবিষাদব্যথিত একক জীবনের পক্ষে একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়; এই মধুর পুণ্যস্মৃতিটুকুকে বৈচিত্রহীন জীবন-পথের সম্বল করিয়া বিরহী পথিক দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসযাত্রা করিতে পারে। (দীনেন্দ্রকুমার, ২০১৪ : ৫)

নবান্ন ঘিরে গ্রামের মানুষের উচ্ছ্বাস, আবেগ কিংবা নস্টালজিয়া, এ যেন সমস্ত বাঙালির। এই আবেগ, মানসিকভাবে একাত্ম করেছে বাঙালিকে। 'নতুন ধান মানেই নিশ্চিন্ত, নির্ভার এক সময়। সারা বছরের খাদ্যাভাব মোচনের চিন্তাই শুধু নয়, গ্রামীণ সমাজের সম্বৎসরের আনন্দ-ফুর্তি, লৌকিকতা, চিকিৎসা, বিয়ে সবকিছুর ভরসা – এই ধান। মানসিক এই পরিতৃপ্তি থেকেই সর্বত্র তৈরি হতো একটা উৎসবের মেজাজ। তাই কৃষি বা শস্যোৎসবের ব্যাপকতা ছাপিয়ে নবান্ন উৎসব শিথিল করতো জাতিগত বিভাজনের বেড়াজাল।' (দীপককুমার ২০১৪ : ৬৬,৭৩-৭৪)

'নবান্ন' নানা কারণেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অতীব তাৎপর্যপূর্ণ মণ্ডিত। বরুণকুমার চক্রবর্তী (২০১৪ : ৩২) বলেন, 'এক কথায় নবান্ন এক বহুমাত্রিক পার্বণ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মতই তা স্নিগ্ধ ও পরম উপভোগ্য, রমণীয়, আস্বাদ্য, মধুর।' পার্বণের সংসারে নবান্নকে এখন আমরা যত উপেক্ষিতই দেখি, একটা সময় ছিল যখন কৃষি অর্থাৎ শস্য ছিল অর্থনৈতিক চালিকার মূল শক্তি, তখন নবান্ন সগৌরবে তার অস্তিত্বের জানান দিত। সারা বছরে এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত বাঙালি :

> নতুন ফসলের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের অবিচ্ছেদ্য যোগ, তাদের আগ্রহের আতিশয্যে গ্রাম্য জীবন মুখরিত হয়ে উঠত। গ্রামীণ জীবনে দেখা দিত প্রাণের স্পন্দন। নবান্ন উৎসব তার প্রতিভূ হিসেবে প্রতিফলিত হতো। (দীপককুমার, ২০১৪ : ৬৬)

১৯৩৫ সালে 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এর ডিসেম্বর সংখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে দীপককুমার লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লিবাংলার ধান-চাল ঘিরে নানা উৎসবকে গুরুত্ব দিতেন। নবান্নর উচ্ছসিত প্রসংশায় মুখর হতেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিশ্বভারতীতে নবান্ন উৎসব আয়োজিত হতো সাড়ম্বরে। (দীপককুমার ২০১৪ : ৬৬)

লোক-উৎসবের উপযোগিতাকে ধর্মের অনুশাসনে ব্যাখ্যা করা অনুচিৎ – এমন মন্তব্য করে সৌমিত্র শেখর (২০১৪ : ১১০) বলেন, বাঙালি হিসেবে তার সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে ভালোবাসা উচিত। সংস্কৃতির সাথে ধর্মকে, ধর্মান্ধতাকে এক করে ফেলা সমীচিন নয়। ধর্ম সংস্কৃতির একটি উপাদান মাত্র। সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে শুধুই ধর্মে স্থিতি নেয়া 'বৃক্ষের অধিকার ছেড়ে শাখা-প্রশাখায় আশ্রয় গ্রহণের নামান্তর' বলেই মত দেন তিনি।

মূলত, বাঙালি জাতিসত্ত্বার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ইতিহাসও নবান্ন উৎসব দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পাশ্চাত্য চেতনার প্রভাব আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের কঠোরতায় ম্লান হয়ে গেলেও, এই উৎসব মানুষের সাথে মানুষের হৃদয়ের বন্ধনকে দৃঢ় করেছে, তাকে সহমর্মী করেছে, যুক্তিবাদী ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। নবান্ন উৎসব মানুষকে সকল সংকীর্ণ চেতনার ঊর্ধে উঠে, তাকে ঋদ্ধ হতে, সংস্কৃতিবান হতে সর্বোপরি মানবীয় হতে সহায়তা করেছে।

মানবীয় শক্তিতে বলীয়ান হতে উত্তরপ্রজন্ম তার পূর্বসূরীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অন্তরে ধারণ করবে, নবান্ন উৎসবকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবে – এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে উল্লিখিত মনীষীদের ভাবনায়। স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালি একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির দাবিদার। নবান্ন উৎসব তেমনি সমৃদ্ধ ইহলৌকিক এক ধারণা এবং সামাজিকতা। নবান্ন উৎসব মানুষকে জাতিগত অনুভূতিতে একাত্ম করে। এই অনুভূতি মহৎ উদ্দীপক-প্রশংসাব্যঞ্জক। বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক অবলম্বন হিসেবে এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করার প্রয়োজনে এই উৎসব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। নবান্ন উৎসব বাঙালি সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, যা মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার ধারাকে শাণিত করে, যে চেতনায় আছে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা। আর এখানেই নিহিত উৎসবের অন্তর্নিহিত শক্তি।

বিশ্বসভ্যতার হাতছানি রুখতে বাঙালি সংস্কৃতি কতটুকু সহায়ক, তার মূল্যায়ন করবে নবান্নর মতো লোকউৎসবগুলো। কেউ কেউ নবান্ন উৎসবকে নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের বলে, জাতিগত বিচ্ছিন্নতা তৈরির চেষ্টা করলেও, বাঙালির আত্মপরিচয়ের উপলব্ধিই পারে সংস্কৃতিকে এই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে। বাঙালি সংস্কৃতি ও এর উপাদানের বাহন ও ঐতিহ্যের ধারা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে বিরাজমান থাকে এবং সমাদৃত হয় সে বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে সবাইকে। তরুণ প্রজন্ম তার শিকড়হীনতার অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে ফিরে আসতে পারে আপন সংস্কৃতির ঐতিহ্যে। নবান্নের মতো ঐতিহ্যবাহী উৎসব ধরে রাখতে পারে ভবিষ্যতের বাঙালির পরিচয় – তাকে গৌরবান্বিত করতে পারে ঐতিহ্যগত চেতনায়।

শীত উৎসব

প্রকৃতিতে শীতকাল আসে হিমের পরশ নিয়ে। প্রকৃতির তপ্ত আবহাওয়া মানুষকে বিচ্ছিন্ন করলেও, শীত যুথবদ্ধ করে মানুষকে আর যুথবদ্ধতা মানেই উৎসব। শীতের কুয়াশামাখা ভোরে একটু উষ্ণতার আশায় রাস্তার ধারে বা মাঠে খড়কুটো জ্বালিয়ে তাপ পোহানোর দৃশ্য গ্রামাঞ্চলে হরহামেশা দেখা যায়। স্বকৃত নোমান (২০১৭) লিখেছেন, মিষ্টি রোদের ওম নিতে বাড়ির আঙিনায়, চায়ের দোকানে, পুকুর পাড়ে জমে ওঠে আড্ডা। শীতের দিনটা এভাবেই শুরু হয় ছোটখাটো উৎসব আনন্দের মধ্য দিয়ে, উল্লেখ করে তিনি আরও লেখেন :

> যতই কাজ থাকুক, বাড়ির বউ-ঝি, এমনকি পুরুষরাও গোসল করতে পুকুরে নামার আগে কিছুক্ষণ পুকুর পাড়ে বসে আড্ডা দেবেই। আবার গোসল শেষেও সেই একই আড্ডা। আড্ডার যেন আর শেষ হতে চায় না। সন্ধ্যায় এসে উৎসবটা পায় আরেক মাত্রা। গ্রামাঞ্চলে সাঁঝের বেলায় খড়কুটো, নাড়া, লতাপাতা জ্বালিয়ে বা লাকড়ির স্তুপ বানিয়ে সবাই গোল হয়ে আগুন পোহাতে বসাটা শীত উৎসবের আরেক পর্ব। শীতের মাত্রাটা একটু বেশি হলে শহরেও এমন চিত্র দেখা যায়। (স্বকৃত নোমান, ২০১৭)

শীতকালে দিনের বেলাটা কর্মোদ্দীপনায় মুখর আর বৈপরীত্য এর রাতে। নির্জনতা আর স্তব্ধতার কাছে সমর্পণ করা সময় শীতের রাত, উল্লেখ করে নোমান লিখেছেন, শীতের রাত বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকেও যুথবদ্ধ করে এক লেপ, কম্বল আর কাঁথার নিচে। এভাবে ঘুমানোর মধ্য দিয়ে শিশির মাখা দীর্ঘ রাতও হয়ে ওঠে উদ্‌যাপনযোগ্য।

শীতের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের সংযোগ রয়েছে। গ্রামবাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির যত আয়োজন আছে, সবই আয়োজিত হয় শীতের রাতে। স্বকৃত নোমান (২০১৭) লিখেছেন, এ সময় গ্রামের সাধারণ মানুষদের উদ্যোগে নানা নাটগীতের আয়োজনে মুখর থাকে গ্রামবাংলা। এর মধ্যে কবিগান, জারিপালা, মুর্শিদিগান, গাজীর গীত, মানিক পীরের গান, মাদার পীরের গান, পুতুলনাচ, মাইজভাণ্ডারি গান, যাত্রপালা উল্লেখযোগ্য। কুয়াশার রাতে কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে পেশাদার শিল্পীদের পরিবেশনায় সময় হয়ে ওঠে উপভোগ্য।

শীতের সময়ে প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে থাকে হেমন্তের নতুন ধান। আর নতুন ধানের সাথে পিঠাপুলির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। শীত জমে উঠলেও, পিঠা ছাড়া শীতের সকালটা জমে না একেবারেই। খেজুর গাছের মাথায় সুদৃশ্য মাটির হাঁড়ি, কাকডাকা ভোরে খেজুরের রস তৈরির আমেজ বয়ে আনে শীতের বার্তা। স্বকৃত নোমান লিখেছেন :

> সকালের কুয়াশা কিংবা সন্ধ্যার হিমেল বাতাসে ভাপা পিঠার গরম আর সুগন্ধি ধোঁয়ায় মন আনচান করে ওঠে। সরষে বা ধনেপাতা বাটা অথবা শুঁটকির ভর্তা মাখিয়ে চিতই পিঠা মুখে দিলে ঝালে কান গরম হয়ে শীত পালায়। সকাল হলে গাঁয়ে পিঠা উৎসব দেখা দেয়। এই পিঠাপুলির উৎসবে যোগ দিতে শীতকালে বাড়িতে বেড়াতে আসে মেয়ে, জামাই আর নতুন কুটুম। মেয়েজামাইয়ের বাড়িতে মা-বাবারা পিঠা বানিয়ে পাঠিয়ে দেন শীতকালে। ...রাতে চিতই পিঠা তৈরী করে খেজুরের রসে ভিজিয়ে সকালে খাওয়াটা একমাত্র শীতকালেই সম্ভব। আর খেজুরের রস থেকে তৈরী 'রাব' এর তুলনাই হয় না। এ সময় আখের রস থেকে

গুড় তৈরীর ধুম পড়ে যায়। গরম গরম গুড় খাওয়ার স্বাদই আলাদা। এটাও শীত উৎসবের আরেকটি অনুষঙ্গ। (স্বকৃত নোমান, ২০১৭)

পৌষ-পার্বণ

বারো মাসে তেরো পার্বণের বাংলাদেশে 'নবান্ন' পার্বণ থেকে হয়ে উঠেছে উৎসব। একালে উৎসব বলতে যা বোঝায়, আয়োজন ও উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতায় প্রথম দিকে নবান্নকে সে সংজ্ঞায় ফেলা যেতো না – এমন মত প্রকাশ করেন সৌমিত্র শেখর। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ লোক-উৎসব নবান্নর ভূমিকা অংশ 'নবান্ন : পার্বণ থেকে উৎসব'-এ বলেন, পার্বণের সঙ্গে ভালো দিন বা তিথি-নক্ষত্রের সংযুক্তি বিচার হতো। সেই শ্রেণিবিচারে নবান্ন ছিল পার্বণ। পরবর্তী সময়ে নবান্নের দিন নির্ধারণ করা হতো ধান ওঠার সাথে সঙ্গতি রেখে সুবিধা মতো যে কোনো দিন। এ কারণেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ ও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে 'নবান্ন' পার্বণ থেকে হয়ে উঠেছে উৎসব। সূচনার বিচারে নবান্ন পার্বণ আর গ্রহণযোগ্যতার বিচারে নবান্ন উৎসব। যদিও 'নবান্ন' লোকউৎসব নামেই স্বীকৃত।

মধ্য হেমন্তে, অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণত এই নবান্ন হয়। পঞ্জিকাতে এর শুভক্ষণের উল্লেখ থাকলেও তিথি-নক্ষত্রের কারণে কখনো কখনো এই দিনটি অগ্রহায়ণের বদলে পৌষ মাসেও পড়ে যায়। তবে এর কারণে আচার-অনুষ্ঠানের কোনো পার্থক্য হয় না। কারণ নবান্ন কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এমন উল্লেখ করে সৌমিত্র শেখর (২০১৪ : ১০৫) বলেন, হিন্দুসমাজ যে কোনো আচার-অনুষ্ঠানই শুভক্ষণ দেখে করে থাকে, নবান্নের সময়ও তারা পঞ্জিকার আশ্রয় নেয়। বেশিরভাগ সময়ই নবান্ন অগ্রহায়ণ মাসে হবার কারণ – এ সময় গ্রামের সব মানুষের কাছেই কম-বেশি ধান থাকে। বাজারে ধানের দামও তখন কম। পঞ্জিকাতে বিভিন্ন মাস সূচনাকালে 'দ্রব্যমূল্যজ্ঞান' শিরোনামে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত পূর্ব-ধারণা লিপিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। ... পঞ্জিকায় আছে অগ্রহায়ণ মাসে চাল, কাগজ, কাপড়, সরিষা সুলভ হয়।

'নবান্ন' আঞ্চলিক ও পারিবারিক উভয় ধারার লোকজ উৎসব হয়েও কখনও কখনও তা ধর্মীয় আচারের পর্যায়ভুক্ত, এমন মত আমিনুর রহমান সুলতানের (২০১৪ : ৫৬)। কেননা, একটি পরিবারে নবান্নকে যেভাবে গ্রহণ করা হয় তার জন্য পরিবার-কেন্দ্রিক আমেজেরই প্রকাশ ঘটে অধিক। এটি মুসলিম কৃষক পরিবারের ক্ষেত্রেই ঘটে। তবে সামাজিক উৎসব হয়ে ওঠে তখনই যখন পরিবারের নিজেরাই শুধু নয়, প্রতিবেশীদের খাইয়ে কিংবা জুমার দিনে (শুক্রবার) ক্ষীর-পায়েস তৈরি করে জুমার নামাজে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ানোর আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অগ্রহায়ণের নবান্ন উৎসব পৌষেও বিস্তারিত হয়। আর পৌষপার্বণ মানেই পিঠাপুলি খাওয়ার সুযোগ। পৌষপার্বণে মেলা ও পিঠাউৎসব যেন নবান্ন উৎসবের সম্প্রসারিত রূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে নানা আঙ্গিকে পৌষমেলা উদযাপন করতেন, যা এখনও প্রচলিত আছে বলে উল্লেখ

করেন শামসুজ্জামান খান (২০১৩ :৫৯)। এখনও দুই বঙ্গেই কিছু ভিন্ন আঙ্গিকে পৌষমেলা হয়। বাংলাদেশে নেত্রকোণার পৌষমেলা, চট্টগ্রামের ডিসি হিলে পৌষের পিঠা উৎসব, ঢাকার নানা সংস্থার পিঠা উৎসব এর সম্প্রসারিত রূপ বলে মনে করেন তিনি।

ঋতু বা জলবায়ু ভেদে আমাদের দেশে প্রায় ছয়শ রূপ ধানের উল্লেখ আছে প্রাচীন সাহিত্য শিবমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গলসহ শত শত পুথিতে – এমন তথ্যের অবতারণা করে আশরাফ সিদ্দিকী লেখেন, 'ধানের নামই যেখানে শতাধিক, তাহলে নবান্ন উৎসবের পিঠের নাম কিরূপ হতে পারে? প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে শতাধিক প্রকার পিঠে ছিল। ... এ পিঠে কি শুধু উদর পূরণের? এ যে নয়নভরে দেখারও, এ যে উপলব্ধি করারও। এ-সময় ঢেঁকিঘরে চলে গানের বন্যা।' (আশরাফ, ২০১৪ : ২১-২২)

নতুন ধানের নতুন চালের রকমারি পিঠার গন্ধে সেসময় ভরে উঠত গ্রামবাংলার আঙিনা। বৈচিত্র্যময় নামধারী নানান সব পিঠার নাম উল্লেখ করেন তিতাশ চৌধুরী। এর মধ্যে রয়েছে পোয়া পিঠা, দুই বিরানি, চিতল পিঠা, পাক্কন পিঠা, চুকা পিঠা, মেরা পিঠা, তিলের পিঠা, তালের পিঠা, চটা পিঠা, ভাপা পিঠা, গুড়ের পিঠা, পাটিসাপটা, রুটি পিঠা, চিকন পিঠা, চালা পিঠা, সেমাই পিঠা, খান্দেশ পিঠা, পুলি পিঠা, হাফরি পিঠা, খোলা পিঠা এবং আরও নানা রকম ছাঁচের পিঠা। তিতাশ চৌধুরী লিখেছেন :

> দুই বিরানি ও চিকন পিঠায় নানা রকম চিত্র ও নকশার কারুকাজ লক্ষ করা যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে ফুল, পাখি, লতা-পাতা, সরতা, কুলা এবং বিচিত্র রকম গ্রার্হস্থ্য চিত্র। ... এক একটি পিঠার গায়ে কুল-বধূর স্বপ্ন-আর্তি ও প্রেম ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকে জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনি সর্বোপরি জীবনগাথা। নবান্ন উৎসবের অংশ হিসেবে এইসব পিঠা আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শির বাড়ি বাড়ি পাঠানো হয়। (তিতাশ, ২০১৪ : ৫২-৫৩)

নবান্ন উপলক্ষে বিভিন্ন বটতলায়, হাটে-বাজারে জমে উঠতো নবান্নের মেলা। বিজনকুমার মণ্ডল বলেছেন (২০১৪ : ৬৩) রাঢ় অঞ্চলের অধিকাংশ জেলায় এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসত। সমগ্র বাংলার লোকমেলার ওপর ১৯২১ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক মি. টেন্টলি লিখিত ফেয়ারস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল ইন বেঙ্গল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আশরাফ সিদ্দিকী (২০১৪ : ২৩) লিখেছেন, কোনো কোনো মেলায় পাঁচশ থেকে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত লোকের সমাবেশ হতো। রংপুরের দ্বারোয়ানীর মেলায় হাতি-ঘোড়াও বিক্রি হতো। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সে মেলায় আঞ্চলিক শিল্পীদের পরিবেশনায় যাত্রা-জারি-বাউল-মারফতি ও মুর্শিদি গানের আয়োজন যেমন থাকত, তেমনি মিলত সাংবাৎসরিক হাঁড়ি-পাতিল, লাঙল-জোয়াল, আগত বছরের জন্য বিভিন্ন তরকারীর বীজ, ফসল ইত্যাদি। মৌসুমের সময় অপেক্ষাকৃত কম দামে ফসল পাওয়া যেত বলে, দেশি-বিদেশি পাইকারগণ ধান-সরিষা-বিভিন্ন প্রকার চাল ফসল তরিতরকারি সংগ্রহে গ্রামের হাটে হাটে ভিড় জমাতো। এসব দ্রব্য চালান হতো বড় বড় শহরে। এমনকি সমুদ্রপথে বিদেশেও। মেলায় মিলত শাড়ি-জামা-চুড়ি-সৌখিন গহনা ও আনুষঙ্গিক; যা গ্রামে বউঝিদের বহু

কাঙ্ক্ষিত। ধান ওঠার মৌসুমে অক্লান্ত শ্রমের দাবীদার হিসেবে একটি নতুন শাড়ি – গৃহস্থ বউদের ভাসিয়ে দিত বিপুল আনন্দে। (আশরাফ, ২০১৪ : ২৫)

বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' হলেও বছরের সবসময় উৎসবের একই রকম ঘনঘটা দেখা যায় না। উৎসবের বান ডাকে ধান ঘরে তোলার পরের মাসগুলোতে। এমনকি বিয়েশাদির জন্য পছন্দের সময়ও এই মাস। (সুমহান, ২০১৪ : ৯২)

হেমন্তের প্রাণ যেন নবান্ন উৎসব। সাধ আর সাধ্যের সমন্বয়ে হাজার বছরের এই উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাই অগ্রহায়ণে গ্রামেতো বটেই, শেকড়ের টানে এই উৎসবে মিলিত হতে চান শহরবাসীরাও।

পৌষ-পার্বণ উৎসব আগের মতো জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও, এখনও বাংলার গ্রামীণ জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে, এমন বার্তা দিয়ে খোন্দকার রিয়াজুল হক লিখেছেন :

> পৌষ মাসে পৌষ-পার্বণ ছাড়াও কৃষিকে কেন্দ্র করে আরো কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। পার্বণ উপলক্ষে নগ্রামের ছেলে মেয়েরা মাগনের গান গায়। বাড়ি বাড়ি যেয়ে এ গান গেয়ে কিছু কিছু চাল-পয়সা তারা মেগে নিয়ে থাকে। পৌষ মাসের সাতদিন থাকতে কোনো কোনো গ্রামে এখনো 'বোইল' গানের দল বের হয়। আট-দশ জন গ্রাম্য বালক সমস্বরে এই বোইল গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি পিরের গান শুনিয়ে চাল ও পয়সা গ্রহণ করে। 'বোইল' গানের দলের এবং মানিক পিরের গানের দলের লোকেরা পৌষ-সংক্রান্তির দিন পৃথক পৃথক জায়গায় ঐ চাল এবং তার সাথে গুড় দিয়ে ক্ষীর পাকিয়ে শিরণী করে। ... বোয়াইল গান ও মানিক পিরের গান ছাড়াও কোনো কোনো গ্রামে 'সোনারায়ের দল' গঠিত হয়। (রিয়াজুল, ১৯৯৫ : ৪১-৪২)

পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে কোনো কোনো এলাকায় 'ভারবোল' বা 'হরবোল' নামে এক ধরনের ছড়া গান এবং 'বাঘাইর বয়াত' নামেও ছড়াগানের প্রচলন আছে বলে উল্লেখ করে খোন্দকার রিয়াজুল হক জানান, এই উৎসবগুলো জোরদারভাবে পালিত না হলেও, বাংলাদেশের অনেক গ্রামাঞ্চলে এই উৎসব দুর্বলভাবে টিকে আছে।

পৌষালী বা পৌষপার্বন অন্যতম শস্য উৎসব। এর মধ্যে নতুন শস্য সমাগমের আনন্দ উৎসবের ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট উল্লেখ করে প্রদ্যোত কুমার (১৯৮৮ : ১৩০) লিখেছেন, পৌষপার্বণ মূলত কৃষকদেরই উৎসব এবং এটি সঞ্চয়ের পরিপূর্ণতার উৎসব। পৌষের সংক্রান্তিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। পিঠে খাওয়া এ পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এককালে নানান ধরণের পিঠে তৈরি হত; যেমন – চিতই, রসপুলি, পুলি, সরুচাকলি, সোকুল, মোহন বাঁশি, ক্ষীরমুরলি, পাটিসাপটা ইত্যাদি। পিঠে তৈয়ারী ছিল বাঙালীয় পল্লিবধূদের এক বিশেষ ধরনের শিল্প। বঙ্গসংস্কৃতির এই পিষ্ঠক শিল্প আজ অনেকখানি অনাদৃত বললে চলে।

প্রদ্যোত কুমার (১৯৮৮ : ১৩০) যোগ করেন, পৌষ মাস, লক্ষ্মী মাস। এই লক্ষ্মীমাসকে পল্লীনারীরা আঁকড়ে রাখতে চায় নানান ভাবে। কোথাও কোথাও পৌষের শেষ দিনের ভোরে কৃষাণ পত্নী মাঘের উষার উদয়ের পূর্বে শুদ্ধাচারিণী হয়ে কন্যা সন্তানদের সাথে নিয়ে খামারে যায়। আতপ চালের গুঁড়ার বেড়া দেয় পৌষমাসের গতি রোধ করতে।

পৌষ সংক্রান্তি

শীত উৎসবের একটি বিশেষ অনুষঙ্গ পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি। দেশের সব অঞ্চলে এটি পালিত না হলেও, বিশেষ কিছু এলাকায় পৌষ মাসের শেষ দিন পিঠা খাওয়া, ঘুড়ি উৎসবের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় পটকা ফুটিয়ে, ফানুস উড়িয়ে পৌষ সংক্রান্তির সমাপ্তি করা হয়। খোন্দকার রিয়াজুল হক (১৯৯৫ : ৪৩) জানান, ঘুড়ি উড়ানো উৎসবটি উদযাপন করে পুরনো ঢাকাবাসীরা। এ সময়টায় পুরনো ঢাকার পাড়া-মহল্লার সব বাড়ির ছাদে নাটাই ও ঘুড়ি হাতে শিশু কিশোরদের উৎসব জমে ওঠে। নানা রং-আকৃতির বৈচিত্র্যময়, আকর্ষণীয় সব ঘুড়ি উড়তে থাকে আকাশে। এসময় ঘুড়ি কাটাকাটির প্রতিযোগিতা আনন্দ বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ।

ভ্রমণ

মেঘমুক্ত আকাশ আর শঙ্কাহীন ঝড়বাদলের আশ্বাসে, ভ্রমণ পিয়াসীদের জন্যও উপযুক্ত সময় শীতকাল। কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন, নিঝুমদ্বীপ, সুন্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে শীতকালে যে পরিমাণ পর্যটক ভ্রমণে যায়, অন্য কোনো ঋতুতে সে পরিমাণ নগণ্য।

বসন্ত উৎসব

ফাল্গুনের প্রথম দিন সকালে চারুকলা অনুষদের বকুল তলায় আয়োজন করা হয় বসন্তবরণ অনুষ্ঠান। উত্তরীয় হাওয়ায় ঝরা পাতাকে বিদায় জানিয়ে প্রকৃতিতে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। যদিও সে সময়টায় শীত পুরোপুরি বিদায় নেয় না। গাছের ডালে, ফুলে, ফলে, পাতার আড়ালে চলে বসন্তের অভিষেক। গাছে গাছে কোকিলে ডাক জানান দেয় বসন্তের আগমনী বার্তা। বনানী জুড়ে নতুন কুঁড়ি সিগ্ধ করে তোলে রিক্ত বৃক্ষকে। ফুলে ফুলে সেজে ওঠে প্রকৃতি। নিজেকে যেন প্রকৃতির সাথে বিলিয়ে দেবার ব্যকুলতায় উচ্ছ্বল তরুণ-তরুণীরা সমবেত হয় বসন্ত বরণে। নগর জীবনের সেই দোলায় জাতীয় বসন্ত উৎসব উদযাপন পরিষৎসহ নানা শিল্প-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আয়োজন করে প্রাণের উৎসব – বসন্ত বরণ উৎসব। নব জাগরণের চেতনায় নৃত্য, গীত,

কবিতা, কথনে বসন্তকে বরণ করে ফাগুনপ্রেমীরা। এক সাক্ষাৎকারে (সাক্ষাৎকার ৫) বক্তারা বলেন, এ দিনটি যেন সমস্ত কলুষতা দূর করে সুন্দরকে বরণ করার দিন। সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় প্রতিবছর মনের তাগিদে সবাই এ উৎসবে মিলিত হন, বলেও জানান বক্তারা। এভাবেই এক অভিন্ন হৃদয়াবেগে উচ্ছসিত মানুষ একাত্ম হন বসন্ত বরণ উৎসবে।

ঋতুভিত্তিক অন্যান্য উৎসব

ওপরে যা বর্ণনা করা হলো, এর বাইরেও ঋতুভিত্তিক আরও কিছু উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

প্রবারণা উৎসব

ঋতুবিশেষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা পালন করেন তাঁদের ধর্মীয় উৎসবও। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব প্রবারণা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শরৎকালে।

খোন্দকার রিয়াজুল হক (১৯৯৫ : ২৬-২৭) উল্লেখ করেন, আশ্বিনী পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলা হয়, কারণ এ তিথিতেই প্রবারণা উৎসব শুরু হয়। প্রবারণা কথার অর্থ বিশেষভাবে বারণ বা নিবারণ করা, 'নৈতিক স্খলন নির্দেশ' করার জন্যে অনুরোধ জানানো। প্রবারণায় একজন শিষ্য নিজের দোষ দেখিয়ে দেবার জন্য অপরকে অনুরোধ করেন এবং অপর ব্যক্তি শিষ্যকে তার দোষ দেখিয়ে দেন। এটাই উৎসবের মূল তত্ত্ব। এ দিনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, একে অন্যের সাথে আলিঙ্গন করেন এবং নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ত্রুটিপূর্ণ আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হন।

রিয়াজুল হক (১৯৯৫ : ২৬-২৭) আরও যোগ করেন, আশ্বিনী পূর্ণিমায় প্রবারণা উৎসব অনুষ্ঠিত হবার আগে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিন মাস বৌদ্ধ ভিক্ষুরা একটি স্থায়ী আবাসে থেকে ধ্যান ও কঠিন সাধনা করেন। সারা বর্ষাকালব্যাপী এই অবস্থানকে বলা হয় বর্ষাবাস। প্রবারণা বা আশ্বিনী পূর্ণিমায় সেই সাধনার সমাপ্তি হয়। এ দিন ভিক্ষুদের দোষ স্বীকারের পর দোষ দূরীভূত করা হয় এবং বিহারে আয়োজিত ধর্মের আলোচনায় যুক্ত হওয়া, উপদেশের কথা শোনা ও পুণ্যকাজ করা কর্তব্যের অংশ হিসেবে পড়ে।

এই উৎসবের দিন থেকেই শুরু হয় মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসব। যেখানে, বাংলাদেশের প্রতিটি বৌদ্ধ গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিক্ষুগণকে চীবর বা গৈরিক কাপড় দান করা হয়। সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে

মানবকল্যাণের ব্রত নিয়ে, অনুষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মীয় উৎসব প্রবারণা ও কঠিন চীবর দান উৎসব, বাংলা ঋতুভিত্তিক আয়োজিত উৎসব।

চৈতপূজা বা চড়কপূজা উৎসব

প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে পালিত হয় চৈতপূজার উৎসব, যার অন্য নাম চড়কপূজার উৎসব, এমন তথ্যের অবতারণা করে খোন্দকার রিয়াজুল হক (১৯৯৫ : ১৮-১৯) লিখেছেন, চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহের প্রথমে উৎসব শুরু হয়ে সমাপ্তি ঘটে চৈত্র-সংক্রান্তির শেষ দিন। চৈত্র মাসে হয় বলে এ উৎসবকে চৈত্রপয়ম বা চৈত্র-বুৎসবও বলা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবাই এ উৎসবে যোগ দেন, তবে 'বালা' নামক এক শ্রেণির হিন্দু চড়ক পূজার প্রধান আচার আচরণ পালন করে থাকেন। গ্রামের মধ্যবর্তী কোনো ঘরে, মন্দিরে বা কখনো গ্রামের শেষপ্রান্তে বড় গাছের নিচে উৎসবের স্থান নির্ধারণ করা হয়, যাকে বলা হয় 'থান'। ওই থানে বা মন্দিরে একটি চিত্রিত কাঠের আসন পেতে, মাঝে একটি ত্রিশূল গেঁথে, আসনের চারপাশে লোহার পেরেক ঠুকে রাখা হয়।

পরবর্তীকালে নানা আনুষ্ঠানিকতায় আসনটি পানি, দুধ, তেল ও ঘি দিয়ে ধুয়ে, তেল-সিঁদুর মাখিয়ে চৈত্র মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে পূজারিরা আসনটিকে থানে বা মন্দিরে স্থাপন করেন। অঞ্চল বিশেষে এই আসনকে পাট বা সিংহাসনও বলা হয়। রিয়াজুল হক উল্লেখ করেন, উৎসব চলাকালে প্রতিদিন পাট-ভক্তরা আসনটি মাথায় নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, বাড়ির মাঝ দুয়ারে পাটটি নামিয়ে রাখেন এবং ঢাক, ডোল, কাঁসর সহযোগে পাটের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচ গানে মেতে ওঠেন। আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে গৃহকর্তা পাটটিতে তেল সিঁদুর মাখিয়ে, গায়কদের ধামায় চাল-ডাল দান করেন। এভাবে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ঘুরে কখনো পনেরো দিন, কখনো সাত দিন অতিবাহিত হবার পর চৈত্রসংক্রান্তির দিন মূল থানে প্রধান নগুরুর পরিচালনায় নানা রকম আচার পালনের মধ্য দিয়ে সংগৃহিত চাল-ডালে খিচুরি রান্না করে ভক্তদের প্রসাদ দেয়া হয়।

চৈতপূজার উৎসবে অংশগ্রহণকারী বালা ও গুরু উৎসব চলাকালীন পক্ষকালব্যাপী বিশেষ নিয়ম পালন করেন। বাংলাদেশে এ উৎসব বিলুপ্তির পথে হলেও, একেবারে বিলুপ্ত হয়নি বলে উল্লেখ করেন রিয়াজুল হক।

ঋতুভিত্তিক উৎসবের ঐতিহ্য : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ নয়। সমাজবিজ্ঞানী বা নৃতাত্ত্বিকদের কাছে প্রত্যয়টির বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় রয়েছে; কিন্তু এর আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপন স্পর্শকাতর ও নাজুক বিষয়। তারিক মনজুর (২০০৫) লিখেছেন:

> আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিজেদের জীবনাচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে যথাযথ অনুসরণের জন্য প্রবলভাবে সচেষ্ট থাকে। ... স্বীয় কৃষ্টি-কালচারের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর থেকে পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য এদেরকে সহজেই আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। অধিকন্তু জাতিসত্তার বাইরে বিবাহরীতি না থাকায় বংশপরম্পরায় এদের দৈহিক কাঠামোর তেমন রদবদল হয় না। সামাজিকভাবে আদিবাসীরা মূলত দলবদ্ধ থাকে এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি লক্ষ করা যায়। (তারিক মনজুর, ২০০৫)

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পালিত বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত উৎসব হলো বর্ষবরণের উৎসব। নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টির চর্চা ও লালনে, পহেলা বৈশাখ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের কাছে। জাতিভেদে এ উৎসব পালনের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা থাকলেও, বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ নতুন বছর পহেলা বৈশাখকে বরণ করে থাকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মাঝে।

বাংলা নববর্ষ ও চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়িরা বৈসাবি উৎসব পালন করে থাকে। সঞ্জীব দ্রং (২০০১ : ৩৯৯) উল্লেখ করেন, ত্রিপুরাদের বৈসুক, মারমাদের সাংগ্রাই, চাকমাদের বিজু – এই নিয়েই বৈসাবি। বৈসাবি তিনটি ভাগে পালন করা হয়। ত্রিপুরাদের হাড়ি বৈসুক, বৈসুক মা ও আতাদং। মারমাদের প্যেইংছোয়াই, আক্যা বা আক্যাই ও আতাদা বা আপ্যাইং। আর চাকমাদের ফুল বিজু, মূল বিজু ও গজ্যাপজ্যা দিন।

হাড়ি বৈসুক, প্যেইং ছোয়াই

ফুল বিজু, প্যেইংছোয়াই বা হাড়ি বৈসুক বৈসাবির প্রথম দিন পালিত হয় বলে জানান সঞ্জীব দ্রং (২০০১ : ৩৯৯)। চৈত্রমাসের শেষের তারিখের আগের দিন এ উৎসব শুরু হয়। সেদিন খুব ভোরবেলা পাহাড়িরা ফুল সংগ্রহ করে বাড়িঘর ফুল দিয়ে সাজায়। পাহাড়ি কৃষকেরা পাড়ার আঙ্গিনায়, জুম ক্ষেতে হাঁস-মুরগির জন্য শস্যদানা ও বীজ ছিটিয়ে দেয় এবং গবাদি পশুকে ফুল দিয়ে সাজায়। এদিন ত্রিপুরারা বিশেষ এক প্রকার গাছের পাতার রস আর হলুদের রস মিশিয়ে গোসল করে। তারপর নিজেদের শুদ্ধ করে পাহাড়ি জনগণ ক্যাং বা মন্দিরে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের পুষ্প পূজা করে।

পুরনো বছরের অমঙ্গল, পাপ, কালিমা ধুয়ে মুছে নিজেদের পূতপবিত্র করে তোলাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য। এর পর দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির জন্য পিঠা, পাঁজন তরকারি ও অন্যান্য সুখাদ্য তৈরির আয়োজন চলে ঘরে ঘরে।

বৈসুক মা, আক্যা বা মূল বিজু

চৈত্রের শেষ দিনে এ অনুষ্ঠান পালিত হয় উল্লেখ করে সঞ্জীব (২০০১ : ৪০০-৪০১) বলেন, বৈসাবির মূল অনুষ্ঠান হয় এ দিনেই। চৈত্র সংক্রান্তির দিন অতিথি আপ্যায়নসহ ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা ও নাচ-গানের আয়োজন করা হয়। একই দিনে মারমা যুবক-যুবতীরা একে অপরকে রঙিন পানি ছিটিয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে। মনে করা হয়- এর মাধ্যমে পুরাতন বছরের সমস্ত দুঃখ, গ্লানি, হতাশা রঙিন পানিতে ধুয়ে মুছে যায় এবং নতুন বছরে নব উদ্যমে জীবনের কর্ম সম্পাদন করা যায়। চৈত্র সংক্রান্তির এই দিনেই ত্রিপুরাদের গরাইয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়। নতুন বছর যেন শুভ হয়, মঙ্গল বয়ে আনে মানুষের জীবনে, পাহাড়ে, জুম ক্ষেতে যেন ভালো ফসল হয়, বন্যপশুর হাতে কোন জীবন বিপন্ন না হয়, রোগবালাই যেন গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে – এ রকম বহুবিধ উদ্দেশ্য নিয়েই ত্রিপুরারা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে (ছেলেরা ধুতি, জামা, কোমর বন্ধনী, হাতে গামছা, মাথায় কাপড় এবং মেয়েরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক রিনাই, রিসা ও কোমর বন্ধনী পরিহিতা) দেবতা 'গরয়ার' উদ্দেশ্যে এই নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গড়াইয়া নৃত্যানুষ্ঠান কতদিন চলবে তা ঠিক করে দেন ত্রিপুরা 'আচাই' পুরোহিত। নৃত্যগীত শেষে ত্রিপুরা গৃহস্থরা দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগি, চাল ও টাকাপয়সা দান করে।

চাকমাদের জীবনে সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান বিজু বলে জানান সঞ্জীব (২০০১ : ৪০২)। তিনি উল্লেখ করেন, চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষের সময় এ উৎসব পালন করা হয়। অতীতে এউৎসবের সময় চাকমা যুবক-যুবতীরা বুদ্ধ মহামুনির মেলায় মানত করতো, ভগবানকে পূজা দিত। লোকশ্রুতি আছে অতীতে এখান থেকেই তারা তাদের জীবন সঙ্গী বেছে নিত। পাশাপাশি, তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীরাও চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখের দিন উৎসব পালন করে (সঞ্জীব, ২০০১ : ৪০২)। তাদের 'জাদি পৈ' উৎসবে মন্দিরের চারদিকে নৃত্যগীতের মাধ্যমে সুখী জীবনের প্রার্থনা করা হয় এদিনে।

আতাদং, আপ্যাইং বা গজ্যা পজ্যা দিন

চৈত্র সংক্রান্তির শেষ লগ্নে পুরাতন বছরের বিদায় বেলা ঘনিয়ে আসে, পহেলা বৈশাখ জানান দেয় তার শুভ আগমনী। নববর্ষের দিনে পালন করা হয় আতাদং, আপ্যাইং বা গজ্যা পজ্যা উৎসব, এমন তথ্য দেন সঞ্জীব। আগের দুদিনের অনুষ্ঠান শেষে এদিন পাহাড়ি গৃহস্থরা নিজ বাড়িতে বিশ্রাম নেন। অনেকে ভিক্ষুদের

নিমন্ত্রণ করে এনে মঙ্গল সূত্র শ্রবণ করেন। তাদের বিশ্বাস এতে আগামী দিনের সব অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। পহেলা বৈশাখের দিনেই পাহাড়ি জনগণ জগতের সকল মানব জাতির সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য প্রতিটি মন্দিরে, ক্যাং ঘরে হাজার বাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। (সঞ্জীব, ২০০১ : ৪০২)

রাখাইন সম্প্রদায় তাদের সামাজিক উৎসব সমূহের মধ্যে এই 'সাংগ্রেং পোয়ে' বা সংক্রান্তি (চৈত্র সংক্রান্তি) উৎসব বা বর্ষবরণ উৎসবকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে পালন করে থাকে। এই উৎসব অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে খুবই উপোভোগ্য বলে উল্লেখ করেন মুহম্মদ নূরউল ইসলাম (২০০১ : ৪০৩-৪০৭)। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, রাখাইন সম্প্রদায় রাখাইন বর্ষের শেষে ও নববর্ষের শুরুতে ৩-৪ দিনব্যাপী নববর্ষ উৎসব পালন করে থাকে।

রাখাইন সম্প্রদায়ের সর্বস্তরের লোকজন নিজেদের উজাড় করে দিয়ে বর্ষবরণ উৎসব করে থাকে। চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী বা অন্য পেশাজীবী লোকেরা বর্ষবরণ করার জন্য নিজের শহর বা গ্রামে ফিরে আসে এবং পরিবারের সাথে মিলিতভাবে বর্ষবরণ উৎসবে মেতে ওঠে। এ উপলক্ষে কেউ যোগাড় করে পিঠা বানানোর উপকরণ, কেউ তৈরি করে নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ। সকলেই নিজেদের আবাসস্থল সাধ্যমত পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় করে তোলে, বলে উল্লেখ করেন নূরউল ইসলাম। নূরউল ইসলাম (২০০১ : ৪০৪) লিখেছেন, বৌদ্ধ ধর্মীয় ভিক্ষু (পুরোহিত) এবং জ্যোতিষীরা গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে সাংগ্রেং এর দিন নির্ধারণ করেন। এই সাংগ্রেং পোয়ে বা সংক্রান্তি উৎসবের প্রধান তিনটি দিকের উল্লেখ করা হয় : ১. ধর্মীয় আচারাদি পালন ২. আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ ও উপোভোগ এবং ৩. রাখাইন সংস্কৃতির বিকাশ ও তা পালন করা।

রাখাইন সম্প্রদায় বছর শেষের তিনদিন পূর্ব হতে সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব পালন করে থাকে। প্রথমদিন বৌদ্ধ মন্দিরের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় শোভাযাত্রা এবং বুদ্ধের স্নান উৎসবে সাংগ্রেং পোয়ে এর শুরু। পরের দুদিন শীল গ্রহণ, উপবাস ব্রত পালন ও ধর্মীয় আচারে দিনটি উদযাপিত হয়। মূলত চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনগুলো বহু প্রতিক্ষিত। যে দিনগুলোয় চলে 'রিলং পোয়ে' বা জলকেলি বা পানিখেলা উৎসব। এই জলকেলি উৎসবের একটি উপোভোগ্য অংশ 'ছেংগ্যই' নামে গান, যা রাখাইন সমাজের অনিয়ম ও বিশৃঙ্ক্ষলাকে শুধরে নিয়ে, নিজেদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখার আহ্বান জানানো গান। (নূরউল, ২০০১ : ৪০৫-৪০৬)

মূলত ফেলে আসা দিনের সমস্ত কালীমা ধুয়ে মুছে অনাগত দিনের প্রসন্নতার জন্য জলের এই বিচ্ছুরণ, তরুণ-তরুণীদের প্রাণের এই উচ্ছাস। এ উৎসবে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য একই প্রার্থনাস্থলে মিলিত হয়।

একসময় সাংগ্রেং উৎসবের অংশ হিসেবে কক্সবাজরের বিভিন্ন গ্রামে নৌকা বাইচ, কুস্তি প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হতো, উল্লেখ করে নূরউল ইসলাম (২০০১ : ৪০৭) বলেন, আর্থিক

সীমাবদ্ধতা, নৃগোষ্ঠীদের সংখ্যা লঘু থেকে লঘুতর হয়ে যাবার কারণ আর পরিবেশের নববৈরীতায় এই উৎসবের রং অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে ।

সাঁওতাল

সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ নৃগোষ্ঠী। তাদের বাসস্থান মূলত উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, সাঁওতালরা বহুকাল যাবত বসবাস করে আসলেও অস্ট্রিকভাষী এই জনগোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে কখন কীভাবে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয় এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর আছে। বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি মাযহারুল ইসলাম (২০০৭ : ১৪, ১৫) লিখেছেন, সাঁওতাল কথাটির উদ্ভব ঘটেছে সুতার (Soontar) থেকে। কারো মতে, তারা দীর্ঘকাল 'ষাঁওত' বা সমভূমিতে বাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয়ে পড়ে সাঁওতাল। আবার অনেকে সাঁওতালদের পূর্ব জাতিগত পরিচয় 'খেরওয়ার' বলেও অভিহিত করে থাকেন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সাঁওতালের পরিবর্তে 'সানতাল' বলতে পছন্দ করে। যা অপভ্রংশ হয়ে 'সান্দাল' উচ্চারিত হয়। ধারণা অনুযায়ী সাঁওতালরা পাক-ভারতের প্রাচীনতম আর্যদের অনেক আগে থেকেই এদেশে বাস করছে। তবে ঠিক কখন এবং কোথা থেকে এদের আবির্ভাব তা নিয়ে পডিণ্ডতদের মতদ্বৈততা সত্ত্বেও বলা যায়, তারা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলিয় (প্রোটে অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর।

সাঁওতালরা অত্যন্ত আমোদপ্রিয় (মাযহার, ২০০৭ : ২৭)। জীবনঘনিষ্ঠ উৎসব বলতে যা বোঝায় তা সাঁওতালী সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। তাদের নৃত্য, গীত, কোমর জড়াজড়ি করে সম্মিলিত নাচ, ঢোল, মাদল, বাঁশির সুর সবই যেন জীবনের মূর্ত প্রতীক। জীবন থেকে উঠে আসা এই সংস্কৃতি আজও অমলিন, উল্লেখ করে মাযহারুল ইসলাম তরু লিখেছেন :

> ফাল্গুন মাস থেকে তাদের [সাঁওতালদের] বছর গণনা শুরু হয় এবং মাঘ মাস পর্যন্ত তাদের উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বণ ছাড়াও অনেকগুলো ব্রত উদযাপিত হয়ে থাকে। তাদের উল্লেখযোগ্য পূজা পার্বণের মধ্যে ফাল্গুন মাসে বাহা উৎসব, চৈত্র মাসে বোঙ্গাবুঙ্গি উৎসব, বৈশাখ মাসে হোম, জ্যৈষ্ঠ মাসে এরোরা সার্দার, আষাঢ় মাসে হাড়িওয়া, ভাদ্র মাসে ছাড়া, আশ্বিন মাসে দিবি, কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে নওয়াই এবং পৌষ মাসে সোহরাই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। (মাযহারুল, ২০০৭ : ৩৫)

সোহরাই

সাঁওতালদের সর্ববৃহৎ উৎসব, যা পৌষ ও মাঘ মাসে উদযাপিত হয়। সোহরাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আনন্দের উৎসব। এ উৎসব তিনদিন থেকে সাতদিন বা তার বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত হতে পারে। আমন ধান ঘরে তোলার পর দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই উৎসব, উল্লেখ করে মাযহারুল আরও লিখেছেন :

> সোহরাই উৎসবে সাতদিন ধরে চলে পূজা, নাচ-গান, ভোজসভা, পচানি বা হাঁড়িয়া খাওয়া ইত্যাদি। যুবক-যুবতীরা বিচিত্র সাজে – মেয়েরা শাড়ি পরে, খোঁপায় শিমুল বা মহুয়া ফুল গুঁজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচ গান করে। উৎসবের সময় তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। সাঁওতাল সমাজের মাঝি, জগমাঝি, পারাণিক, নাইকে ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ সময় শোভাযাত্রা বের করে এবং ঘরে ঘরে পিঠা-পুলি তৈরি হয়। বিভিন্ন পশু, মুরগী, কবুতর বলি দেয়া হয় এবং তার মাংস রান্না করে সকলকে খাওয়ানো হয়। (মাযহারুল, ২০০৭ : ৩৬)

সোহরাই উৎসবের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে পর্যায়ক্রমে মাছধরা, প্রতিবেশির বাড়িতে আহার করার আনুষ্ঠানিকতা, দলবেঁধে শিকার, নানা লোকখেলার আয়োজন এবং ভোজ এই উৎসবের অংশ। সোহরাই উৎসবের প্রধান পূজো প্রথম দিনেই হয়, যে পূজো দেখা সাঁওতাল মেয়েদের নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন মাযহার।

বাহা উৎসব

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসবগুলোর আরেকটি বাহা উৎসব। সাঁওতালী ভাষায় এ শব্দের অর্থ ফুল। ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় বিধায় অনেকে এ উৎসবকে বসন্ত উৎসব বা পুষ্প উৎসব বলেও অভিহিত করেন। বাহা উৎসবের পর থেকে সাঁওতাল মেয়েরা তাদের খোঁপায় ফুল পরতে পারেন, উৎসবের আগে ফুলের ব্যবহার করা যায় না বলে উল্লেখ পাওয়া যায় মাযহারুল ইসলামের (২০০৭ : ৩৭) লেখায়। অতি আড়ম্বড়ে উদযাপিত তিনদিনের এ উৎসবে পূজা, শিকার যাত্রা, নাচগান, ভোজপর্ব ও হাঁড়িয়া পানের প্রাচুর্য উল্লেখযোগ্য।

এরো উৎসব

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফসলের বীজ বোনা উপলক্ষে সাঁওতাল সম্প্রদায় এরো উৎসব পালন করে থাকে। ভালো ফসলের কামনায় সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে কলা, বাতাসা, মুড়ি ইত্যাদি দিয়ে এই পূজা সম্পন্ন হয়। পূজা শেষে ফসলের গান গাওয়া এরো উৎসবের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেন মাযহার (২০০৭ : ৩৮)।

ওরাওঁ

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চল তথা উত্তরাঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য জনজাতি ওরাওঁ। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, ওরাওঁ জনগোষ্ঠী বহুকাল যাবত এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। মাযহারুল ইসলাম (২০০৭ : ৪৪) জানান, বিগত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওরাওঁ বসবাস না করলেও বর্তমানে তাদের

সংখ্যা লক্ষাধিক। ওরাওঁদের মূল পেশা কৃষিকাজ হলেও, তারা চা বাগানেই তারা দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত। আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যে তারা উজ্জ্বল। ওরাওঁ সমাজে পার্বণিক উৎসব মূলত চারটি : ১. সারহুল, ২. কারাম, ৩. পশু উৎসব, ৪. খারিয়ানি, ৫. ফাগুয়া, ৬. সোহরায়।

সারহুল উৎসব

সারহুল পার্বণের মূল তাৎপর্য সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিয়ে। এই উৎসব সাধারণত চৈত্র মাসে উদযাপন করা হয়। মাযহারুল ইসলামের (২০০৭ : ৬৪) লেখায় পাওয়া যায়, শীতে ঝরা পাতার বিদায়ের পর চৈত্র মাসে নতুন পাতায় ছেয়ে যায় বন। অনেক গাছের পাতা ওরাওঁরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উৎসবে পূজা-অর্চনার মাধ্যমে তারা গ্রাম রক্ষাকারী আত্মাকে স্মরণ করে। পার্বণে প্রতিটি পরিবার তাদের পূর্ব পুরুষদের কথা স্মরণ করে এবং পরিবারের সদস্যদের সুস্থতা কামনায় নিজ গৃহে পূজার আয়োজন করে। আয়োজনে খাদ্য ভোগ, মোরগ বলি দেয়া এবং নাচগান ওরাওঁ সংস্কৃতির অঙ্গ।

কারাম উৎসব

ভাদ্রমাসে ওরাওঁরা তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব কারাম উদযাপন করে। মাযহারুল ইসলাম (২০০৭ : ৬৫) লিখেছেন; বিশ্বাস মতে কারাম বৃক্ষ হল রক্ষাকর্তা। কথিত আছে, একসময় শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ওরাওঁরা জঙ্গলে পালিয়ে কারাম বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নেয়। সে সময় কারাম বৃক্ষ যেন তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এমন ঘটনা স্মরণে উৎসবের সময়, কারাম গাছের ডাল কেটে ঘরের উঠানে পোঁতা হয় এবং উৎসব শেষে তা জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কারাম মিলন ও আনন্দের উৎসব কারণ উৎসবে নাচ, গান ও কাহিনীভিত্তিক পালাগান মঞ্চস্থ হয়। উৎসব রীতিতে অবিবাহিত যুবক যুবতীরা উপবাস করে আর বিবাহিত মেয়েরা শ্বশুর বাড়ি থেকে ফল-মূল, কাপড় ও উপঢৌকনসহ বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে।

সোহরাই উৎসব বা পশু উৎসব

কারাম উৎসবের পরপরই কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ওরাওঁরা সোহরাই উৎসব পালন করে। তিনদিনের সেই উৎসবে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা, গৃহপালিত পশুকে স্নান করানো, ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করা, সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং মোরগ বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এই তথ্যের সাথে মাযহারুল ইসলাম (২০০৭ : ৬৫-৬৬) যোগ করেন, 'গবাদি পশু, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যেই মূলত এই উৎসব পালন করা হয়।'

খারিয়ানি উৎসব

অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান ওঠার পর ধান মাড়াইয়ের জায়গাকে পবিত্র করার জন্য ওরাওঁরা এ উৎসব পালন করে থাকে, বলে উল্লেখ করেন মাযহারুল ইসলাম (২০০৭ : ৬৬)।

ফাগুয়া

ফল্গুনী পূর্ণিমায় ওরাওঁরা নববর্ষ 'ফাগুয়া' উদযাপন করে। এই উৎসবে প্রচুর ফাগ বা আবির ব্যবহৃত হয়- উল্লেখ করে মাযহারুল ইসলাম (২০০৭ : ৬৬-৬৭) জানান, উৎসবের নানা আনুষ্ঠানিকতায় পাহান বা পুরোহিত এক সাথে শিমুল, ভেরেন্ডা ও জিগা গাছের শাখা কেটে, এর সাথে খড়কুটা জড়ো করে আগুন জ্বালায়। এ সময় তারা প্রার্থনা জানায় বিগত বছরের অকল্যাণ বিদায়ের সাথে সাথে নতুন বছরের অশুভ যন্ত্রণাও দূর হয়ে যাবার। সেই সাথে রোগ, শোক থেকে মুক্তি পেতে তারা খড়ের ছাই শরীরে মাখে। এমনি উৎসবের মধ্য দিয়ে পূর্ণিমা রজনী অতিক্রান্ত হয়।

এছাড়া, নতুন ঘর তুললে, গরু-মহিষ ক্রয় করলে, সন্তানের জন্ম হলে বা বড় উৎসবের আগে মঙ্গল কামনায় ওরাওঁরা 'ডানডা কাটনা' উৎসব করে থাকে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নবান্ন উৎসব

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে আয়োজিত নবান্ন হলো আনন্দের উৎসব। অতি প্রাচীনকাল থেকে নবান্ন উৎসব আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এ অনুমান ভুল নয়, এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করে প্রদ্যোত কুমার মাইতি বলেন (২০১৪ : ৪৫), নবান্ন উৎসব বাংলাদেশের বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়; অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যেও তা লক্ষ করা যায়। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের এবং বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত কাসকেন্দ গ্রামের সাঁওতালরা অগ্রহায়ণ মাসে ঘরে ঘরে নতুন ধানের পূজার আয়োজন করে। 'নাওয়াই' উৎসব নামে পরিচিত এই অনুষ্ঠানে সাঁওতাল পরিবারের কর্তারা নিজ নিজ জমি থেকে কিছু পরিমাণ ধান কেটে গ্রাম্য থানে (জাহের থান) দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। মূলত পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ কামনার উদ্দেশ্যেই নতুন ফসল নিবেদন বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও নবান্ন উৎসবের রূপান্তর দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের মেচ বা বোড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নবান্ন উৎসবের নাম 'আংখাম গীলে জানায়'। মূলত অগ্রহায়ণ মাসেই প্রথম দিন বা সে মাসের যে-কোনো শুভ দিনে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। ...তাদের বিশ্বাস,

এই উৎসবে রান্না ভালো হলে সারা বছরই রান্না ভালো হবে। রাঙা জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবান্নকে বলা হয় 'মায় পিদান বানি'। এ উপলক্ষে নতুন ধানের চাল দিয়ে 'রন্তুক' দেবীর ঘট পূর্ণ করে দেবীকে উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত। নাগেশিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে নবান্ন উৎসবের নাম 'নাওয়া'। অসুর কিংবা ওরাওদের নবান্ন উৎসবের নাম নাওয়াখানি। আর কিসান সম্প্রদায়ের লোকেরা একে বলে নাওয়াখালি। খোন্দ সমাজের জনপ্রিয় উৎসব নবানন্দ, যা নবান্ন উৎসব হিসেবেই প্রচলিত। (বিজনকুমার, ২০১৪ : ৬৩)

এই উৎসবের মধ্য দিয়ে শস্য-দেবীকে তুষ্ট করার প্রয়াস যেমন থাকে, তেমনি নতুন শস্য প্রাপ্তির আনন্দ প্রকাশ পায়। কৃষিজীবী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা নতুন ধান তোলার পর আনন্দে মেতে ওঠেন সমবেতভাবে।

দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে একটি দূরবর্তী সতন্ত্রসত্তা হিসেবে দেখা হয়। তাদের নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিকশিত হলে অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি ভাগ্যোন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঋতুভিত্তিক উৎসবের বিবর্তন

বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋতুভিত্তিক উৎসব উদ্‌যাপনের দিনটি যেন প্রাণপ্রাচুর্যে জেগে ওঠার আহ্বান। বহু কাঙ্ক্ষিত উৎসবের দিনটিকে কেন্দ্র করে তার উদ্‌যাপন রীতিতে নতুন নতুন ভাবনা,অনুষঙ্গ, বৈচিত্র্য যেমন যুক্ত হয়েছে, একই সাথে বেশ কিছু উৎসবে বিলুপ্ত হয়েছে অনেক রীতি-প্রথা, আয়োজন। উৎসবের আদি রূপ ছাপিয়ে বিবর্তিত রূপ চলমান সমাজব্যবস্থার একটি খণ্ডচিত্র। যেখানে সামাজিক উত্থান-পতন প্রভাবিত করে সমাজ সংশ্লিষট সববিছুকে। উৎসবে ঘটনা নির্ভর তথ্যগুলো হয়ে ওঠে ইতিহাসের অংশ।

উৎসবের রূপ বদলের বিষয়ে সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তাঁর মতে, মৌলিক যে কোনো কিছু, কালের অনন্ত প্রবাহে যেমন তার কৌলিন্য মলিন করে, তেমনি উৎসবেও আসে পরিবর্তন, পরিবর্ধন। বিবর্তনের অবশ্বম্ভাবী স্রোতে উৎসবের বিকাশ অনেকক্ষেত্রে হয় সংকুচিত। তাই তিনি আশঙ্কা করেছেন :

> হায় এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এতকালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনীমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারও স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্র প্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৯৮)

উৎসবের বিবর্তন হয় কেন

উৎসবের আদি রূপের পরিবর্তন কেন হয়, অর্থাৎ এর বিকাশ-বিবর্তন প্রসঙ্গের উত্তর খুঁজেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। তাঁদের ধারণা মতে, মানুষের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য এবং অবশ্যম্ভাবী এক প্রক্রিয়া। মানব প্রজাতির বর্তমান রূপ যদি তার শত কোটি বছরের বিবর্তিত রূপ হয়ে থাকে, তবে সময়ের সাথে মনুষ্য উৎসবের আদিম রূপের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রাণীজগতে বড় ভূমিকা রেখেছে। সেই সূত্রে বলা যেতে পারে, সময়ের সাথে প্রাণীজগতের অবস্থার পরিবর্তন তার আনুষঙ্গিক সব কিছুকেই প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করবে। উৎসবও সময়ের সাথে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তিত হবে, নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে, তার সফল বৈশিষ্ট্যগুলো টিকে থাকবে, দুর্বল অংশগুলো বিলুপ্ত হয়ে নতুন কাঠামো গঠন করবে।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০১৮) 'জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ' নিবন্ধে লিখেছেন, মানুষ নিজের অজান্তেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলে। এই সৃষ্টির মাঝে থাকে উন্নতির সচেতন চেষ্টা। মূলত মনোগত উন্নতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির যৌথ চেষ্টাতেই মানুষের সংস্কৃতি। তিনি যোগ করেন, ডারউইনের অনুসরণে স্পেন্সার তাঁর 'Evolution and Ethics' গ্রন্থে মানুষের নৈতিক আচরণের ও নৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের বিবরণ রচনা করেছেন। সেখানে উল্লেখ্য; ইতিহাসের ধারায় পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নীতিতে আছে অভিযোজন – গ্রহণ-বর্জন। তাই আবুল কাসেম মনে করেন, নৈতিক উন্নতির জন্য জ্ঞানগত ও চিন্তাগত উন্নতির সঙ্গে পরিবেশগত উন্নতি সাধনও অপরিহার্য। মানুষ মাত্র সেই জৈবিক সামর্থ্যের অধিকারী, যার বলে সে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা নিজের সংস্কৃতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে নিজেদের সংস্কৃতির উন্নততর পরিচয় বহন করতে সমর্থ্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা-সূত্রে এ বিষয়টি সহজেই অনুধাবনীয়, মানুষের পারিপার্শ্বিক প্রভাব তার উৎসবকেও প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে।

রূপান্তর উৎসবের এক প্রবল সহগামী। লোকমানসের বৈচিত্রগ্রাহী প্রবণতা আর ধর্মের আধিপত্যে উৎসবের রূপান্তর ঘটে বলে মত দেন আতোয়ার রহমান (১৯৮৫ : ৭৫-৭৬)। সেই সাথে তিনি আরও যোগ করেন মানব মনের পুরনো সংস্কারের নব সংযোজন প্রবণতা এবং নব নব আনন্দভোগের বাসনার বিষয়টি। উদাহরণ হিসেবে তিনি লিখেছেন :

> লৌকিক ধর্মের সাথে অভিজাত ধর্মের বিরোধ মানবেতিহাসের এক পুরানো, দীর্ঘ কাহিনী। অভিজাত ধর্ম চেয়েছে টিকে থাকতে। এই বিরোধ ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের ক্ষেত্রেও। সত্যি, বিরোধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাজয় ঘটে লৌকিক উৎসবের। কিন্তু– এটা লৌকিক ধর্মের সাথে তার আচার অনুষ্ঠান দমনে ব্যর্থকাম অভিজাত ধর্মের আপোষের নামান্তর। উৎসবের ক্ষেত্রে লৌকিক আর অভিজাত ধর্মের বিরোধের পরিণতিতে আপোষ বস্তুত অতি ব্যাপক। (আতোয়ার ১৯৮৫ : ৭৬-৭৭)

ধর্মের সাথে উৎসবের মতাদর্শগত জটিলতায় সামাজিক যে প্রভাব, সে বিষয়টি স্পষ্ট হয় ইতিহাসে দৃষ্টি ফেরালে। দেখা যায়, ইংরেজ ও বাঙালিদের মধ্যে একত্রীকরণের ফলে একটি ভিন্ন সভ্যতা থেকে রীতিনীতি গ্রহণের ধারা গড়ে ওঠে। যার ফল – বাংলা সমাজে পশ্চিমা মতাদর্শ, ভাবভঙ্গি, অভ্যাস ও শিষ্টাচারের বর্ধিত প্রভাব। বিত্তবান হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার এবং একটি সুসংজ্ঞায়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশও এক সামাজিক পরিবর্তন। কে. এম. মোহসীন বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

> উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে বাংলার হিন্দু সমাজ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের জন্য একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধাব বিবাহের প্রচলন, মহিলাদের জন্য শিক্ষা প্রভৃতি দাবিসমূহ পাশ্চাত্যের প্রভাবের ফলেই উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছিলো। মিশনারিদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের প্রবাহকে থামানোর জন্য ধর্মীয় সংস্কারের ফলে কোলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) গঠিত হয়। এ সংগঠন পরবর্তী পঞ্চাশ

> বছরে বাংলার অন্যান্য এলাকায় বিস্তার লাভ করে। ইংরেজি শিক্ষা, খ্রিস্টান ধর্ম, উদারনৈতিক, মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রের ভাবধারার প্রভাবে সমাজে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় যা বাঙালিদের কাছে রেনেসাঁ বলে অভিহিত। (মোহসীন, ২০০৭ : ৬৩০)

আধুনিক সেই সমাজ ব্যবস্থায় সময়ের প্রয়োজনে পালা বদল ঘটেছে অনেক কিছুর মতো উৎসবেরও। তবে, কিছু প্রাচীন উৎসব সমাজের বিবর্তন- পরিবর্তনের ঝড়-জলে মাথা বাঁচিয়ে কার্যত অকৃত্রিম রয়ে যাবার উদাহরণও দুষ্প্রাপ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আতোয়ার রহমান ইউরোপে-আমেরিকার কৃষিজীবী সমাজের বসন্তকালীন 'মে পোলের' উৎসবের উদাহরণ তুলে ধরেন।

উৎসবের এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বদলে গেছে ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলোর স্বরূপও। ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আবেদন, আগের সেই প্রাণস্পন্দন, সেই উৎসাহে ভাটা পড়েছে অনেকটাই। নিয়ম মেনে অংশ নেয়ার বাইরে বাঙালির সব ধর্মের সব বর্ণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস, বিপুল আনন্দ আয়োজন যেন বিলীন হয়ে গেছে অনেকটাই। এই সময়ে প্রকৃত অন্তরতাগিদ কতটুকু ধাবিত করে বাঙালিকে, সে প্রশ্নই যেন মুখ্য হয়ে ওঠে।

নববর্ষের বিলুপ্ত ঐতিহ্য

সারা বাংলাদেশেই পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদযাপনের রীতি এখন বিভ্রান্ত, পুরোটা না হলেও অন্তত অংশবিশেষ, এমন মত আতোয়ার রহমানের। নববর্ষ নিয়ে এখানে কোনো ঐতিহ্যের সন্ধান নেই, উপলক্ষ পালনে আনুষ্ঠানিকতাও নির্দিষ্ট নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন :

> এক কালে সবই ছিল। এখনো যার জের মেলে জমিদারের সেরেস্তায় আর ব্যবসায়ীর গদিতে পাওনাগণ্ডার নতুন খাতার উদ্বোধনে। পণ্ডিতদের অনুযোগ একেবারে বেবুনিয়াদ নয়, – নববর্ষ বা বর্ষবরণের উৎসব একালের বাংলাভাষী অঞ্চলে ঐতিহ্যবর্জিত, কেবল পশ্চিমের অনুকরণে উদ্‌যাপিত এক সাংস্কৃতিক উৎসব। যার লক্ষ্য শুধুই আনন্দভোগ। হ্যাঁ, মহাব্রতর পরে এই-ই তার পরিণতি। (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ৪৬)

আতোয়ার রহমানের (১৯৮৫ : ৪৬) মতে, বাংলাদেশে এখন নববর্ষ এক বড় উৎসব এবং বেসরকারিভাবে জাতীয় উৎসব। এই উৎসব উদ্‌যাপনে আগ্রহী নয়, এমন সংস্থা, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান আজ বিরল। গ্রাম-বাংলায় পহেলা শৈখের অনুষ্ঠান যদিও অনেকাংশেই হালখাতায় সীমিত, শহরে এ-উৎসব বিপুল উৎসাহ আর আনন্দভোগের জন্য। নববর্ষেও প্রভাতে কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় তরুমূলে মাঙ্গলিক বা আবাহনমূলক গানের আসর, বাংলা একাডেমির মতো আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাঝে মাঝে তার সাথে আনন্দমেলা জাতীয় সমাবেশ, পাড়ায় পাড়ায় নৃত্যগীতের সভা, – বর্তমানে এই সবই উৎসবটির প্রধান ব্যাপার।

কিন্তু এদেশেরই মাটিতে ঐতিহ্য অবগাহনে নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপনের ইতিহাস বাঙালির আছে। সে-উৎসব আঞ্চলিক হয়েও জাতীয় এবং সর্বজনীন। যার প্রচলন এখনও দেখা যায় বাংলার পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলে বৌদ্ধ এবং উপজাতি সমাজে, এমন তথ্য উল্লেখ করেন আতোয়ার রহমান।

সময়ের সাথে হারিয়ে গেছে, প্রাণের সেই বৈশাখী মেলা – এমন আক্ষেপ করেছেন সৈয়দ হাসান ইমাম। তিনি এর কারণ হিসেবে মনে করেন; মেলার পণ্য মাটির পুতুল, কুমারের নিপুন হাতে তৈরি মাটির তৈজস, বাঁশ-বেতের গৃহস্থালি পণ্য, দশ গ্রামের দেখার মতো কৃষিপণ্য এসবকে হটিয়ে দিয়ে মেলায় এসেছে প্লাস্টিক, স্টিল কিংবা অন্য কোনো উপকরণের মেশিনে তৈরি পণ্য। পুতুল নাচের মঞ্চে পরিবেশিত হয় অর্ধনগ্ন পুতুল, যাত্রার বিবেকের পরিবর্তে নর্তকীর উদ্ভট নৃত্য, এসেছে ভিসিয়ার, জুয়া। মেলায় দেখা যাচ্ছে নেশার আয়োজন। তিনি যোগ করেন :

> নদী, সন্ত্রাস আর মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইতিহাস সমৃদ্ধ বর্ষবরণ কিংবা বর্ষবিদায়ের অনেকগুলো মেলা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছে। শত শত বছরের ঐতিহ্য ধরে রাখার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান অস্থির সময়ের ডামাডোলে যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ভিতর থেকে বাঙালির সংস্কৃতির মূল সুর উবে যাচ্ছে। অথচ একদিন এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামের সব কিছুর নেপথ্যেই ছিল আড়ং চৈত্রসংক্রান্তি কিংবা বর্ষবরণের মেলা। (হাসান, ২০০১ : ৩১৭)

গ্রামীণ জনপদে সন্ত্রাসের বিষ ছড়িয়ে পড়ার কারণে, একইসঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের কঠিন সংগ্রাম, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সরকারী এনজিওর টাকায় সৃষ্ট গ্রামের নব্য ধনিক শ্রেণির কারণেও মেলার অকাল মৃত্যু ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন হাসান ইমাম (২০০১ : ৩১৮)।

এদিকে সময়, চাহিদা এবং মানুষের রুচিবোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে বৈশাখী মেলার আদি চরিত্র ও চালচিত্র বেশ পালটিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে মিজানুর রহমান আফরোজ বলেন :

> 'কাগজের চশমা এবং বায়স্কোপ বাক্স' আজ আর ছেলে মেয়েদের আকর্ষণ করে না। সেদিনের বায়োস্কোপ বাক্সের স্থান এখন দখল করেছে ভিসিআর ও ভিসিপি'র প্রদর্শিত রঙিন ছবি। পুতুল নাচ থাকলেও সার্কাসের আয়োজন খুব একটা নেই। এখনও আছে হস্ত চালিত নাগর দোলা। হয়তো আগামীতে তাও সম্পূর্ণ যন্ত্র চালিত হয়ে যাবে। (মিজানুর,২০০১ : ২৮৯)

শারদীয় দুর্গাপূজায় বিবর্তন

বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের পূজামণ্ডপে সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। প্রতি বছর পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি নব কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি। একবিংশ শতকে প্রযুক্তির উৎকর্ষে আধুনিকায়ণ হয়েছে শিল্প। সেখানে পূজার প্রতিমা নির্মাণে সমসাময়িক

বিষয়গুলোই লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, প্রতিমার পোশাক পরিকল্পনা, অঙ্গসজ্জা, অলঙ্করণ, মঞ্চ কাঠামো, আলোক বিন্যাস বা তোরণ নির্মাণে যে অভূত পরিবর্তন, এমনটা আগে দেখা যেত না।

আগের দিনে পূজো মানে ঢাক-বাদ্যের শব্দ, এখন সেখানে এসেছে আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গ। এ বিষয়কে স্বাগত জানিয়ে শিপ্রা সরকার বলেন, প্রযুক্তির উৎকর্ষে এ পরিবর্তন স্বাভাবিক। এটা সমাজিক চাহিদা। তাই বলে ছোটবেলার আনন্দের জায়গাটা কখনই অমলিন হয় না। একসময় কারুপণ্য শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে প্রতিমার গঠন নির্মাণ করা হতো, এখন সেখানে এসেছে নতুন আঙ্গিক। এখন দেশপ্রেম, মাতৃত্বের পরিচয় প্রতিমায় যুক্ত করে নির্মাণ শৈলীকে এবং প্রতিমা মণ্ডপকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা থাকে। এর মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে বাঙালি। তবে এটুকু চেতনায় রাখা উচিত, বাঙালি যেন তার রুচি, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত না হয়। (শিপ্রা সরকার, সাক্ষাৎকার ৪)

সাতচল্লিশের দেশ ভাগের আগে পূর্ব বাংলা ও পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে আশির দশক পর্যন্ত দুর্গাপূজায় যাত্রা, কীর্তন, কবিয়াল, পালাগানের আসর বসতো। পূজার সপ্তমী থেকে নবমীতে সন্ধ্যা আরতীর পর আয়োজিত হতো এই আসর, এমন তথ্য পাওয়া যায়, রোর মিডিয়ায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গা পূজার ইতিবৃত্ত' নিবন্ধে। সেখানে পাপিয়া দেবী লিখেছেন, বর্তমানে ঢাকেশ্বরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, রামকৃষ্ণ মিশন, রমনা কালীবাড়ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পাশাপাশি কলাবাগান, উত্তরা ও বনানী পূজামণ্ডপে চোখে পড়ে বৈচিত্র, ঐতিহ্য আর নতুন ভাবনার প্রকাশ। কোথাও এক হাজার দুই হাত রয়েছে দেবী দুর্গার। কোথাও বা শুধুই হাজার। থিমের পূজায় কোথাও স্থান করে নিয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা, কোথাও আবার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ওপর ঘটে চলা নৃশংসতার কথা উঠে এসেছে।

পাপিয়া যোগ করেন, মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁওয়ে একমাত্র লাল বর্ণের দুর্গা দেবীর পূজা হয়ে থাকে। প্রায় ৩০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই ঠাকুর দর্শনে দেশ বিদেশের দর্শনার্থীরা ভীড় জমান। পুরনো ঢাকার তাঁতিবাজার ও শাঁখারি বাজারে রাস্তাগুলো অপ্রশস্ত বিধায় রাস্তার ওপরই বেশ উঁচুতে নির্মিত হয় বাঁশ কাঠের নানা বৈচিত্রপূর্ণ অস্থায়ী মণ্ডপ। মণ্ডপের নিচে দর্শনার্থীদের হাঁটার পথ। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরত্বে একটার পর একটা পূজা, চারিদিকে ঢাক, ঢোল, মাইকে বিরামহীন গানের ছন্দ। উৎসব ঘিরে আয়োজিত হয় মেলা। ধর্ম বর্ণের ভেদ নেই দর্শনার্থীদের মাঝে। 'বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গা পূজার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে আরও আছে :

> কোথাও মা দুর্গার বিভিন্ন রূপ, কোথাও সামাজিক সমস্যা, কোনো কোনো পূজা মণ্ডপের থিম 'গাছ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' আবার কোথাও রয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্যের গল্প। এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা কিংবা গ্রামের পূজাগুলোয় এখন সাবেকী ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক পূজার প্রচলনও শুরু হয়ে গেছে। (পাপিয়া, ২০১৯)

মূলত আশির দশকের পর গ্রামীণ মানুষের বিনোদনের ধারায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পূজায় আয়োজিত যাত্রাপালা, পালাগান, কবিয়াল বা কীর্তনের মতো ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বদলে স্থান করে নেয় বাংলা সিনেমার গান আর আধুনিক বাংলা গান, এমন তথ্যের উল্লেখ করে পাপিয়া লিখেছেন, এখন শহরে তো বটেই, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও পূজামণ্ডপে হিন্দি, বাংলা রক আর ব্যান্ডের গান চারপাশ প্রকম্পিত করে।

দেবীর অধিষ্ঠান রাজপুরী থেকে জনারণ্য, বারোয়ারি মণ্ডপ থেকে ক্লাব, পাড়া, মহল্লা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হবার এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন অমিত রায় চৌধুরী (২০২০)। রাইজিংবিডি.কম-এ প্রকাশিত 'সমাজ বিবর্তিত, উৎসব শাশ্বত' নিবন্ধে তিনি তাঁর ভাবনা তুলে ধরে লিখেছেন, প্রযুক্তির উৎকর্ষে শিল্পের আধুনিক ও রুচিস্নিগ্ধ পূজামণ্ডপ কখনো অতীতাশ্রয়ী বাঙালিকে নস্টালজিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূর অতীতে, মনোরম কোনো প্রাসাদ বা দেবালয়ে, কখনো সামসময়িক কোনো বিষয় ভাবনাকে ধারণ করে তিলে তিলে গড়ে তোলে আধুনিক শিল্পসুষমা। আবার কখনো কেতাদুরস্ত আধুনিক স্বেচ্ছাসেবক জানান দিয়ে যান, তাঁরা একবিংশ শতকের বাঙালি। সময়ের বিবর্তনে উৎসবের স্বরূপ বদলেছে। আধ্যাত্মিকতার আধিপত্য ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে, উৎসব হয়েছে প্রবল থেকে প্রবলতর। জীবনধারার পরিবর্তন পূজার আয়োজনে বৈচিত্র এনেছে, ঐতিহ্যনির্ভরতাকে ছাপিয়ে 'থিম বেইজড' পূজা গোটা ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর ঘটিয়েছে। জৌলুস, প্রতিপত্তি, প্রদর্শনবাদী পুঁজির দাপট বাঙালির স্বকীয় শিল্পীসত্তায় আঁচড় কাটতে পারেনি। সেভাবেই সব অন্তরায় কাটিয়ে দুর্গাপূজার কালোত্তীর্ণ ধ্রুপদী সৌন্দর্য বাঙালি অন্তরকে বর্ণময় করে তোলে আর বাঙালি বছরজুড়ে প্রতীক্ষায় দিন গোনে, সুরে মেতে ওঠার তীব্র বাসনায়।

'সমাজ বিবর্তিত, উৎসব শাশ্বত' প্রবন্ধে তিনি আরও লিখেছেন, ব্যক্তির বিত্ত ও বৈভবের জায়গায় এসেছে সমষ্টি, গোষ্ঠী ও শ্রেণির সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য। ব্যবস্থাপনায় অভিনবত্বের দিক তুলে ধরে লেখেন, উৎসবে যুক্ত হয়েছে পূজাপরিষদ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় স্বয়ং রাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, শিউলি, দোপাটি, গোলাপ, রঙ্গন ও গন্ধরাজের আগ্রাসী সৌরভ, বিচিত্রবর্ণের মনোহরা দ্যুতি, শ্রুতিস্নিগ্ধ ঢাকের বিরামহীন নিনাদ, আধুনিক বাংলা গানের মুগ্ধতা, চণ্ডীপাঠের মোহিনী আবেশ বাঙালি মননে সৃষ্টি করে এক অব্যক্ত চঞ্চলতা, নন্দনতত্ত্বের অভিসারে মত্ত হয়ে ওঠে বাঙালি শিল্পীসত্তা, ফল্গুধারার মতো মুক্ত হতে থাকে গল্প, উপন্যাস ছড়া কবিতা; মঞ্চস্থ হতে থাকে যাত্রাপালা কবিগান।

দুর্গাপূজার প্রতিমা আর মণ্ডপের নবায়ণের মতো পহেলা বৈশাখে চারুকলা অনুষদ আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রাও বছর বছর নতুন ভাবনায় প্রাণিত হয়, নতুন বহর নিয়ে। আলোাচনা দৃষ্টে এ কথা বলা যায়, উৎসব তার কিছু আয়োজন অপরিবর্তিত রেখে কালের সাথে সমন্বয় সাধন করে এসেছে।

নবান্ন : বিমর্ষ এক লৌকিক পার্বণ

বর্তমানে কৃষি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নবান্ন উৎসবের মতো লৌকিক পার্বণগুলোর ব্যাপকতাও আগের মতো নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে যেটুকু এখনো আছে, তা যেন গ্রামবাসী ও নগরবাসীর সাংস্কৃতিক চেতনাপ্রসূত। 'রূপান্তর যদিও উৎসবের এক প্রবল সহগামী, কিছু প্রাচীন উৎসব সমাজের বিবর্তন-পরিবর্তনের ঝড়-জলে মাথা বাঁচিয়ে এখনো কার্যত অকৃত্রিম রয়ে গেছে' আতোয়ার রহমান (১৯৮৫ : ৭৫-৭৬) তাঁর এমন মতের সাথে আরও যোগ করেন, 'কোনো কোনো উৎসব নিজের থেকেই – অথবা পরিবেশের চাপে – কালের সাথে কিছুটা আপোষ করে।'

যখন ধানের ফসল উঠত বছরে একবার বা দুবার – আউশ ও আমন; সে সময় মূলত আমন ধান ঘরে আসার পর প্রচুর সময় মিলত নবান্ন করার; এমন তথ্যের অবতারণা করে মোমেন চৌধুরী (২০১৪ : ৪২) বলেন, পৌষ-পার্বণে নানা আনুষ্ঠানিকতার সুযোগ ছিল। এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিনোদন। এখন বছরব্যাপী ধান উৎপন্ন হওয়ায় কৃষিজীবীদের অবকাশ মেলে না আলাদা করে উৎসব পালনের।

মৃত্যুঞ্জয় রায় লিখেছেন (২০১০ :১৯), নতুন ধান্যে হবে নবান্ন – এ আশায় কিষাণ-কিষাণীরা সারা বছর বুক বেঁধে থাকত। ধান উঠলে ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করে চলত নানা রকম পিঠে পায়েসের আয়োজন ও আত্মীয়স্বজনদের খাওয়ানো। এব লোকাচারের অনেক কিছুই আজ অতীতের স্মৃতি। কোনো কোনো পল্লিতে এখনো নবান্নের মতো সামান্য কিছু লোকাচার ও উৎসব ক্ষীণভাবে বহমান। হয়তো কাল তাও থাকবে না। এ প্রসঙ্গে Mokaram Hossain-এর নিম্নোক্ত কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য :

> In the olden days husking rice was non-mechanized. A device called 'Dheki' was used for this purpose. This device made a rhythmic noice whice is no more heard. The poet of Ruposhi Bangla Jibonananda Das is engrossed by late autumn. Late autumn has been a recurring them in his poems. Nabanno is fairly an old festival in this part of our culture. This festival, however, has lost much of its old grandeur. Still, late autumn comes following her turn and we tend to reminisce our old traditions. (Mokaram, 2012 : 60)

একসময় যে নবান্ন ছিল স্বচ্ছলতার দ্যোতক, প্রাচুর্যের প্ররিচয়বাহী; সময়ের বিবর্তনে বাঙালির পার্বণগুলোর মধ্যে আজ তা উপেক্ষিতা। বরুণকুমার চক্রবর্তী (২০১৪ : ৩২) মনে করেন, মানুষ যতই লক্ষ্মীহারা হয়েছে, ততই নবান্ন হারিয়েছে তার জৌলুস, হারিয়েছে তার প্রবল উপস্থিতিকে। আজ রয়ে গেছে তার স্মৃতিচারণজনিত দীর্ঘশ্বাসের অস্তিত্বটুকু।

হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতিচারণ করে দীনেন্দ্রকুমার রায় বলেন :

> প্রাচীনগণ মনে করেন, নবান্ন না করিলে যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে। এমন কি, অনেক প্রবাসীও এই উপলক্ষে প্রবাস হইতে গৃহে সমাগত হইয়া আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত মিলিয়া নবান্ন করিতেছেন,– এ দৃশ্য পূর্ব্বে আমাদের পল্লী অঞ্চলে বিরল ছিল না; কিন্তু আজকাল ইংরাজী-শিক্ষার বিস্তারে আমাদের উৎসবানুরাগ

> অনেক পরিমানে শীতল হইয়া আসিয়াছে। আবার অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কায় বহুদূরবর্ত্তী প্রবাস হইতে মধুরস্মৃতিমণ্ডিত পল্লীগ্রামের উৎসব-ভবনে উপস্থিত হইয়া নবান্নে যোগদান করিতে পারেন না। (দীনেন্দ্রকুমার, ২০১৪ : ৫)

সাধ আর সাধ্যের টানাপোড়েনে নবান্নের রং এখন অনেকটাই ফিকে। এর সম্ভাব্য কারণ খুঁজেছেন দীপককুমার বড় পণ্ডা :

> এখন অনেক কিছুই বদলেছে। আজ বিঘের পর বিঘে ধান চাষ করে আর লাভ পাচ্ছেন না চাষিরা। তাই চাষে তাঁদের আগ্রহ কমেছে। অনেকেই জমি শুধু নিজেদের জিম্মায় রাখতে চাষ করেন। চাষ না করলে জমি অন্যের দ্বারা দখল হয়ে যাবে যে। আবার কোনো ক্ষেত্রে চাষের হেরফের হয়েছে। যেমন মানুষ আজ শুধু আমন ধানের চাষের ওপর নির্ভরশীল নয়। বোরো ধানের চাষের ব্যাপকতাও বেড়েছে। বছরে তিন-চারবার চাষ হচ্ছে। তবে কৃষিকেন্দ্রিক যেসব উৎসব আমাদের চালু আছে, সেগুলি সব কিন্তু আমন চাষকে কেন্দ্র করেই। (দীপককুমার, ২০১৪ : ৭৩)

বিজনকুমার মণ্ডল (২০১৪ : ৬০) বলেন, সমাজবিবর্তনের ধারায় এবং বিজ্ঞানের প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষিকাজের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। একই কৃষির জমিতে বছরে একাধিকবার ফসল ফলানো হচ্ছে। তা সত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজে আজও আমন ধানের চাষকে মূল চাষ বলে ধরা হয়। যেসব অঞ্চলে জলসেচের সুব্যবস্থা নেই, কেবল বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করতে হয় – সেখানে আমন চাষ একমাত্র ধান চাষ হয়ে থাকে। আমন ধানের ফসল অগ্রহায়ণ মাসে পরিপাটি করে খামারে বা বাড়িতে তোলা হয়।

কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নবান্ন উৎসব উদযাপনের আমেজকে ম্লান করে দিয়েছে এমন মত নাসরীন মুস্তাফার :

> কার্তিক আর মরা কার্তিক নয় অভাবের বেসুরো তানে, বলতে গেলে এখনকার হেমন্ত দুই মাসজুড়ে কখনই নিদারুন অভাবের ছবি নয়। আবার নবান্নের উৎসবের সেই আয়োজনও নেই আগের মতো। নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষক এখর আর নতুন ধানের আশায় কোনো কাল বসে থাকে না, যে কোন সময় ফসল তুলতে পারছে গোলাতে। ...অভাব-অনটন নেই, এ শুভসংবাদের সঙ্গে এসেছে নবান্ন-সংস্কৃতির বিলুপ্তির দুঃসংবাদ, হেমন্ত এখন আর ফসলি ঋতু নয়। বরং ভয় জেগেছে, গোটা হেমন্তই না বিলুপ্ত হয়ে যায়! (নাসরিন, ২০১৬ : ৪২)

শামসুজ্জামান খানের (২০১৩ : ৫৮) মতে, উত্তরবাংলার আমানি বা হৈমন্তিক ঋতু আমন ধানের গন্ধে বিমোহিত কৃষিজীবী সমাজে নবান্নের উৎসব আর ঢাকার নবান্নের উৎসব অন্তঃসারে এক হলেও এর আঙ্গিক আলাদা। উত্তরবঙ্গে মঙ্গাপীড়িত মানুষের ঘরে নতুন ধান যে আশার আলো জাগায় তা-ই নবান্ন। এদিকে কর্মচঞ্চল নগরজীবনে নবান্ন উৎসব ঐতিহ্যের বিনির্মাণ এবং বাঙালি সংস্কৃতির শিকড়সংলগ্ন হওয়ার প্রয়াসজাত। 'মঙ্গা হলে উত্তরবাংলায় নবান্ন উৎসব হয় না। আর মঙ্গার দুঃসহ জ্বালাকে তীব্র বাস্তবতায় ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা ঢাকায় করি প্রতিবাদী নবান্ন উৎসব।'

প্রাচীন বাংলায় নবান্ন পার্বণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পালিত হতো ব্যাপকভাবে। বর্তমানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও কমে গেছে নবান্ন উৎসব পালনের প্রবণতা। এ ক্ষেত্রে সৌমিত্র শেখর (২০১৪ : ভূমিকা) মনে করেন, হিন্দুদের বর্ণবাদও এই বিচ্ছিন্নতায় প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে শতবছর আগে মুসলিম পরিবারে নবান্ন উৎসব উদযাপনের স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজে নবান্নর মতো পার্বণচর্চা ইসলাম বিরুদ্ধ বিবেচনায় বিলুপ্ত হয়। তিনি বিনয় ঘোষের বাংলা লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব গ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন, 'আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দূরত্বের সঙ্গে এই জাতিবর্ণগত দূরত্ব মিলিত হয়ে এমন একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে যা পাশ্চাত্য বা অন্য কোনো সমাজে বিরল বলা চলে।' এই বিরলতা বাঙালি সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে বলেই মন্তব্য করেন সৌমিত্র। লোকসাহিত্য গবেষক মোমেন চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে সৌমিত্র বলেন, নবান্নের সঙ্গে গ্রামবাংলার মুসলিম জনজীবনের দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন নবান্নের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির যোগসূত্রকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> আসলে নবান্নের সঙ্গে কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় কারণকে যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। নবান্ন তো কোনো ধর্মের নিজস্ব উৎসব নয়, বাঙালি শস্যোৎসব এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান উৎসব। ...নবান্ন বৈচিত্রময় বাঙালি সংস্কৃতির উপাদান। এর অবলুপ্তি মানে জাতিগত পরিচয়ের খানিকটা আলো নিভে যাওয়া; অনেকটা আনন্দধারার বিলোপ। (সৌমিত্র, ২০১৪ : ১০৯-১১০)

এককালে নবান্ন ছিল যুথবদ্ধ সমাজজীবনের একতার রূপ, বাঙালির আত্মপরিচয়ের নির্ণায়ক। সময়ের সাথে, সামাজিক বিবর্তন আর সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে যেন ভাটা পড়েছে সেই স্বতঃস্ফূর্ততায়। এখন দুর্ভিক্ষ নেই, নেই ভাতের জন্য হাহাকার। কষ্টার্জিত ফসল ধান এখন আর 'লক্ষ্মী'র মর্যাদা পায় না। তাই নবান্ন উৎসবেও নেই ফেলে আসা আকুলতা। সে কারণেই কর্মচঞ্চল রাজধানীতেও নবান্নোৎসবের আঁচ অনেকটাই ম্রিয়মান।

ঋতুভিত্তিক উৎসব বিবর্তনের সামাজিক প্রভাব

সময়ের সাথে সাথে উৎসবের বিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের রূপটি পরিস্ফূট করে। উৎসব নতুন করে বাঁচার উদ্দীপনা যোগায়, সমৃদ্ধি আর দীর্ঘ জীবনের ইচ্ছাকে জোরালো করে। প্রাচীন এই ধারণাই হল সংস্কার এবং এই ধারণা কেবল মনেই থাকে না, প্রকাশের কিছু বাস্তব মাধ্যমও খুঁজে নেয় (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ৪৭)। এভাবেই রচিত হয় ইতিহাস; তিনি আরও উল্লেখ করেন :

> উৎসব নিয়ে লৌকিক আর অভিজাত ধর্মের বিরোধ সমাজবিজ্ঞানীকে দেয় সমাজ বিবর্তনের ধারায় এসব ধর্মের ভূমিকার ইঙ্গিত। একদিক থেকে তাঁর অবলোকন অবশ্যই মূল্যবান। বিশেষ করে, লৌকিক উৎসবে ধর্মীয় প্রভাবের পর্যালোচনায়। ধর্মবাদীরা যা-ই বলুন, লৌকিক উৎসবের অবদমন বা শুদ্ধিসাধন ধর্মীয় আধিপত্যবাদের সুপরিকল্পিত প্রসার। (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ৮১)

প্রকৃতির জীবনচক্রে মানুষ এবং তার বিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা এক অপরের পরিপূরক। বাঙালির আবহমান মানবিক বৈশিষ্ট্য সবসময়ই সহিষ্ণু এবং সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের পক্ষে। তাই প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্রয়ে এবং বাঙালির নান্দনিক উৎকর্ষে বিবর্তিত হয়ে ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো অভূতপূর্ব রূপ লাভ করে। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এই সহনশীলতা আধুনিক বাঙালি জাতিকে করেছে প্রগতিশীল।

মানজারুল ইসলাম চৌধুরী সুইট (সাক্ষাৎকার ২) বলেন, আগে জন্ম, বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদির দিন ঠিক করা হতো লোকনাথের পঞ্জিকা দেখে। সেই সময়টার স্মৃতি বর্ণনায় মনে পড়ে, খেজুরের কাঁচা রসে নতুন চাল দিয়ে ক্ষীরের মতো পায়েস তৈরি হতো। তা ধর্মমতে মসজিদ, মাজার, মন্দির বা গীর্জায় বিতরণ করা হতো। বাড়িতে বাড়িতে লেগেই থাকতো পিঠাপুলির উৎসব হতো। সেটি এখন বিলীন প্রায়।

ওই সময়টায় বাংলা সাল পালিত হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে। বাংলা সালকে লোকনাথের সাথে মিলাতে গেলে দেখা যেতো পহেলা বৈশাখ কখনো ১৪ তারিখে, কখনো ১৫ তারিখে পড়ে। এই অসুবিধা দূর করতে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার করা হয়। যেখানে প্রথম ছয় মাসকে সংস্কার করে পরের ছয় মাসকে ঠিক রাখা হলো। ফলে দেখা গেল ২১ ফেব্রুয়ারি পড়ে যাচ্ছে ৮ই ফল্গুনের বদলে ৯ই ফাল্গুন। ঐতিহাসিক ৮ই ফাল্গুন নিয়ে কবিতার ভাষাকে অসামঞ্জস্য মনে হলো। তারিখের ঝামেলা এড়াতে আবার সংস্কার করা হয় বাংলা পঞ্জিকা। প্রথম ছয় মাস ঠিক রেখে পরের ছয় মাস সংস্কার করা হয়।

কাজের সুবিধায় বাংলা পঞ্জিকা সংস্কারের মতো ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলোও খাপ খাইয়েছে সময়ের সাথে।

গোলাম কুদ্দুছ (সাক্ষাৎকার ১) বলেন, রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের ফলে উৎসবগুলো তার মৌলিকত্ব হারায়। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাও কিছু উৎসব বিবর্তন বা বিলীন হবার কারণ। নগরায়ণের ফলে মানুষ শহরমুখী হলো, পেশার পরিবর্তন জীবনে আনলো রূপান্তর। ফলে গ্রাম গঞ্জে আয়োজিত লোক উৎসবের গুরুত্ব, ব্যাপকতা আর উপযোগিতাও ম্লান হয়ে গেল। যদিও গ্রামে উৎসবগুলো এখনও উদযাপিত হয় গ্রামীণ মানুষের সাধ্যানুসারে এবং শহরেও এর আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়নি।

ছায়ানট রমনার বটমূলে বড় আকারে পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু করলেও, রাজধানীতে বা অন্যান্য জেলা শহরগুলোয় তা উদযাপিত হতো যার যার মতো করে। সেই খবর আড়ম্বরে প্রচার না হলেও, তা উদযাপন হতো। পরবর্তীতে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও তা আয়োজন করতে শুরু করে। এই উৎসব তার একক চরিত্র নিয়ে বড় আকারে আয়োজিত হতো। এখন সেভাবে হয়তো হয় না, ছোট ছোট আকারে হচ্ছে।

যেমন হালখাতা এখন আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চলে এসেছে। যার প্রভাব পড়েছে সংস্কৃতির ওপর। রাজনীতিতে যখন ধর্মের প্রভাব পড়ল, তখন সংস্কৃতির সব অনুষঙ্গকে একটি মহল তার স্বার্থে ব্যবহার শুরু

করলো। ধর্মকে উৎসবের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে এর অগ্রগতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এমনকি মিথ্যাচার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলল। ফলে পহেলা বৈশাখ উদযাপনকে বলা হচ্ছে ধর্মবিরোধী, মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বলা হচ্ছে ধর্মবিরোধী। এই প্রবণতার ফলে গ্রামীণ পর্যায়ে আয়োজিত কিছু উৎসব-অনুষ্ঠানও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। এলাকা বিশেষে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়ায়, আগের মতো নিঃশঙ্কচিত্তে উৎসব উদযাপন করতে মানুষ পিছপা হচ্ছে। সে মুহূর্তে ভালো-মন্দ সিদ্ধান্ত নেবার ভাবনাগুলোও হয়তো থমকে যায়, অপচিন্তা, আশঙ্কা দমীয়ে রাখা যায় না। এরপরও নানা অপপ্রচার, প্রতিবন্ধকতা পাশ কাটিয়ে মানুষ উৎসবে আসে নাড়ির টানে।

এখন শহরে বসন্তবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বসন্তউৎসব নগরজীবনে একটি বড় অনুষঙ্গ, যাকে আর অবহেলা করার সুযোগ নেই। অসত্য, প্রগতিবিরোধী, মনুষ্যত্ববিরোধী, সংস্কৃতি বিরোধী শক্তি মনুষ্যশক্তির কাছে সবসময় পরাস্ত হয়। বাঁধা যেখানে, সেখানে চর্চা আরও বেশি হয়। বাঙালির জীবনের অংশ ঋতুভিত্তিক এই উৎসবগুলো তার আদি রূপ পরিবর্তন করেও, সময়ের সাথে নতুনভাবে সংস্কৃতিকে আলোকিত করে, সামাজিক বন্ধন তৈরির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় অধ্যায়
সর্বজনীন উৎসব

আধুনিক সভ্যতার একটি সহযোগী অনুষঙ্গ সর্বজনীন উৎসব ভাবনা। যদিও এই সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতা আর বিচ্ছিন্নতাবাদের সংস্কৃতি দিনে দিনে বাড়িয়ে দিচ্ছে মানুষে মানুষে মানসিক দূরত্ব। তারপরও, মনস্তাত্ত্বিক চাপ মোকাবেলার ফলপ্রসূ এক কৌশল, এক সঞ্জীবনী উদ্দীপক যেন হয়ে উঠেছে সর্বজনীন উৎসব।

সর্বজনীন উৎসব একটি জাতির সর্বজনীন উপাদান। বাংলাভাষী মানুষের সংস্কৃতি বিকাশের সূচনালগ্ন থেকে সম্মিলিত আনন্দ আয়োজনগুলো তার পরিসর দৃঢ় করে, একটা বিশেষ অবস্থানে পৌঁছেছে; ফুটিয়ে তুলেছে সামাজিক শ্রেণিসম্পর্কের রূপরেখাও। এই উৎসবের শ্রেণিকরণ নিয়ে মতবাদ বা মতান্তর আছে। তবে, বিশেষ কিছু কারণে সেই আনন্দ আয়োজন হয়ে ওঠে শ্রেণির ঊর্ধ্বে – সকলের।

মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলে আনন্দের অংশীদার হবে, এটাই প্রাকৃতিক। এর বিরুদ্ধতা সমাজকে স্থবির করে দেবে। ফলে সামাজিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সম্ভাবনাও হয়ে উঠবে দুর্লক্ষ্য।
এমন অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছিলো পূর্ববর্তী বাঙালি মুসলিম সমাজেও; বলে উল্লেখ করেন শামসুজ্জামান খান। তৎকালীন অবরুদ্ধ মুসলিম সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আনন্দ উদযাপনের সুযোগ এবং উদ্যোগের অভাব, সংস্কৃতি বিকাশের প্রতিবন্ধক ছিল, উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

> পূর্ববাংলায় বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঘাটলে তাদের জীবনে উৎসব-আনন্দের তথ্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাদের সমাজ ও গৃহ তাই ছিল অনেকটা আনন্দহীন, নিষ্প্রভ। এর মানে এটা নয় যে, বাঙালি মুসলমান উৎসব-অনীহ বা আনন্দবিমুখ ছিল। তাদের শাস্ত্রীয় ধর্মের স্পর্শকাতরতা এবং স্বল্পবিদ্যার মোল্লা-মৌলবির কাছ থেকেও তারা উৎসব-আনন্দের প্রতিকূলতাই পেয়েছে। ফলে, ধর্মীয় উৎসবকে সাংস্কৃতিক আধারে বিন্যস্ত করার সাহস করেনি। ... ধর্মীয় বিধিনিষেধ, সংস্কার উৎসবের নানা অঙ্গ সংগীত বা নৃত্যকলা মুসলমানগৃহে ঢুকতে পারেনি। আর যে-সমাজে গান নিষিদ্ধ, নাচ হারাম – সে-সমাজে উৎসব অভাবনীয়। তাই বাঙালি মুসলমান সমাজে উৎসব ছিল না। (শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ৮৯)

যেখানে উৎসব-ই নেই, সেখানে সমন্বিত উৎসব নিয়ে ভাবার অবকাশ সুদূরপরাহত। তারপরও বলা হয়, বারো মাসে তেরো পার্বণের এই বাংলাদেশে উৎসবপ্রিয় জাতি বাঙালি। স্বভাবসিদ্ধ আচরণেই সে উদ্বুদ্ধ হয় নানা উৎসবে।

সমন্বিত উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরেন মাসুদ রানা (২০১৬) 'উৎসব-জাতি-সম্প্রদায়-সম্প্রীতি' নিবন্ধে। সেখানে লিখেছেন, অস্তিত্বের জন্য একটি জাতির আত্মপরিচিতি অপরিহার্য। জাতির আত্মপরিচিতির ক্ষেত্রে যে-সমস্ত উপাদান ঐতিহাসিক উৎপাদক হিসেবে কাজ করে, তার মধ্যে উৎসবও একটি। উৎসব একটি জাতিকে

একত্রে গ্রথিত করে তাদের একানুভূতিকে নবায়িত ও শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। সে-কারণেই উৎসবকে হতে হয় সর্বজনীন। কিন্তু খানিকটা সন্তানা নিয়ে বিরাজ করা পয়লা বৈশাখের বাংলা নববর্ষ উৎসব ব্যতীত, এখনও পর্যন্ত এ জাতির প্রকৃত অর্থে কোনো সর্বজনীন উৎসব গড়ে ওঠেনি। কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন, উৎসব পালনে বাঙালি তার মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করতে পারেনি। প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু বা মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবত কেউ মনেই করেন না, তাদের 'সর্বজনীন' দুর্গোৎসবে কিংবা ঈদোৎসবে প্রতিবেশির সঙ্গে সুখ ও আনন্দ শরিক করার প্রয়োজন আছে। তাই দেখা যায়, যখন এক সম্প্রদায় উৎসবে মত্ত অন্য সম্প্রদায় তখন নিষ্ক্রিয় দর্শক। মূলত সম্প্রীতি চর্চার অভাবেই উৎসব তার সর্বজনীনতা হারায় বলে মত তাঁর।

একটি পরিকল্পিত সমাজে কল্যাণ, নৈতিকতা বা বিশ্বজনীন সম্প্রীতিতে বাধা না হয়ে বৈচিত্রময় সংস্কৃতি চর্চা আত্মবিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন, বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি *History of Western Philosophy* গ্রন্থে বলেছেন :

> Diversity is essential to happiness, and in Utopia there is hardly any, This is a defect of all planned social systems, actual as well as imaginary. (Russel, 2009 : 543)

আবহমান কাল থেকে বাংলায় নানা ধরণের পালা-পার্বণ-উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এগুলোর বেশিরভাগই লোকজ উৎসব বা পার্বণ। এগুলো কখনো আঞ্চলিক, কখনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ, কখনোবা বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের উৎসব। কিন্তু এসব উৎসব বৃহৎ, জাতীয় বা সর্বজনীন নয়, উল্লেখ করে শামসুজ্জামান খান লেখেন :

> রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে এ-ধরণের উৎসব ছিল না বললেই চলে। তবে সমন্বিত সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিকাশজনিত কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে উপযুক্ত কোনো কোনো উৎসব পালিত হলেও ঈদ, মহররম, নববর্ষ ছাড়া অন্য কোনো উৎসব মূলধারার উৎসব হিসেবে তেমন একটা গণ্য হয়নি। আবার মূলধারার এইসব উৎসবও ব্যাপক-বিপুল মানুষের সর্বজনীন উৎসব হয়ে উঠতে পারেনি আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেও। তাই নিম্নবিত্তের মুসলমান পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বজনীন উৎসবে যোগ দিয়ে তাদের বিনোদন-পিপাসা নিবৃত্ত করেছে। (শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ৯১)

এভাবেই হয়তো এক পর্যায়ে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের মৌল অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে সর্বজনীন উৎসবগুলো। জীবনবোধ উপলব্ধির যে মৌল দর্শন জাতির মনন জুড়ে বিরাজ করে, সে অর্থের সবটুকু ধারণ করে সর্বজনীন উৎসব, এমনটাই মনে করেন সেলিনা হোসেন। 'বাঙালির অসাম্প্রদায়িক উৎসব' (২০২১) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, সর্বজনীন উৎসবের বিস্তৃতি শহুরে ইটকাঠের গণ্ডি ছাপিয়ে গ্রামের মেঠো পথেও। যেখানে মানুষ জড়ো হয় আপন নিয়মে। অমোঘ এক শক্তির আশ্রয়ে, এই বিশ্বাসে, যেন বিভ্রান্তির যাঁতা কলে পথ হারানোর সুযোগ রোধ করে এই উৎসব।

বলা যেতে পারে, যে উৎসবে ধর্মতান্ত্রিকতার ছায়াপাত নেই, যে উৎসব সাম্প্রদায়িক রীতি নীতির প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ বাঙালিত্ববোধে উদ্বুদ্ধ, তা-ই সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসব একাকীত্ব ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে শেখায়, জাতিগত বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।

বাঙালি সমাজে নববর্ষ উৎসব ছাড়াও সর্বজনীন উৎসব হিসেবে স্থান করে নিয়েছে বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক উৎসব, যেখানে ধর্মের দেয়াল তৈরি হতে পারেনি। তবে, আতোয়ার রহমানের (১৯৮৫ : ১৪) দেওয়া তথ্য থেকে বলা যায়, সর্বজনীন উৎসবের তালিকায় আরও আছে ঐতিহাসিক বা স্মরণ উৎসব (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-একুশে ফেব্রুয়ারি, মে দিবস), বিজয় উৎসব (স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস উদযাপন, খেলায় জয়সূচক উৎসব), রাজনৈতিক উৎসব (জাতীয় দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, যুব উৎসব), সাংস্কৃতিক উৎসব (শিল্পমেলা, নাট্যোৎসব, সঙ্গীত ও নৃত্য উৎসব, গ্রন্থমেলা, জাতীয় কবিতা উৎসব) ইত্যাদি। জাতীয় নির্বাচনকেও এক ধরনের সর্বজনীন উৎসব বলে অভিহিত করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৮)।

বাঙালি উৎসবের এত বৈচিত্র্য, এত শ্রেণিকরণ, তারপরও শুধু বর্ষবরণ ব্যতীত বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ মিলিত উৎসবের সংখ্যা খুব বেশি নয় বলে মনে করেন বিশ্বজিৎ ঘোষ :

> ক'টা উৎসব আছে আমাদের, যেখানে সবাই একনিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, ধর্মীয় ও সামাজিক দেয়ালের উর্ধ্বে উঠে নিষ্ঠভাবে পালন করতে পারে প্রকৃত অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা? সবার অংশগ্রহণে মিলিত বাঙালি যে-ক'টা অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে ওঠে, নববর্ষ উৎসব তার অন্যতম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠী ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে মিলিতভাবে পালন করে আসছে বাংলা নববর্ষ-উৎসব। উত্তরকালে একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবসের মতো সর্বজনীন উৎসব পালনের দিন আমরা পেয়েছি বটে, তবে এক্ষেত্রে নববর্ষ-উৎসব যে ভিন্ন মাত্রাসঞ্চারী, তা লেখাই বাহুল্য। (বিশ্বজিৎ, ২০০৮ : ২৪৯)

বাঙালি জনগোষ্ঠীর উৎসবে এই ধর্মকেন্দ্রিকতা, সচেতনভাবে প্রথম লক্ষ্য করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – এমন ধারণা থেকে হায়াৎ মামুদ লিখেছেন :

> তাঁর প্রজ্ঞা ও বোধ শক্তিতে প্রথম ধরা পড়ে বহুধর্মীয় জনগোষ্ঠীতে ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব চালু না-করতে পারলে বিভিন্ন সম্প্রদায় আত্মিকভাবে যুক্ত হতে পারবে না। ততদিনে ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে একটি উপাদান হিসেবে ধর্মকে বিবেচনা করা শুরু হয়েছে এবং ধর্মীয় ভেদনীতিতে রাজনৈতিক বিভাজন ও হিন্দু-মুসলিম বিরোধের বীজ রোপিত হয়েছে – এ সবও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছিল। কবি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে যে-সব উৎসব প্রচলন করেছিলেন তার গভীরে ধর্মসম্প্রদায়গত ঐক্যবন্ধনের দর্শন কাজ করেছিলো নিশ্চয়ই, নইলে বসন্তোৎসব, হলকর্ষণ-উৎসব ইত্যাদি সেক্যুলার সম্মিলনীগুলো উদ্ভাবনের কোনো কারণ তাঁর ছিল না। বহুধর্মীয় সমাজে একমাত্র ধর্মভিত্তিক উৎসব কোনো ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, তিনি জানতেন। (হায়াৎ মামুদ, ২০০৮ : ৩৮২)

সম্প্রদায়গত ধর্মতন্ত্র-সংশ্লিষ্ট কোনো দিনই যে 'সমস্ত মনুষের সঙ্গে একত্র' হওয়ার কিংবা 'সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব' করার মতো মহৎ উৎসবের দিন বলে গণ্য হতে পারে না – এ কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি বাঙালির উৎসব সন্ধান করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিত্বের মর্মস্থলে, এমন মনে করেন যতীন সরকার। 'বাঙালির নববর্ষ আজ আমাদের অসাম্প্রদায়িক উৎসব' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> বাঙালি সমাজের মানুষ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে অন্তর্ভূক্ত থাকলেও বাঙালিত্বকে তারা অধিষ্ঠিত রেখেছে সমস্ত প্রকার ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। সম্প্রদায় নিরপেক্ষ প্রকৃতি চেতনা ও পরিপার্শ্ব ভাবনা থেকে উৎসারিত হয়েছে তাদের সকল উৎসব। (১৪ এপ্রিল ২০২১, সমকাল)

জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় বাঙালিকে বলিষ্ঠ করতে সর্বজনীন উৎসবের ভূমিকা মুখ্য। 'উৎসব' প্রবন্ধে উৎসবের মাহাত্ম্য বিষয়ে সেই ভাবনাই ব্যক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর –

> সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মান দান করে, সেদিন পণ্ডিত মুর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর ধনিদরিদ্র পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য – এই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৩৬)

ইতিহাসে চোখ ফেরালে দেখা যায়, হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে বাঙালি জাতি তাঁর মননে গভীরভাবে লালন করেছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা। তাই ধর্মীয় উৎসব পালন করতে গিয়েও তাদের মধ্যে সম্প্রদায়বোধ কখনো বাধা হয়ে ওঠেনি। এই মনোভাবে একটি বিশেষ শ্রেণি ক্ষুব্ধ হলেও, তাদের কূটকৌশল কখনো প্রফপ্রসূ হয়নি। এ কে এম শাহনাওয়াজ (২০১৮) মনে করেন, অসাম্প্রদায়িক এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে যেসব গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষ ফায়দা লোটার দুরভিসন্ধি করছে, তারা কিছু সময়ে হয়তো মানবতা ক্ষুণ্ন করতে পারে, নিরীহ মানুষকে দলিত করতে পারে কিন্তু সফল কখনই হবে না।

সংস্কৃতি তার নিজস্ব নিয়মে বিকশিত হলেও, সেই স্রোতধারা অনেক সময় নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, কখনো-বা নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ সংস্কৃতিতে পঙ্কিলতা থাকলে বাঙালির মানবিকতা আর সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তিও লোপ পাবে বলে আশঙ্কা করা যায়।

বাঙালির বষবরর্ণ উৎসব হোক বা যে কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক উৎসব, বলা যায় উৎসব মানেই মুক্তির অভিজ্ঞান। উৎসবের মাঝে ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক সীমা আরোপ করতে গেলে তা মিলনের আনন্দকে ম্লান করে দেয় অনেকটাই। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে সেই ধারার অনুগামী। এ প্রসঙ্গে আলী আনোয়ার তাঁর মত দেন এভাবে :

> এই যে কিছু লোককে সীমার বাইরে ঠেলে দিচ্ছি, তাদের ডাকতে পারছি না তা আমাদের কুণ্ঠিত করে, লজ্জিত করে। আমাদের আনন্দও আর পূর্ণ হতে পারে না। অন্যকে অবমাননার গ্লাণি আমাদের আবিষ্ট করে। উৎসবের আত্মাটি মারা যায়। আমাদের ধর্মীয় উৎসবে ঐ গণ্ডি-চিহ্নিতকারী রেখাগুলি পৌনঃপুনিক

> উচ্চারণে, ঘোষণায়, অনুশাসনে বারবার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়। এই নিষেধাজ্ঞা যে অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রযুক্ত হয় তা নয়, তা স্ব-ধর্মের অন্য সম্প্রদায় বা তরিকার প্রতিও প্রযুক্ত হয়। (আলী আনোয়ার, ২০০৮ : ১৬২)

অনেক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসব, যা আমরা হিন্দু উৎসব হিসেবে জানি; এর বেশির ভাগের উৎস আদিবাসী সংস্কৃতি বলে মনে করা হয়। কারণ, হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণকারীরা নিজ ধর্ম পরিচয় পেয়েছে অনেক পরে। পরবর্তী সময়ে তাদের ধর্ম অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে ঢুকে গেছে এসব সংস্কৃতি, এমন তথ্য দেন এ কে এম শাহনাওয়াজ (২০১৮)।

'ধর্মীয় উৎসবে সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধে তাঁর মতের সমর্থনে যুক্তি তুলে ধরেন এভাবে, এগারো শতক থেকে ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে এদেশের মানুষ। তেরো শতক থেকে তা ব্যাপকতা পায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পূর্বতন সাংস্কৃতিক আচরণ এবং সম্প্রদায় নিরপেক্ষ চেতনা তাদের মধ্যে বজায় থাকে। তাঁর তথ্য মতে আরও জানা যায় :

> উনিশ শতকে হাজী শরীয়তুল্লাহ অন্য সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত করে মৌলধারার মুসলমান বানাতে চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানকে তার ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে। কিন্তু তেমন একটা সাফল্য পাননি তিনি। কারণ এ মাটির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এসব লোকজ উৎসবকে বিশেষ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছাপ মারা অন্যায় হবে। এসব সংস্কৃতি হিন্দু-বৌদ্ধ বা মুসলমানের সংস্কৃতি নয়- মিলেমিশে সব বাঙালি সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। (শাহনাওয়াজ, ২০১৮)

পাশাপাশি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একীভূত সংস্কৃতি গড়ে ওঠার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন শামসুজ্জামান খান। তাঁর মতে, সামান্য কিছু বহিরাগত ছাড়া বাংলার মুসলমানেরা অধিকাংশই স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান। যারা ধর্ম বদলেছে, কিন্তু সংস্কৃতি বদলায়নি। ফলে তাদের আবহমান কাল ধরে আচরিত উৎসব পালা-পার্বণ তারা বর্জন করেনি। স্থানীয় এসব উৎসব তাদের জীবন ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়েই থেকেছে। উদাহরণ প্রসঙ্গে শামসুজ্জামান খান আরও বলেন :

> আদি ভাবকল্পে (Archetype) স্থিত থেকেই এসব উৎসব কিছুটা কালের ছোঁয়া এবং সামাজিক অগ্রগতির অভিঘাতের চিহ্ন বহন করেছে। জীবনাচরণের মুসলিম অনুষঙ্গের কিছু ছাপ বহন করে কোনো কোনো অনুষ্ঠান মিশ্র বা সমন্বিত চারিত্র্যও অর্জন করেছে। স্থানীয় উপাদানের সঙ্গে মুসলিম পুরাণ বা কিংবদন্তি যোগ করে বর্ণাঢ্য উৎসবেরও সৃষ্টি হয়েছে। ... অন্যদিকে আবহমান কালের যেসব স্থানীয় অনুষ্ঠান বাঙালি মুসলমানেরা কিছু গ্রহণ-বর্জন করে নিজেদের করে নিয়েছে তার মধ্যে আছে : নবান্ন উৎসব, আমানি, পৌষ-পার্বণ, সয়লা ও গার্সি উৎসব। (শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ৯০-৯১)

জানা যায়, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক রাজনীতিতে আসেন গ্রামবাংলার কৃষিসমাজ থেকে উঠে আসা নব্য শিক্ষিত ও উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে। পূর্ব-প্রজন্মের নবাব-নাইট জমিদারদের মতো তিনি যেমন ইসলাম ধর্মকে রাজনৈতিক ফয়দার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে চাননি, তেমনি

মোল্লা-মৌলবি-কাঠমোল্লাদের মতো ধর্মীয় অন্ধতায় আচ্ছন্নও ছিলেন না (শামসুজ্জামান খান, ২০১৩ : ৯১)। এ প্রসঙ্গে যোগ করেন, নতুন প্রজন্ম নিয়ন্ত্রিত তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষার কারণে যে উদার ও নবচেতনা-সমৃদ্ধ মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভাবাকাশ তৈরি হয়েছিল তার ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল আনন্দ-উৎসবের উপযোগী এবং উৎসব মুখর। তিনি লেখেন :

> উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে নতুন মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৩-এ এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলা সরকার গঠিত হলে তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হয়। এই নতুন শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ, এমনকি গ্রামীণ অবস্থাপন্ন কৃষক ও জোতদার পরিবারে 'কলের গান' (গ্রামোফোন), দৈনিক-মাসিক পত্রিকা ও তার ঈদ সংখ্যা এবং ঈদ উপলক্ষে নতুন কাপড়চোপড় কেনার রেওয়াজ চালু হতে দেখা যায়। এভাবেই বাঙালি মুসলমানের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসবের সূচনা। (শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ৯১)

তবে, উৎসবের গণ্ডী নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে, স্ব-সম্প্রদায়ের ভেতর থেকেও আরোপিত হতে পারে বিধিনিষেধ। যেমন, শিয়া অথবা ইসমাইলিয়া বা আহমদিয়ারাও সব উৎসবে স্বাগত নন এমন প্রসঙ্গের উল্লেখ করে আলী আনোয়ার (২০০৮ : ১৬২) বলেন, উচ্ছল আনন্দ প্রকাশের বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজ ব্যবস্থা অনেক সময় প্রতিকূলও। যেন আনন্দ প্রকাশ মাত্রেই ধর্ম থেকে খানিক বিচ্যুতি!

কিন্তু, আয়োজিত উৎসবে নির্দিষ্ট পদমর্যাদার ব্যক্তি ব্যতীত, সর্বস্তরের জনগণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত হলে, সে উৎসব সর্বজনীন তো নয়ই, উৎসব হয়ে ওঠারই গ্রহণযোগ্যতা হারায়, এমন মত মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের (২০০৭ : ৯৪, ৮৭)। এতে সাম্যবাদে ব্যাঘাত ঘটে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ব্যাহত হয় নিরপেক্ষতা। উৎসবে যা কাম্য নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে, একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠান বাংলা নববর্ষ। তৃণমূল থেকে শাহরিক – সব পর্যায়েই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তা পালিত হয় একমাত্র খাঁটি বাঙালি উৎসব হিসেবে, এমন মত মুনতাসীর মামুনের। এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি (১৯৯৪ : ৯৭) উল্লেখ করেন, মুসলিম অধ্যুষিত একটি ভূখণ্ডের উৎসব সত্ত্বেও তা বিষাদময় নয়; রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল হলেও এক্ষেত্রে পারেনি ধর্মজ উপাদান যোগ করতে। শুধু তাই নয়, এখনও এ নববর্ষ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও যোগ করে নতুন মাত্রা। মুনতাসীর উল্লেখ করেন :

> আপনাদের কি মনে পড়ে সামরিক শাসনামলের প্রতিটি নববর্ষের অনুষ্ঠানে কি বিপুল পরিমান মানুষ সমবেত হ'ত। নববর্ষে যারা শুধু ঘরে বসে ছুটি ভোগ করতে চান , তারাও কি প্রেরণায় সে সময় যোগ দিতেন এ উৎসবে? এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য মিলে বাংলা নববর্ষকে আখ্যায়িত করতে পারি, পৃথিবীর এক বিরল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসব হিসেবে। (মুনতাসীর, ১৯৯৪ : ৯৮)

বাঙালির বৃহত্তর সামাজিক পটভূমি এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণে এটা বলা যায়, সর্বসাধারণের জন্য আয়োজিত উৎসবগুলো কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়কে বিশেষায়িত করে না। মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, ঐক্য, সমৃদ্ধ জীবনের প্রার্থনার মতো অভিন্ন অন্তর্নিহিত বোধ যখন সমন্বিত উদ্দ্যেশ্যে এক হয়, তখনই উৎসব উত্তরিত হয় সর্বজনীনতায়। হাজার বছরে মানুষের শিল্পকলা এবং তার ভৌগলিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা উৎসব কেন্দ্রিক এই সামাজিক সংহতি অনেক প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে আজও উদ্ভাসিত। কখনো কোনো ধর্মমত উৎসবপ্রিয় বাঙালির উদার চেতনাকে অবদমন করেছে, এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

সর্বজনীন উৎসবের মাধ্যমে জীবনে যে সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে, সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে উৎসবগুলো প্রজন্ম নির্বিশেষে উদযাপনের মধ্য দিয়ে। তাই সর্বজনীন উৎসব বাঙালির সাংস্কৃতিক আবেগের অন্তর্ভুক্ত।

উৎসবের সামাজিক চিত্র

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও কিছু মানুষ যেন সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তারাই বারবার ধর্মের দোহাই দিয়ে নিপীড়ন করছে চিরকালের চেনা প্রতিবেশী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে, নিশ্চিহ্ন করেছে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীকে। অপদস্থ করেছে বাংলার সহজিয়া মরমিয়া বাউল সম্প্রদায়কে। আলমগীর শাহরিয়ার 'সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, সহিংসতা ও বর্বরতার শেষ কোথায়?' (২০২১) নিবন্ধে লিখেছেন :

> এ যেন এক ছাই চাপা সাম্প্রদায়িক ঘৃণার আগুন। ঠুনকো অজুহাত পেলেই জ্বলে ওঠে। জ্বালিয়ে দিতে উদ্ধত হয় চিরচেনা সম্প্রীতির সমাজ। এমনই এক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আগুনে গত রোববার (১৭-১০-২০২১) রাতে পুড়িয়ে দেওয়া হলো রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের মাঝিপাড়া, বটতলা ও হাতীবান্ধা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়ি-ঘর। রাতের আঁধারে চলে লুটপাট ও নৈরাজ্য। দুর্গা পূজায় কুমিল্লার এক মণ্ডপে দুর্বৃত্তের রাখা পবিত্র কুরআন অবমাননার জের ধরে ঘটে এ ঘটনা। কুমিল্লা ছাড়াও চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রামসহ দেশের নানান জায়গায় মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী দল ও মানুষ এসব ঘটনায় অফলাইন ও অনলাইনে প্রতিনিয়ত উসকানি ও ইন্ধন দিয়েছে। ধর্মের নামে দেশে এ রকম অর্গানাইজড ক্রাইম এই প্রথম নয়। আগেও ঘটেছে কক্সবাজারের রামুতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে, সুনামগঞ্জের শাল্লায়।' (আলমগীর শাহরিয়ার, ২০২১)

উৎসবে সহিংসতার আরও কিছু সামাজিক চালচিত্র তুলে ধরেন হাসান মামুন, তাঁর লেখা 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু' (২০১৫) নিবন্ধে :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার যেখানটায় একজন প্রবাসী লেখককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল , তারই আশপাশে বাংলা নববর্ষের সন্ধ্যায় বেশ কজন নারীকে আক্রমণ করা হয়েছে দেখে অবাক হওয়া যাবে না।

> ... একটি বাম ছাত্র সংগঠনের কজন কর্মী আক্রান্ত নারীদের রক্ষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যান। তাদের একজন আহত হয়েছেন হামলাকারীদের হাতে। ... আড়াই দশক আগে আমরা এখানকার ছাত্র থাকাকালে, যখন কোনো উৎসবই এত ব্যাপক রূপ নেয়নি, তখনও বিশেষত বাংলা একাডেমি এলাকায় বই মেলার প্রবেশপথে একদল ছেলে সংঘবদ্ধভাবে এসব ঘটাত। (হাসান মামুন, ২০১৫)

এসব ঘটনাদৃষ্টে, বাঙালি আসলেই উৎসব-বান্ধব জাতি কি না, এই প্রশ্ন জাগে। নইলে দারুণ উৎসবও কেন বিড়ম্বনার বিষয়। উৎসবের ভিড়ে মেয়েদের কোনঠাসা করে তাকে লাঞ্ছিত করতে কিছু বিচ্ছিন্ন ও বিকারগ্রস্ত লোক প্রস্তুত হয়েই থাকে, এমন আক্ষেপ করে হাসান (২০১৫) লিখেছেণ, এসব ঘটনা জাতি হিসেবে বাঙালিকে, তার সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করে।

বাংলা নববর্ষ তো বটেই, রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য উৎসবেও প্রতিবারই ঘটে নারীর ওপর আক্রমণ। অনেক ঘটনাই প্রকাশ পায় না। তিনি একে 'যৌনসন্ত্রাস' উল্লেখ করে লিখেছেন, দিনকে দিন আরও বেশিসংখ্যক যুবক দলবদ্ধ হয়ে এমনভাবে এসব ঘটায় যে, উপস্থিত দুএকজনের পক্ষে তাদের কবল থেকে কাউকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। এরই মধ্যে সবার মাঝে বেড়েছে 'ঝামেলা' এড়িয়ে চলার প্রবণতা। সাথে আইনের দৃষ্টান্তমূলক শাসন না থাকায় কিংবা তা ভেঙে পড়ার কারণেই অমন প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনকে দিন। সাহায্য করতে গিয়েও উলটা হয়রানির শিকার হচ্ছে মানুষ।

এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারির মতো সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ উৎসবগুলোয় নারীর অংশগ্রহণ কমবে, কমবে শান্তিপ্রিয় মানুষের অংশগ্রহণ। নামধারী কিছু উৎসব হয়ে উঠবে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের, প্রধানত পুরুষদের কর্মকাণ্ড।

সর্বজনীন উৎসবের গুরুত্ব

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বলয় এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাবে উৎসবে এসেছে পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য। তবু সর্বজনীন উৎসবগুলো তার উপযোগিতা হারাচ্ছে। সামাজিক সংহতি আর সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা আর কী কী হতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই জরুরি বলে মনে করছেন প্রগতিশীল, সচেতন মহল।

বরাবরই অসাম্প্রদায়িক জীবনতৃষ্ণা বিশেষায়িত করে বাঙালি সংস্কৃতিকে। তাই বলা যায়, সর্বজনীন উৎসবে উন্মুখ একটি জাতি বাঙালি। 'সর্বজনীন উৎসব' শব্দ দুটি গভীর অর্থ বহন করে শফি আহমেদের কাছে। বৈষম্যমুক্ত মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের এক গভীরতার জন্যই উৎসবকে সর্বজনের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব মেনে নিতে সুবিধাবাদী মহলের তোড়জোড়। কারণ হিসেবে শফি আহমেদ উল্লেখ করেন (২০০৮ : ৩২৩), বাঙালির বিবিধ জাতীয় উৎসবের মধ্যে দুটি বিশেষ উৎসবে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি ও পহেলা বৈশাখ।

সংস্কৃতজনদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এই উৎসব দুটি স্বতন্ত্র্য। ধর্মের বিভেদ, অর্থনৈতিক শ্রেণিগত বিভেদ, সামাজিক বৈষম্য সবকিছুই ম্লান হয়ে ওঠে সম্মিলিত প্রাণের স্রোতে। যেটা ধর্মীয় রাষ্ট্রে ধর্মান্ধদের কাম্য নয়। এসব কারণেই উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ছিল বেশ বৈরী।

বিশ শতকের প্রথম দিকেও যে বাংলায় মুসলমানের বৃহৎ, বর্ণাঢ্য ও সর্বজনীন উৎসবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তার কারণ শুধু ইসলাম ধর্মের শাস্ত্রীয় অপরিবর্তনীয়তা নয়, তখন সমাজ ব্যবস্থাও প্রস্তুত ছিল না নানামুখি উৎসব আয়োজনে সুযোগ সুবিধার সমন্বয় ঘটাতে, এমন মত শামসুজ্জামান খানের :

> আসলে বড় উৎসব সংগঠনের জন্যে যেসব উপাদান ও প্রয়োজনীয় ভিত্তি দরকার, বাঙালি মুসলমান সমাজে তখন তার অভাব ছিল। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল বড় আকারের একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং ভোক্তাশ্রেণি হিসেবে তাদের কিছু সক্ষমতা অর্জন এবং উৎসব আয়োজনে সক্ষম প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠায় উৎসবের ব্যাপকতা ও বহুমুখিতার সৃষ্টি হয়নি। বাঙালি মুসলমানের প্রাণ ধর্মীয় উৎসব ঈদেও তাই জৌলুস ও জেল্লা দেখা যায়নি কৃষিজীবী ও দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবনে। (শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ৯১)

তাই বলা যায়, সর্বজনীন উৎসব পালন একটি পরিপূর্ণ বোধের, একটি পরিপূর্ণ সামাজিক উৎকর্ষের মাপকাঠি। প্রাচীনতার নববিন্যাস এবং উদ্ভাবনী ব্যবহারে উৎসব ঐতিহ্যের নবায়ণ ঘটে, সংস্কৃতির নবনির্মাণ হয়। রবিউল হুসাইন যুক্তি দেখিয়েছেন (২০০৮ : ৩১৬), অন্যথায় সমাজ একে অপ্রয়োজনীয় নিরূপণ করত :

> সর্বজনীন বোধের প্রয়োজনীয়তা এই উৎসবের কার্যকারিতা সমাজের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় বলেই এটি উৎসব হিসেবে সমাজে উদ্ভূত হয়েছে এবং এর মূলে সেই সর্বজনীন মানবিকতাবোধের চূড়ান্ত অগ্রসরতা যা থেকে উৎসারিত মানবের যাবতীয় কল্যাণ ও মধুময়তা। (রবিউল, ২০০৮ : ৩১৬)

সর্বজনীন উৎসব পালনে বাঙালি মনের সংকীর্ণতা দূর করতে নানা ভাবেই সচেষ্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মানবশিশুর জন্মানুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিবাহ বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকেও সবার অংশগ্রহণে স্মরণীয় করতে তিনি উদ্যোগি হন এভাবে :

> জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই – সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয় স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে ঘরে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘর নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মতো দীনহীন জগতে আর কে থাকিত। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ :৩৯৮)

অসাম্প্রদায়িক উৎসব উদযাপনে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ, তার ঐক্যকে শক্তিশালী করতে পারে প্রগতিশীল মানুষ। বাঙালি জাতিসত্ত্বা গঠনে তা বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ।

এই জীবন-তৃষ্ণা ও জীবন-দর্শনই বাঙালির জাতিগত ঐতিহ্যের মূলগত ভিত্তি, তার প্রাণপ্রবাহের মূলগত ধারা, উল্লেখ করে সরকার আবদুল মান্নান (২০০৮ : ৩৪৪) বলেন, 'যারা এর প্রতিপক্ষ তারা নিঃসঙ্গ ও আগন্তুক। তারা আমাদের কেউ নয়।'

অসহিষ্ণু সমাজে হিংসা ও দ্বন্দ্বের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বজনীন উৎসব। সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ – এই চেতনাকে ধারণ করে, প্রীতিময় এক আনন্দযজ্ঞ হয়ে ওঠে এই উৎসবগুলো। ঈদ, পূজা, বড়োদিন, বুদ্ধপূর্ণিমার মতো ধর্মীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন না হলেও, মানবকল্যাণ এর মূল বাণী। ধর্মীয় এই উৎসবের রয়েছে কল্যাণকামী সামাজিক প্রভাব, যা চিরন্তন। তেমনি ঋতুভিত্তিক উৎসব, ঐতিহাসিক উৎসব, বিজয় উদসব, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উৎসবের মতো সর্বজনীন উৎসবগুলো এদেশের ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত। এই উৎসব উদযাপনের পেছনে সুচিন্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অসাম্প্রদায়িক ভাবনা যেমন ক্রিয়াশীল, পাশাপাশি সর্বজনীন উৎসব উদযাপনকে তারা একপ্রকার চিত্তমুক্তির সচেতন প্রকাশ বলে মনে করেন।

সর্বজনীন উৎসবের সামাজিক চালচিত্র

বলা হয়ে থাকে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য রোধে সচেতন মহল সক্রিয়। ফলে সাংস্কৃতিক শক্তির কাছে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বরাবরই পরাজিত। আশা জাগানিয়া এমন ভাবনার পরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুধাবন করেছিলেন উৎসবের সামাজিক অবস্থানগত প্রতিকূলতার দায় এক অর্থে মানুষেরই। তিনি লিখেছেন :

> হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এতকালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারো স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়াবড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জলতর খাদ্য প্রচুরতর আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে – কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা আমাদের দীণতা আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৯৮)

উৎসবে ক্ষমতাসীন প্রভাব কখনই কাম্য নয়। ধর্মের বিধি নিষেধ না থাকলেও, সমন্বিত কোন কোন উৎসবে সকল সংকীর্ণতা ছাপিয়ে সব ধর্মের মানুষের প্রাণবন্ত উপস্থিতি দেখা যায়, এ প্রশ্নই যেন মুখ্য হয়ে ওঠে। অথচ বিশ্বদরবারে নিজের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা তুলে ধরতে অসাম্প্রদায়িক উৎসবের বিকল্প আর কিছু নেই। বাংলা নববর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন মুনতাসীর মামুন। তাঁর (১৯৯৪ : ৯৪) মতে, এটি হিন্দু বা মুসলমান বা

বৌদ্ধের একক কোন উৎসবের দিন নয়। এটির চরিত্র সর্বজনীন। আসলে, ধর্মভিত্তিক নয় কিন্তু সর্বজনীনএমন উৎসব পৃথিবীতে বিরল। তিনি লিখেছেন :

> বাঙালি ধার্মীক ছিল বটে, তবে খুব কম সময়েই ধর্মের কারণে তারা উন্মত্ততা দেখিয়েছে। তাদের ধর্মে এবং উৎসবে এত লোকায়ত উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যে, যার ফলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা জেগেছে একে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। (মুনতাসীর মামুন, ১৯৯৪ : ভূমিকা)

তবে, এর বিপরীত চিত্রও অনেক সময় কলুষিত করে সমাজব্যবস্থাকে। এর উল্লেখ আছে যতীন সরকারের প্রবন্ধে :

> বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের টানাপোড়েনে যখন দেশের সাম্প্রদায়িক আবহ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, তখন বরং পরম পবিত্র ধর্মীয় উৎসব গুলোকেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কলুষে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে একান্ত অবলীলায় ও নির্বিবেক হৃদয়হীনতায়। দোলযাত্রা ও কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে এদেশে যে এ সময় নারকীয় বীভৎসতার প্রদর্শনী চলেছে, উৎসবের পরিণতি ঘটেছে ভ্রাতৃঘাতী পৈশাচিকতায়, সেই সব দুঃস্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকুক, – সুস্থ চিন্তার অনুসারী মানুষ কখনো তা চায় না, ধর্মীয় উৎসবে ধর্মের মর্মের উদার প্রকাশই তাদের কাম্য। তাই তারা এমন উৎসবেরও সন্ধান করে যে-উৎসব সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত,সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমগ্র জাতির যা ঐতিহ্যিক সম্পদ। (যতীন সরকার, ২০০৮ : ৩০৪)

অসাম্প্রদায়িক উৎসব পালনের বিরোধী অপশক্তি, স্বার্থবাদী মহল এই সমাজেই অবস্থান করে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন রবিউল হুসাইন :

> মাঝে মধ্যে এই ধারণা সমাজে প্রচলিত যে, চারদিকে অবক্ষয় ও ভাঙনের প্রতিকারও, খুন, ধর্ষণ, বিশৃঙ্খলতা, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক চাপ, অগণতান্ত্রিকতা, অবক্ষয়- সব মিলে একটি ভয়াবহ চালচিত্র- এর বিরুদ্ধে জনমত প্রবলভাবে তৈরি হয় এইভাবে যে পরমতসহিষ্ণুতা অবশ্যই জড়িত হবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেহেতু সর্বজনীন উৎসবগুলো এই সমাজে এখনো প্রবলভাবে বিরাজিত ও প্রভাসিতরূপে অবস্থান করছে। (রবিউল, ২০০৮ : ৩১৬-৩১৭)

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যয় প্রগতিশীলেরাও এখন আর ব্যক্ত করেন না। অসাম্প্রদায়িক ভাবনাও তাদের জোড়ালো নয়, এমন আক্ষেপ করে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এর কারণ তুলে ধরেন :

> বিদ্যমান ব্যবস্থায় মানুষের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা ও বেকারত্ব বাড়ছে, মাদকাসক্তি মানুষকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, ধর্ষণ ও নারী-নির্যাতন ঘটছে যত্রতত্র, সড়কে রীতিমতো নরহত্যা চলছে, গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, জবাবদিহি এখন লজ্জায় মুখ দেখায় না, বিপর্যস্ত প্রকৃতি ও পরিবেশের নীরব ক্রন্দন কেউ শুনছে না। সর্বোপরি, পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থা উৎপাদনের শক্তিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে, যে জন্য দারিদ্র দূর হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। (প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৮)

আহমেদ ফয়েজ (২০১৩) 'একটি সার্বজনীন উৎসব : পহেলা বৈশাখ' নিবন্ধে বলছেন, বাংলা নববর্ষে কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ব্যতীত অন্য ধর্মের মানুষের সম্পৃক্ততা তেমন চোখে পড়ে না। এর দুটি কারণ ধারণা করে তিনি লিখেছেন, প্রথমত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা বৃহদাকারে বড়দিন এবং খ্রিষ্টীয়

নববর্ষ উদযাপনে আগ্রহী। অন্যদিকে, মুসলমান মৌলবাদীরা বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতাকে সনাতন ধর্মীয় রীতি মনে করে, তা প্রতিহত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন, এমন কি হিজরি নববর্ষকে উদযাপন প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন। ফলে বর্ষবরণের স্বতঃস্ফূর্ততায় হামলার আশঙ্কা বা কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনি উৎসব আমেজকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করে। অন্যদিকে, ২৫ বৈশাখ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা নির্ধারিত হওয়ায়, বাংলা নববর্ষ তাদের তেমন আন্দোলিত করে না। এদিকে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অনেকেই বুদ্ধের অনুসারী। তারা চৈত্র সংক্রান্তি এবং পহেলা বৈশাখে প্রায় ৫ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী বৈসাবি উৎসবের আয়োজন করে। অবস্থা পর্যবেক্ষণে ফয়েজ এই সিদ্ধান্ত দেন যে, বর্ষবরণ মূলত সনাতন ধর্মসম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অংশগ্রহণকারীদের উৎসব। তবে নতুন ধান ওঠাকে কেন্দ্র করে বাঙালির নবান্ন উৎসবে অংশ নেয় জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই। তাই নবান্ন উৎসবকেই তিনি বাঙালির সর্বজনীন উৎসব বলে মনে করতে আগ্রহী।

বাংলা বর্ষবরণ উৎসবেই ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ তথা সর্বজনীনতাকে আবিষ্কার করে বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ। পহেলা বৈশাখ দিনটি অর্জন করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। কিন্তু শেষ রক্ষা যেন হয়েও হলো না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক সম্প্রদায় সমাজের সর্বস্তরে কাঙ্ক্ষিতরূপে এ উৎসবের বিকাশ ঘটাতে পারল না। এ রকম খণ্ডীভবন কোনো উৎসবেরই মর্যাদা বাড়ায় না, উল্লেখ করে যতীন সরকার (২০০৮ : ৩০৪) লেখেন, যা হতে পারতো সমস্ত বাঙালির জাতীয় উৎসব,বস্তুত তা-ই জাতির এক সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের বাৎসরিক পার্বণ মাত্র হয়ে রইলো। এটা তার উৎসবত্বের অবমাননাই করে। যা খণ্ডিত, যা সংকীর্ণ, যা সকলকে অভিন্ন মিলনক্ষেত্রে উদার আমন্ত্রণ জানায় না, তাকে 'উৎসব' অভিধা দেওয়া শব্দটির অপপ্রয়োগ বলে মত দেন তিনি।

পাশাপাশি শফি আহমেদ যুক্ত করেন- স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস যেন ঠিক ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব হিসেবে গণ্য হয় না। কারণ, এই দুটি উৎসবের সাথে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাজনৈতিক দল জড়িত থাকে। তাই এই রাজনীতি-গন্ধী উৎসবকে সমগ্র বাঙালির বলে উল্লেখ করা যেন অরাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করার সামিল, যা সুবিধাবাদীদের কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই মন্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

> যে মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তার আরম্ভ এবং সমাপ্তি বিন্দুকে শুধু 'জাতীয়' আখ্যা দিচ্ছি, বলছি না 'ধর্মনিরপেক্ষতার' উৎসব। 'জাতীয়' শব্দটি এমনই সমগ্রতাসূচক যে, তার জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাজ' আর অপরিহার্য নয়, একথা স্বীকার করি। কিন্তু তা হলে একুশে ফেব্রুয়ারি ও পয়লা বৈশাখের ক্ষেত্রে আমরা আবার ওই অভিধা প্রয়োগে অতোটা মুখর হয়ে উঠি কেন। ... নববর্ষের সাথে একুশে ফেব্রুয়ারির অথবা স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসের চরিত্রের একটা বিশেষ ভিন্নতা আছে এবং তার সঙ্গে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ যোগ রয়েছে। নববর্ষ ভিন্ন অন্য তিনটি দিনই আমাদের সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। (শফি, ২০০৮ : ৩২৩-৩২৪)

তাঁর মতে (২০০৮ : ৩২৫) নববর্ষের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ বা ষোলই ডিসেম্বরের আর এক বড় ভিন্নতা হলো, আমাদের জীবন ও ঐতিহ্য এর মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছে নববর্ষ। এই দিনটি আমাদের অর্জন করতে হয়নি। পয়লা বৈশাখের সঙ্গে কোনো রক্তপাতের যোগ বা আন্দোলন পরিক্রমা নেই। বাংলা বর্ষবরণ আমাদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার ফল। তিনি বলেন, এজন্যই হয়তো প্রাকরণিক অর্থে নববর্ষ 'রাষ্ট্রীয়ভাবে' পালিত হয় না। অথবা আমরা আলাদাভাবে বলি না নববর্ষের বা পয়লা বৈশাখের চেতনা।

পাশাপাশি এমন মতও উঠে আসে, নববর্ষ ছাড়া সামাজিক ভিত্তিতে বাঙালির সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ কোনো জাতীয় উৎসব নেই, যে উৎসব আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জাতিসত্তাভিত্তিক একটি অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসবের স্থান পূরণ করতে পারে, যেখানে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশবাসী যে কোনো মানুষ যোগ দিতে পারে। যে উৎসব উদযাপনে কোনো বাধা নেই, জাতীয় জীবনে তা হয়ে উঠতে পারে সবার! এমন ভাবনায় সহমত প্রকাশ করেন আহমদ রফিক :

> একুশে ফেব্রুয়ারি তথা শহিদ দিবস প্রকৃতই শোকদিবস এবং সেই সঙ্গে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও সংগ্রামের প্রেরণাদায়ী প্রতীকী দিবস, কোনো ক্রমেই উৎসব দিবস নয়, কোনো হিসেবেই নয়। ঈদ, দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা বা ক্রিসমাস দিবসগুলো নিতান্তই সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মীয় সামাজিক উৎসব। একমাত্র পয়লা বৈশাখই সবদিক বিচারে জাতীয় উৎসবের শূণ্যতা পূরণ করতে পারে। (আহমদ রফিক, ২০০৮ : ১৮৪)

তবে, বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ এমন একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সময়ে বসবাস করছে, যখন মানুষ নির্বিঘ্নে পূজা করতে পারছে। পারছে বলেই পূজা মণ্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমানসহ সকল ধর্মের মানুষ পূজা মণ্ডপে যাচ্ছে, এমন মত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অরূপ রতন চৌধুরীর (সাক্ষাৎকার ৩)। তিনি বলেন, সবাই একসাথে পূজা দেখতে আসছে, আরতির সময় হাজার হাজার মানুষ আরতি দেখছে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাই উপভোগ করছে, এক সাথে প্রসাদ খাচ্ছে। এই যে একটা মহানন্দ, মহামিলন এই মহোৎসবে বাংলাদেশ পূর্ণতা পেয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র এই বলে, বাঙালি জাতির জীবনে সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত উৎসবকে সর্বজনীন উৎসব বলে অভিহিত করা হয়। যে উৎসবে সব রকম মানুষের প্রাণবন্ত উপস্থিতি কাম্য। তবে উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠার আদিলগ্নটা খুব অনুকূল ছিল না। আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তা ছিল অনেকাংশেই প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। কারণ বাঙালির ধর্মানুশাসিত রীতি-প্রথা অনেক ক্ষেত্রেই নিরুৎসব, বিষণ্ন। নানা বন্ধুর সময়পরিক্রমার পর শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণির প্রতিনিধিত্বে, ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ের মতো পারিবারিক আয়োজনগুলো। এরপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাঙালি উৎসব উদযাপনে উদ্যোগী হয়। সাথে যুক্ত হয় বর্ষবরণ, জাতীয় দিবস, মেলা বা কৃষিভিত্তিক উৎসবও। দেখা যায়, এই উৎসব শুধু সামাজিক শক্তিকেই ঋদ্ধ করে না, মানব জীবনে আনন্দের অফুরাণ উৎস হয়ে ব্যক্তির অন্তর্লোক ও বৈষয়িক জীবনকেও আলোকিত করে। তাই বলা যায়, শ্রেণিবৈষম্যভেদে কোনো উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে

তখনই, যখন সে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকে, পাশাপাশি প্রধান্য পায় নির্মল বিনোদনগত চাহিদাও। যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্মীয় সংকীর্ণতা আর সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব উৎসব উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা যেমন ম্লান করে দেয়, তেমনি প্রাণহীণ উৎসব একটি জাতিকে করে তোলে নি :স্প্রাণ।

সর্বজনীন উৎসব একটি জাতির রুচিশীল সংস্কৃতির নির্ণায়ক। উৎসবকে অর্থবহ করে তুলতে শুধু বৈচিত্র্যময়তাই যথেষ্ট নয়, জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে একে পৌঁছে দিতে হয় এর শেকড়ের কাছে, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে খেটে-খাওয়া মানুষের উদ্‌যাপন সামর্থ্যের কাছে। সেই সাথে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সর্বস্তরের মানুষের উদ্যোগী হওয়াও আবশ্যক। তবেই আশা করা যেতে পারে, বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হবে সর্বজনীন উৎসব।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসবের ভূমিকা

পাললিক জনপদে বসবাসকারী বাঙালির স্বকীয় সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে, ঋতুভিত্তিক উৎসব তার জাতিসত্তার লালন, বিকাশ ও সুরক্ষায় সহায়ক হয়ে এসেছে যুগে যুগে। যদিও স্থানভেদে এর ধরন ছিল বৈচিত্র্যময়। নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন, শ্রমক্লান্ত মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয় এই উৎসবের মধ্য দিয়ে। ঋতু উৎসব দেয় ইচ্ছে পূরণের তাগিদ।

আদিম গুহাবাসী মানুষ ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে সভ্যতা, প্রগতি, জ্ঞান আর সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় এগিয়ে চলেছে। নিজেকে অন্বেষণ করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে, যে প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সেই প্রকৃতির সান্নিধ্যই তাকে অনিঃশেষ নির্মল রাখবে। তাই আদিম যাযাবর মানুষ ঋতুবৈচিত্র্যে সময়-উপযোগী 'আর্তব' উৎসব অর্থাৎ কৃষি উৎসবে মিলিত হতো। ঋতুভেদে উপযুক্ত শস্য ঘরে তোলার সেই ধারায় এসেছে নববর্ষের 'আমানি উৎসব' এবং নতুন ফসলের 'নবান্ন' উৎসব (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ২৮-২৯)।

সভ্যতার ক্রমবিকাশেও প্রকৃতি-ভক্ত মানুষ তার চারপাশের নিসর্গ, প্রকৃতির রূপান্তর আর ঋতু-পরিক্রমাকে উপেক্ষা করতে পারেনি কখনো। কারণ ঋতুবৈচিত্র্যই নির্ধারণ করে দিয়েছে তার টিকে থাকার আদর্শ পরিবেশ, বেঁচে থাকার কৌশল। তাই নতুন শস্য প্রাপ্তির নবান্ন উৎসবে অনাগত দিনগুলোয় অভাব-অনটন ঘোচানোর কামনা করে। তার জীবনে পৌষ-পার্বণ আসে সুফল প্রাপ্তির আশির্বাদ হয়ে। বর্ষবরণে বাঙালির যেমন প্রত্যাশা থাকে অতীতের অপ্রাপ্তি থেকে উত্তরণের, তেমনি বর্ষায় আর শরতে প্রকৃতির সুজলা, সুফলা, শস্যসমৃদ্ধ হয়ে ওঠাকে উদযাপন করে প্রাণ প্রাচুর্যের বাহক হিসেবে। আর বসন্তে নব রূপে সজ্জিত প্রকৃতির বন্দনা যেন নিসর্গের প্রতি ভালবাসার প্রকাশক।

যেহেতু বাঙালির বড় কোনো ধর্ম-নিরপেক্ষ উৎসব নেই, তাই ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো ব্যাপক পরিধি নিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি উৎসব হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজে। আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ মানবচরিত্র গঠনে বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়, এমন ধারণা থেকে আবু জাফর শামসুদ্দীন বলেন :

> বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু। প্রতিটি ঋতু মাত্র দু'মাস স্থায়ী। চরম আবহাওয়া এখানে নেই। উৎপাদন পদ্ধতি এক। আবহওয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতার পটভূমি। বাংলার লোক-সংস্কৃতির চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাভাষাভাষীর মন ও মানস গঠনে তার ভূমিকা বুঝতে হলে উক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রাখা আবশ্যক। (আবু জাফর, ১৯৮৮ : ১৫-১৬)

মূলত সময় পরিক্রমায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নববিধ রূপও জলবায়ু প্রভাবিত, এ কথা মেনে নিতে হয়। আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসবগুলো না থাকলে, গোটা মানব জাতির অস্তিত্ব হয়তো সংকটের মুখে পড়ত। 'যদিও সব বৈচিত্র্য স্বত্ত্বেও সকল উৎসবই চরিত্রে একটি জায়গায় এক,– উৎসব মাত্রেরই একটি না একটি উদ্দেশ্য আছে – এবং আনন্দ তাদের অঙ্গ, প্রায় ক্ষেত্রেই প্রধান উপজীব্য (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ৫)।' এমন কথার সাথে সহমত প্রকাশ করে সৌমিত্র শেখর লিখেছেন :

> আনন্দের জন্যই উৎসব। উৎসব হারিয়ে গেলে আনন্দ লোপ পায়। আনন্দ না থাকলে বেঁচে থাকা কষ্টের; হয়তো অর্থহীনও। নবান্ন যদি হারিয়ে যায় চিরতরে, বাঙালির জীবনে আনন্দের একটি স্রোত নিশ্চিতভাবেই কমবে। (সৌমিত্র, ২০১৪ : ১০২)

এই আনন্দ ঐতিহ্যের মাঝেই বাংলার লোকায়ত সমাজ। এই সমাজব্যবস্থা কৃষিনির্ভর বিধায়, এখানকার প্রাত্যহিক জীবন প্রণালী, লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির পরিমণ্ডলে কৃষিভিত্তিক জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে। মোমেন চৌধুরী (২০১৪ : ১০২) বলেন, 'আমরা অবগত যে, লোকসংস্কৃতি একান্তভাবেই ঐতিহ্য নির্ভর, আঞ্চলিক, সমন্বয় ও রূপান্তরধর্মী, সম্প্রসারণশীল এবং সতত সৃষ্টিশীল।'

আর প্রকৃতির অভিনব সৃষ্টিশীলতায় ঋতু-উৎসব বাঙালির কাছে ধরা দিয়েছে নব নব রূপে, নবজীবন লাভের প্রেরণা হয়ে। তাই উৎসবের মিলিত শক্তি দুর্নিবার। এর কাছে অসহায় সাম্প্রদায়িক শক্তি। বিশ্বজিৎ ঘোষের মতে :

> এমনি এক সময় পর্বে, মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত দিনে, বাঙালির জীবনে নববর্ষ বা বৈশাখ এসেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শক্তিউৎস হয়ে, বাঙালি জাতির অস্তিত্বের চিরায়ত উৎস হয়ে। ... পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালির ঐতিহ্য-অন্বেষা, পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালির আপন শিকড়-অন্বেষা। পয়লা বৈশাখে নববর্ষ উদযাপনকে একট সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে না দেখে, দেখতে হবে ঔপনিবেশিক আমলের মতো রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে। (বিশ্বজিৎ, ২০১৯ : ২৫২-২৫৩)

ঔপনিবেশিক আমল কেন, বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই উৎসব শিক্ষণীয় এক সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি মিলনের কথা বলে। সংস্কৃতির সূত্রে বহুধা-বিভক্ত জাতি খুঁজে পায় এক মোহনায় মিলনের অন্তর্তাগিদ ও অবলম্বন, যা অনেকের কাছে শঙ্কার, এমন উল্লেখ করে মফিদুল হক লিখেছেন :

> বৈশাখী চেতনা শঙ্কিতও করেছে অনেককে যেমন একদা করেছিল পাকিস্তানি শাসকদের – যারা ভেবেছিল এ দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে, ধর্মীয় ঐক্যে গড়বে জাতীয় ঐক্যের ভিত। এই উগ্র ধর্মান্ধতা তাদের ঠেলে দিয়েছিল চরম বিভ্রান্তির দিকে এবং চোখে ঠুলি পরিয়ে হিংসার ভাবাদর্শে আচ্ছন্ন করেছিল চিত্ত। (মফিদুল, ২০১৯ : ২১৬)

তবে, প্রকৃত ইমানদার এবং মুসলিমসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারকবাহক মানুষেরা এই সাম্প্রদায়িক চতুরতার বিরোধী। উৎসবের নামে সবাইকে এদেশের ধর্মবিশ্বাসীদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়ার কৌশলটি মাত্র গোটা কয়েকের, উল্লেখ করে আল মাহমুদ লিখেছেন :

> আমরা মনে করি এদেশের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের সাথে এদেশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃতপক্ষে কোনো বিবাদ বা বিরোধ ছিলো না। ... এদেশে আর যাই হোক ধর্মীয় আন্দোলনের কোনো নেতাই, বিশেষ করে ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো নেতা, কর্মী বা আলেম সমাজের কেউ সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে তোলার ইন্ধন যোগান না। এদেশের মুসলিম সমাজের কোনো দ্বায়িত্বশীল ব্যক্তিই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নন। বরং তারা এদেশের হিন্দু ও খৃস্টান ভাইদের ধর্মীয় অধিকারে যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী। আসলে 'সাম্প্রদায়িকতা' এই কথা বা শব্দটি এদেশের বামপন্থী প্রগতিবাদীদের আবিষ্কার।' (আল মাহমুদ, ২০০৪ : ৯৬)

আসলে প্রগতিশীল এবং মানবিক চেতনায় সামাজিক আদর্শদের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে ঋতুভিত্তিক উৎসব। অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার সাথে সাথে শ্রেণিসম্পর্ক জোরালো করতে তাগিদ দেয় এই উৎসব সম্মিলন। উৎসবের মাধ্যমে 'ব্যক্তি আমি'কে ছাপিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় 'বহু আমি'র মাঝে। একের অপ্রাপ্তির বেদনা অন্যের প্রাপ্তির আনন্দে ভাগ করার উপলক্ষ হয়ে আসে ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো।

প্রগতিশীল সংস্কৃতি

প্রগতি অর্থ অগ্রগতি। মূলত চিন্তা, জ্ঞানে ও কর্মে সমুন্নত হয়ে এগিয়ে চলাই 'প্রগতি' শব্দের সমার্থক। প্রগতিশীলতা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন; উল্লেখ করে ইমরান এইচ সরকার এর বিশদ ব্যাখ্যা করেন। 'প্রগতিশীলতা, মুক্তচিন্তা, ধর্মবিদ্বেষ : একটি বিশ্লেষণ' (২০১৫), প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, স্থবির, ঘুনেধরা সমাজ যখন গুণগতভাবে ও সুসংহতভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে, তখন সে সংস্কৃতি হয়ে ওঠে প্রগতিশীল সংস্কৃতি। চেতনায় বিপ্লব ঘটানো, দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং ভাবনাকে শাণিত করা প্রগতিশীল সংস্কৃতির কাজ। বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ এবং তজ্জনিত কারণে সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম এমন মতবাদ – প্রগতিশীল মতবাদ। অপর পক্ষে, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সামাজিকভাবে সীমাবদ্ধ বিধান প্রতিক্রীয়াশীল মতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতির উৎস ধর্ম নয়, বরং লোকায়ত চিন্তা ও ভাবাদর্শ, যা প্রজন্ম – পরম্পরায় চলে আসছে। মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আধুনিক লিখিত সাহিত্যে কিছু ধর্মীয় ও অলৌকিক বিষয় থাকলেও পালা, পল্লিগান, যাত্রায় এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিস্তার লক্ষণীয়।

মূলত ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদারপন্থী মতবাদ – এমন উল্লেখপূর্বক হায়দার আকবর খান রনো 'ধর্মীয় মৌলবাদ বনাম বাঙালি সংস্কৃতি' (২০১৭) নিবন্ধে বলছেন :

> পাকিস্তান আমলে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কাজে আসেনি। এখনো যারা মনে করে, মুসলমানিত্ব পরিচয়ের জন্য বাঙালিত্ব ঘুচিয়ে দিতে হবে, তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করে। তারাই পয়লা বৈশাখের বিরোধিতা করে, আলপনা আঁকাকে সুন্দর আর্ট হিসেবে না দেখে আলপনার গায়ে কালি লাগায়, ভাস্কর্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে জানে না। ... ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, আমাদের সংস্কৃতিতে ধর্মীয় চেতনা কখনোই প্রাধান্য বিস্তার করেনি। বরং অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি – যা আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে ছিল এবং এখনো আছে, তা খুবই শক্তিশালী। (হায়দার আকবর, ২০১৭)

বাঙালির চিন্তা পদ্ধতিও যেন প্রভাবিত, অনেকক্ষেত্রে শর্তযুক্ত। যে প্রবণতায় ধার্মিক মানে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংস্কৃতিমনা মানে প্রগতিশীল। তবে ব্যক্তির প্রগতিশীলতা ধর্ম পালন বা সংস্কৃতি পালনের মাপকাঠিতে বিবেচ্য হতে পারে না উল্লেখ করে দিলশানা পারুল তাঁর 'রাষ্ট্রচিন্তা – প্রগতিশীলতা বনাম মৌলবাদ : বাংলাদেশের 'বাইনারি' রাজনীতি' (২০২০) নিবন্ধে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> প্রগতিশীল মানে প্র-গতি, গতির সামনের দিকে, মানে যেই চিন্তা মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে সেটাই প্রগতিশীল চিন্তা। এখন এই চিন্তা পদ্ধতি যদি আপনাকে সামনের দিকে পথ না দেখায় তাহলে এটা প্রগতিশীল চিন্তা না। আপাত অর্থে আমাদের মনে হয় এই ব্যক্তি সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত আছেন মানে উনার চিন্তা তুলনামূলক আগানো হবে, মৌলবাদী বা কট্টর হবে না। আবার ধর্মচর্চা করে বলে আমরা ধরে নেই যে, এর চিন্তা মৌলবাদী বা কূপমণ্ডুক হতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে আপনি কথা বলতে যেয়ে এইরকম অসংখ্য শিল্প সাহিত্যিক পাবেন যাদের রাষ্ট্র, রাজনীতি, মানুষ, সমাজ-সংস্কৃতি সমস্ত কিছু নিয়ে অত পরিষ্কার ধারনা নেই বা তারা খুব বেশি হয়তো ভাবছেনও না। আবার দাড়ি টুপি পরা অসংখ্য মুসল্লী পাবেন যারা রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি সমস্ত কিছু নিয়ে অনেক গভীর পর্যন্ত ভাবছেন, ভাবতে পারছেন। (পারুল, ২০২০)

আলোচনা দৃষ্টে বলা যায়, প্রগতিশীলতা এক অর্থে কল্যাণমুখী প্রক্রিয়া। মানুষের মানবিক, আর্থসামাজিক এমনকি রাষ্ট্রিক উন্নয়নে প্রগতিশীল নেতৃত্বের অপরিহার্যতা তুলে ধরে আবুল কাসেম ফজলুল হক 'জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ' (২০১৮) নিবন্ধে লিখেছেন, জনসাধারণকেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হয়, জনগণ নিষ্ক্রিয় থাকলে, জনগণের মধ্যে চাহিদা না থাকলে কখনো জনকল্যাণকর বা প্রগতিশীল নেতৃত্ব দেখা দেয় না। যে জনসাধারণ যখন যেমন নেতৃত্বের যোগ্য হয়, সেই জনসাধারণ তখন ঠিক সেই রকম নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। নেতৃত্বের মধ্যে জনচরিত্রের প্রকাশ থাকে এবং নেতৃত্বের দ্বারা জনচরিত্র গঠিত হয়।'

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ক্রম-পরিবর্তনশীল এই প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাচারিতা কাম্য নয়; নিয়ন্ত্রণের ধারায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণও এখানে অপরাধ বলে বিবেচ্য হয়। প্রগতিশীল সংস্কৃতি মূলত কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, প্রথাগত ও পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়। চিন্তা, জীবনচর্চা আর স্বাধীনতায় পরিশীলিতবোধ প্রগতিশীল সংস্কৃতির সুসংগঠিত রূপ। এর

পরিচয় থাকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষায়, চিন্তায় ও কর্মে। প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে বলা যায় একটি সচেতন জাতির সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব।

তাই এ সিদ্ধান্তে আসাই যায়, বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো সর্বজনীন এবং এগুলো প্রগতিশীলতাকে ধারণ করে। আত্মকল্যাণবোধ, মানবিক উন্নয়ন ও সমন্বয়ধর্মী পথকে সর্বজনীন উৎসবগুলো প্রশস্ত করে। দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে, উন্নত সমাজ নির্মাণের লড়াইয়ে সৃষ্টিশীল উৎস হয়ে উঠতে পারে প্রগতিশীল ঋতুভিত্তিক উৎসব।

প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও ঋতুভিত্তিক উৎসব

বাঙালির জীবনে ঋতু পরম্পরায় বিভিন্ন উৎসব আসে যায়। এই ঋতুউৎসব শুধু ব্যক্তি বা সমাজব্যবস্থাকে ভিন্নতর উচ্চতায় তুলে দেয় না, একটা জাতিকেও সৃজনশীলতার নব প্রতিভায় সমৃদ্ধ করে। যে-জাতির উৎসব নেই সে জাতি নিষ্প্রাণ, বন্ধ্যা, নীরক্ত ও সম্ভাবনাহীন; উল্লেখ করে শামসুজ্জামান খান (২০১৩ : ৯০) বলেন, যে-কোনো জীবনবাদী মানুষ নব-আনন্দে বাঁচার জন্য, জাতীয় সৃষ্টিশীলতার নানা দিগন্ত উন্মোচনের জন্য, নতুন নতুন শক্তির উৎস আবিষ্কারের জন্য নতুন নতুন উৎসব চায়।

তবে উৎসবের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহীত সৌন্দর্য এবং আত্মজাগরণের যে শিক্ষা, তা যেন অনেকাংশেই অবজ্ঞাত। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বঞ্চনা, সংকীর্ণ সম্প্রদায়-চেতনা। অথচ, ঔপনিবেশিক আমলে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ; এমন উল্লেখ করে বিশ্বজিৎ ঘোষ জানাচ্ছেন :

> নববর্ষ-উৎসবের অন্যতম শিক্ষাই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মিলিত জীবন প্রবাহ। কিন্তু বাংলাদেশে এক্ষেত্রে বিরাজ করছে এক বিশাল শূন্যতা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এখন আসন্ন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর। চারদিকে কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের গোপন/প্রকাশ্য প্রতিযোগ। বাংলাদেশ এখন বিদেশি দাতাদের খবরদারির অবাধ লীলাক্ষেত্র। চারদিকে বিরাজ করছে হতাশা, নৈরাজ্য আর চরম অসহায়তা। (বিশ্বজিৎ, ২০১৯ : ২৫৩)

অবস্থা দৃষ্টে, অপসংস্কৃতির এই আগ্রাসনে আমরা ভুলতে বসেছি জাতি হিসেবে বাঙালির মর্যাদা। ফলে, বাংলার কৃষ্টি-কালচার-ঐতিহ্য, বিশ্বমানবতার নেতৃত্বদানের মতো মহত্ব ও মানবিকতার আদর্শ থেকে বিস্মৃত জাতি বিভ্রান্তির অতলে নিমজ্জমান, উল্লেখপূর্বক আসাদ বিন হাফিজ (২০০৪ : ২২৭) মনে করেন, অপসংস্কৃতির ধারক বাহক একজন মানুষ থেকে সংস্কৃতিবান একজন মানুষের চিন্তা চেতনা অবশ্যই পৃথক। আর এ চিন্তা চেতনা পৃথক হওয়ার কারণে উভয়ের কর্মও পৃথক হতে বাধ্য।

সংস্কৃতি বিষয়ক পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা সূত্রে বলা যায়, ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে জীবনের অর্জিত স্বভাবের শোভন অভিব্যক্তি এবং জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনাচরণ সবই সংস্কৃতির প্রকাশ। যার প্রভাব সাহিত্য, শিল্প, ঐতিহ্যে, লোক-সংস্কৃতিতে গভীর। আহমদ শরীফ মনে করেন :

> ভাব-চিন্তা-কৃতির যে অংশ হিতকর ও গৌরবের তা-ই যেমন ঐতিহ্য বলে খ্যাত, তেমনি জীবন চর্যার যে অংশ সুন্দর-শোভন ও কল্যাণকর তা-ই সংস্কৃতি, বাদবাকী কৃতি বা আচার মাত্র। এ তৌলে যাঁরা মাপেন তাঁদের কাছে জীবনচর্যার কিংবা জীবনযাত্রার সবটাই সংস্কৃতি নয়। তাঁদের সংজ্ঞায় নগরবিহীন সভ্যতাও নেই। আমাদের ধারণায় সংস্কৃতির উৎকর্ষে সভ্যতার উদ্ভব। সংস্কৃতির বস্তুগত ও মানসসম্ভূত অবদানপুষ্ট জীবনপদ্ধতির সার্বিক ও সামগ্রিক উত্তরাধিকারই সভ্যতা। (আহমদ শরীফ, ২০০৬ : ২২)

এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে থাকে উন্নতির চেষ্টা। প্রগতিশীল সংস্কৃতি একদিকে আত্মগঠনের এবং অন্যদিকে সমাজ পুনর্গঠিত করার ব্যাপার। এর বিকাশমান ধারায় ব্যক্তি ও সমষ্টির মানবিক উন্নয়ন, পরিবেশের সংস্কার, রূপান্তর ও নবজন্ম ঘটে বলেই মত সমাজবিজ্ঞানীদের।

নিজের উন্নতির প্রয়োজনেই মানুষ তার সার্বিক উন্নয়ন করতে চায়। এটা তার সহজাত উৎকর্ষ প্রচেষ্টা। আবুল কাশেম ফজলুল হক 'জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ' নিবন্ধে (২০১৮) লিখেছেন, মানুষ শুধু বেঁচে থেকেই সন্তুষ্ট থাকে না, উন্নতি করতে চেষ্টা করে। আর নিজের উন্নতির প্রয়োজনে পরিবেশকেও সে উন্নত করতে চায়। এটাই মানুষের কৃষ্টিমানতা বা সংস্কৃতিমানতা। প্রগতিশীল সংস্কৃতি তার সেই উন্নয়ণ, উৎকর্ষ, সৌন্দর্য ও পূর্ণতাপ্রয়াসে সংস্কার প্রচেষ্টা :

> সমাজজীবনে যত মন্থর গতিতেই হোক, পর্যায়ক্রমে অন্যায় কমানো ও ন্যায় বাড়ানো সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রগতিশীল জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও শিল্পকলা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ তার সাংস্কৃতিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটায়। বিপ্লবে ও ন্যায়যুদ্ধে সংস্কৃতি থাকে। কিন্তু প্রতিবিপ্লবে ও অন্যায় যুদ্ধে সংস্কৃতি থাকে না, থাকে অপসংস্কৃতি। (আবুল কাসেম, ২০১৮)

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে থাকে উন্নতির বা প্রগতির প্রবণতা, চিন্তা ও চেষ্টা। মানুষের মনোদৈহিক উন্নয়ন, আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নয়ণে প্রগতিশীল নেতৃত্বকে অপরিহার্য মনে করেন সমাজবিদগণ। তাই সংস্কৃতির সর্বজনীন কল্যাণবোধে, জীবনযাত্রার প্রকাশ-ই প্রগতিশীল সংস্কৃতির পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে ঋতুভিত্তিক উৎসব কিভাবে তার পরিপূরক, সে বিষয়ে আরও আলোকপাত করা যাক।

বাংলার লোকউৎসব সমষ্টি-চেতনার ফলস্বরূপ বলে মনে করেন মাধুরী সরকার। তাঁর মতে (২০১৪ : ৮০), সংহত সমাজের সৃষ্টি বলে সমগ্র সমাজের বাসনালোক মুক্তি পায় উৎসব-কলায়, মানুষের আচার-আচরণে, নাচে-গানে। 'নবান্ন', 'পৌষালী', 'তোষলা' – এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

একুশ শতকে প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনে বিপর্যয়-বিপন্নতায় আচ্ছন্ন মানুষ মানসিক প্রশান্তি আর মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায় অসাম্প্রদায়িক লৌকিক উৎসবে। রবিউল হুসাইন বলেন :

> শুভ বোধ থেকে উৎসারিত মানবতার স্বরূপ বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি আলোচিত দিক নির্দেশনার সুযোগ করে দেয় যা দেশের ভবিষ্যতকে আরও গৌরবময় ও প্রীতিময় করার পথে সবাইকে অগ্রসারিত করে। এই মঙ্গলময় বোধই আমাদের ভবিষ্যতের পথকে আলোকজ্জ্বল করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করে। (রবিউল, ২০০৮ : ৩১৬)

ঋতুভিত্তিক উৎসব মানুষের আশা-প্রত্যাশার প্রতিফলন, সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই উৎসব উদ্‌যাপনের বিশেষত্ব এখানেই। কোনো সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবন তার উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, এমন মত দিয়ে সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে প্রসঙ্গ এনে বলেন :

> কৃষিজীবী বাঙালি সমাজ ছাড়াও আরও নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবান্ন বা সমগোত্রীয় উৎসব লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের নবান্ন জাতীয় উৎসবের মধ্যে বাঙালির নবান্নর তুলনামূলক আলোচনা করলে অর্থনীতি আর ধর্মের অন্তর্লীন যোগসূত্র উৎসমূলে কিভাবে রয়েছে তার একটি সূত্র যেন আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। (সুমহান, ২০১৪ : ৯১-৯২)

দীপককুমার বড় পণ্ডা মনে করেন, নবান্নে সারা বছরের খাবার ঘরে ওঠে। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ সমাজের সম্বৎসরের পরিকল্পনা, লৌকিকতা, চিকিৎসা, সামাজিকতা সবকিছুতেই এ উৎসব প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন :

> আদতে কৃষি বা শস্য উৎসব হলেও এর ব্যপকতা শুধু কৃষি বা শস্যের মধ্যে আটকে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে পরিবার থেকে পাড়ায় এবং তারও বাইরে। যেন গ্রামীণ জীবনকে ধরে রাখার উৎসব এই নবান্ন। ... এর সঙ্গে আছে পারিবারিক আনন্দ কিংবা সামাজিকতা। (দীপককুমার, ২০১৪ : ৭৪)

নববর্ষ উৎসব ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালি পালন করেন, যেখানে বিত্ত আর সামর্থ্যের বিষয়টি গৌণ, এমন মত সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের। এই উৎসবের রূপটি ধর্মীয় নয় বিধায়, নববর্ষের উৎসবটি আর দশটা উৎসব থেকে আলাদা, উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ধর্ম ও গোত্রনির্ভর উৎসবের ভিড়ে নববর্ষ আমাদের জানিয়ে দিয়ে যায় আমাদের সংস্কৃতিটি মানুষে মানুষে মিলন প্রতিষ্ঠা করে এই সংস্কৃতি বিভাজন ও বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করে।' (মনজুরুল, ২০০১ : ২৫)।

ঋতুভিত্তিক উৎসব মানুষের প্রকৃতিগত চেতনার সঙ্গে যুক্ত। এমন অসাম্প্রদায়িক উৎসবের গণ্ডি নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য বলে মনে করেন সংস্কৃতজনেরা। ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো যে সামাজিক বা পারিবারিক রীতির অংশ, তা স্বীকার করেছেন আমিনুর রহমান সুলতান (২০১৪ : ৫৬)। তিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত লোক-উৎসবের ব্যপ্তি ও লোকজ সংস্কৃতির অপরিমেয় শক্তিকে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন।

কৃষিনির্ভর বাংলায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, উৎসব, পার্বণ সবকিছুই শস্য ও প্রকৃতি কেন্দ্রিক। শস্য বেশিরভাগ আয়োজনের কেন্দ্র হলেও ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলোয় প্রাধান্য পায় প্রকৃতিবন্দনা। তিতাশ চৌধুরীর (২০১৪ :

৫৪) মতে, বাঙালির মননে নিবিড়ভাবে যুক্ত সর্বজনীন উৎসব ব্যাপারটির ভেতর নিহিত থাকে এক পবিত্র আনন্দ।

ঋতুভিত্তিক উৎসব-আনন্দের একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে মেলা। আর, কোনো মেলাই ধর্মীয় প্রভাবে সীমাবদ্ধ না। মেলায় বিভিন্ন লোকজ সামগ্রী, গার্হস্থ্য উপকরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উৎসব উপভোগ করার সুযোগ মেলে ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের। সর্বজনীন এই উৎসবের গুরুত্ব বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় রায় মনে করেন, অনেক কষ্টের মাঝেও মানুষ মেলার আয়োজন করে, মেলায় যায়, আড়ং খরচ জমায়, মেলার গান বাঁধে। শত দুঃখের মাঝেও উৎসব আর মেলায় আনন্দে মেতে ওঠে :

> মেলা মানেই মেলা অর্থাৎ অনেক মানুষের মিলন। মেলায় কেনো ধর্ম বর্ণের বাছ বিচার থাকে না। সবাই মেলায় যায়। কেউ যায় আনন্দ করতে, কেউ যায় বাণিজ্য করতে, আবার কেউ যায় পুণ্য লাভের আশায়। বিভিন্ন লোকজ সামগ্রী কেনা বেচার এক মোক্ষম জায়গা হল মেলা। সার্কাস, পুতুল নাচ, কবিগান, জারিগান, যাত্রাপালা ইত্যাদিও অনেক মেলায় পরিবেশিত হয়। ... এখন যে কোনো মেলাই সব মানুষের মিলনভূমি। ছোট-বড়, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র সবাইকে মেলা যেন মিলিয়ে দেয়। অন্তত মেলার সময়টা যেন আমরা সবাই এক হয়ে যাই, ভুলে যাই আমাদের সব বিভেদ। তাই যে কোন মেলায় গিয়ে মনে হয়, এই মহামিলন আমাদের অক্ষয় হোক। আমরা সকল মানুষ সমান হই, সকলে মিলে আনন্দ উৎসব করি। (মৃত্যুঞ্জয়, ২০১০ : ১২৩)

মহামিলনের আনন্দ সমাবেশে ঋতুভিত্তিক উৎসবের দিনটি খুব কাঙ্ক্ষিত থাকে মানুষের কাছে। চৈত্র সংক্রান্তি, বর্ষবরণ, আষাঢ় উদযাপন, শরৎ বন্দনা, হেমন্তের নবান্ন উৎসব, পৌষমেলা, শীতের পিঠা উৎসব বা বসন্তবরণ অনুষ্ঠান বিভিন্ন আচার আনুষ্ঠানিকতায়, ব্যবহারিক আয়োজনে সমাজব্যবস্থাকে বিকশিত করে এসেছে, আবহমানকাল ধরে।

এই দিনগুলো ঘিরে থাকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও। মানুষে মানুষের মিলন ও ত্যাগের আনন্দে যেমন মিশে থাকে পরিতৃপ্তির আমেজ, ঘটে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ, তেমনি মানসিক দূরত্ব ঘোচানোর এক আনন্দ উপলক্ষ, নতুন প্রেরণা এই ঋতুভিত্তিক উৎসব। পারিবারিক বা ধর্মীয় উৎসবগুলোয় সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে বিধি-বিধান থাকলেও, ঋতু উদ্‌যাপনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি বেশ সাবলীল। পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে একে-অন্যের সাথে মিলিত হয়ে এবং হতাশা ছাপিয়ে নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে সামাজিক সখ্যের ভিত দৃঢ় করে ঋতুভিত্তিক উৎসব।

জনগণের স্বীকৃত ধারণার ভিত্তিতে তার এই উৎসবগুলো হয়ে ওঠে প্রগতিশীল। ঋতু-উৎসব ভাবনায় প্রগতিশীল সংস্কৃতি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার, তেমনি তা সজ্ঞান সতর্ক চর্চারও ব্যাপার। অসাম্প্রদায়িক এই সাংস্কৃতিক উৎসবে প্রগতির জন্য মানুষ তার আদিম সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে নৈতিক সত্তার অনুসারী হয়ে ওঠে। প্রগতি কার্যকর হয় প্রতিক্রিয়াশীলতার মোকাবেলায় মুক্তবুদ্ধি মানুষদের সাথে নিয়ে।

ঋতুভিত্তিকত উৎসবে প্রগতিশীল সংস্কৃতির ভূমিকা

উৎসবের সেই আনন্দদায়ী রূপ আজও আছে, বরং তার অনুষ্ঠানে প্রধান অংশ – কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা সবটুকু জায়গা জুড়ে। আধুনিক জীবনের অসহনীয় ব্যস্ততা আর দিন যাপনের গ্লানির মধ্যে, থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় জাতীয় কর্মমালার একঘেয়েমির ভেতর, আজও মানুষকে দেয় হাঁফ ছাড়বার অবকাশ, সেই সঙ্গে মনটাকে আনন্দের খোলা হাওয়া খাইয়ে নতুন কর্মোদ্যমের জন্যে চাঙা করে তোলার সুযোগ। ঈদে, দুর্গাপূজা, বড়দিন ইত্যাদির মতো ধর্মীয় উৎসবে মানুষ ঘরমুখো ছুটে আসে কেবল ধর্মের টানে নয়, ওই অবকাশ আর সুযোগের টানেও। বস্তুত ঐগুলিই হয়ে ওঠে উৎসবকালে তার প্রধান আকর্ষণ। ঘরে ফিরলে সে পায় দুটি দিন আজকের মানুষের কাছে উৎসবের সবচেয়ে বড় মূল্য, সবচেয়ে গভীর তাৎপর্য এইখানেই। তার থেকে আনন্দদায়ী অনুষ্ঠান এখন মানব সমাজে আর নেই।

একসময় নবান্ন, পৌষ-পার্বণ, উৎসব, আচারে ঐক্যের দিকটি যেমন মুখ্য ছিল, তেমনি লৌকিক উৎসবগুলো ছিল বিনোদনের অংশ। সময়ের সাথে উৎসব আয়োজনে প্রগতিশীলতার সেই সংস্কৃতি, সেই উচ্ছ্বাসে অনেকটা ভাটা পড়লেও, এই ঋতু উৎসবের উপযোগিতা এখনও অমলিন বাংলার প্রতিটি গৃহে। মোমেন চৌধুরী লিখেছেন :

> লৌকিক পালা-পার্বণ, বিশেষ করে এখন কৃষি পর্যায়ে যেগুলো আছে, সেগুলোর ব্যাপকতা অনেক কমে এসেছে, তবে যেটুকু এখনো আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে পাই, তার অনেকটাই সাংস্কৃতিক চেতনাপ্রসূত। (মোমেন, ২০১৪ : ৪২)

এই চেতনাকে, এই স্ফূলিঙ্গকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার দ্বায়িত্ব অসাম্প্রদায়িক বাঙালির। নইলে, জাতি হয়ে উঠবে আত্মপরিচয়বিস্মৃত, স্বতন্ত্রচেতনা রহিত, শিকড়-বিচ্ছিন্ন জাতি। সামাজিক অবক্ষয় রোধে সংস্কৃতি এক রক্ষাকবচ, এ কথা বলেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ। শিল্পকলা পদক ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন :

> একটি জাতির তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেমের চেতনা বিকাশসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য জাগিয়ে তুলতে সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিশু, কিশোর ও যুবকদেও ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিষবাষ্প থেকে দূরে রাখতে তাদের মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের জানাতে হবে, আমাদের এই মাতৃভূমিতে জঙ্গিবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। হাজার বছর ধরে নানা জাতি-ধর্মের মানুষ এই ভূখণ্ডে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সুমহান ঐতিহ্য। (আবদুল হামিদ, ২০১৮)

সাম্যবাদী সমাজ গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ স্মারক সংকলন এর উদ্ধৃতি দিয়ে অনুপ সাদি তাঁর 'সংস্কৃতি সম্পর্কে লেনিনবাদ হচ্ছে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের

প্রগতিশীল সংস্কৃতি' (২০২১) নিবন্ধে লিখেছেন, লেনিন সংস্কৃতিকে শান্ত জীবনের উপাদান হিসেবে দেখেননি। মার্কসের হাতে ঢেলে সাজানো অর্থশাস্ত্র শ্রেণিসংগ্রাম উত্তরণে যেমন সাম্যবাদীদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই লেনিন প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেবার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। লেনিন মনে করেন, সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার জন্য বুর্জোয়াদের থেকে ক্ষমতা নিজেদের কাছে নেওয়া দরকার। এজন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে টানতে হবে। সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা জাতিকে এক উচ্চতর প্রলেতারিয় গণতন্ত্র দিতে পারে কিন্তু এর ফলে আমলাতন্ত্র দৃঢ় হয়। ক্ষমতা মেহনতি মানুষের থাকে না। এজন্য আইনই যথেষ্ট নয় প্রয়োজন কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন, যা গড়ে ওঠে দীর্ঘ মেয়াদি প্রচেষ্টায়।

এই প্রচেষ্টায় ধর্ম প্রভাবিত না হয়ে মনুষ্য পরিচয় প্রতিষ্ঠা জরুরি বলে মনে করেন সমাজ বিশ্লেষকরা। 'ধর্মান্ধতার অন্ধকার নয়, বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান করতে হবে' (২০১৭) প্রবন্ধে জেবুন্নেসা চপলা মনে করেন, বাঙালির প্রথম পরিচয় সে একজন বাঙালি। তাই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসই তার জাতিসত্তার মূল ভিত্তি। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র – বাংলার প্রত্যেক মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে জনগণকে মুক্তি দেয়া। শুধু তাই নয়, বাঙালি হবে একটি অসাম্প্রদায়িক জাতি। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিশ্র আদর্শে বাংলা ভূখণ্ড পরিচালিত হবে।

অথচ, এই ভূখণ্ডে বিবেকবান, অসাম্প্রদায়িক মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদী মনের মানুষ যেন আর তৈরি হতে না পারে সেজন্য শিক্ষাব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ছলে-বলে-কৌশলে, এমন আশঙ্কা করে জেবুন্নেসা আরও বলেন, বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাংলাদেশের সংবিধান, অর্থনীতি, আইন, সমাজ ব্যবস্থা, মানবাধিকার এবং নৈতিক জ্ঞান ছাড়া বেড়ে উঠলে সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মান্ধতার অন্ধকার সে জাতির সঙ্গী হবে সেটাই স্বাভাবিক।

এই উগ্রপন্থী চিন্তা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার বিশেষ শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান করতেই হবে। বাঙালিয়ানার সাংস্কৃতিক শেকড়ের খোঁজে বের হলেই জানা যাবে সভ্যতার সুপ্রাচীন ইতিহাস, পরিষ্কার হয়ে যাবে ইসলামিক ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস আর আজও চারিদিকে ধর্ম নিয়ে ঠোকাঠুকির কারণগুলো। তাঁর মতে :

> শেকড়ের ইতিহাস না জানলে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে না বুঝলে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ এর বহুমাত্রিক কারণগুলো কখনই জানা যাবে না। এগুলো বুঝতে হলে সামাজিক বিজ্ঞানের মাল্টিডিসিপ্লিনারি জ্ঞানকে অবহেলা করলে চলবে না। বর্তমান বাংলাদেশের জন্য ক্রিটিক্যাল থিংকিং, বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী শিক্ষা, 'ডিকলোনাইজেশন অফ থটস' ভীষণ জরুরী যা সাম্প্রদায়িক মানসিকতার মানুষদের চিন্তাকে উগ্রবাদ থেকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। (জেবুন্নেসা, ২০১৭)

এভাবেই সমাজে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সুনাগরিক তৈরি করা যেমন সম্ভব, তেমনি কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক অন্ধকার দূর করাও সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

এই সংস্কৃতি চর্চার প্রচলিত বেদনাদায়ক রূপটি তুলে ধরেন এস. এ. জাহাঙ্গীর আলম। 'প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত মিশন-ভিশন অর্জন প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণের বিকল্প নেই' প্রবন্ধে (২০২১) তিনি উল্লেখ করেন :

> শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যখন রাজনৈতিক চর্চা বন্ধ রাখা হয় কোনো কারণে, তখন শুধু প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার রাজনীতির চর্চাই বন্ধ থাকে মাত্র। বিপরীতে সাম্প্রদায়িক ধারার রাজনীতি যেহেতু ধর্মাশ্রয়ী চরিত্র নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়, কাজেই এসব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চর্চা দুর্বার গতিতে বিনা বাধায় বিস্তার লাভ করে থাকে। (জাহাঙ্গীর আলম, ২০২১)

তাই সুস্থ ধারার শিল্প, সহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চর্চা সমাজে যত কমতে থাকে প্রগতিশীল মানুষের জীবনযাত্রা তত বেশি বাধাগ্রস্ত হবে, বিপদের সম্মুখীন হবে, সমাজে অস্থিরতা বাড়বে, যুব সমাজের অবক্ষয় শুরু হবে, সর্বোপরি সমাজ তার বাসযোগ্যতা হারিয়ে অসারে পরিণত হবে। আর এই অসারতার অন্ধকার প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য অবারিত সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশঙ্কা করেন জাহাঙ্গীর আলম।

এক সাক্ষাৎকারে বসন্ত উৎসব উদযাপন পরিষৎ এবং সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী বলেন, বাঙালিকে সংস্কৃতিমুখী করে তোলার সাথে প্রকৃতিবান্ধব করে তোলাও জরুরি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি হয়তো কিছুটা সংস্কৃতি বান্ধব হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রকৃতির সাথে এই প্রজন্মের যোগ নেই বললেই চলে। তারা চাঁদের সৌন্দর্য দেখে না, গাছের ফাঁকে এর অভূত রূপ জানে না। এই প্রজন্ম দেখেনি ভরা নদীর সৌন্দর্য, শরতের আকাশ, কাশফুল, প্রকৃতির সাথে সখিতা নেই তাদের। প্রকৃতি প্রাকৃতিক ধ্বংসের হাত থেকে প্রাণিকূলকে সুরক্ষা দেয়। বায়ূদূষণ রোধ করে। প্রকৃতি বাঁচিয়ে না রাখলে ধ্বংস হবে সমাজ। এই প্রকৃতিই যে সুরক্ষিত রাখে জাতিকে, তার কতটুকু উপলব্ধি করে মানুষ! এসব কারণেই ঋতুভিত্তিক উৎসব অনিবার্য। উৎসবের বিবর্তনের মাঝেও যত বেশি এই উৎসবগুলো আয়োজন করা হবে, তত বেশি মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছাবে যে প্রকৃতি বান্ধব হবার বিকল্প নেই।

এছাড়াও আমাদের দেশীয় ফল, ফুল চেনা, নানা নকশা আর স্বাদের পিঠার সাথে পরিচিত হওয়া, এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে, এই শিল্পের সাথে পরিচিত হতে সহায় ঋতু-উৎসবই।

বিবর্তনের ধারায় অনেক কিছুই আসবে, কিন্তু কখনই একটি জাতির শেকড় বিচ্ছিন্ন হওয়া কাম্য নয়। অবারিত আকাশ সংস্কৃতি থেকে কতটুকু গ্রহণ করবো সে রুচিবোধ জরুরি। তা কখনই বাঙালি স্বকীয়তা ছেড়ে নয়। তবেই সংস্কৃতির শেকড় হবে মজবুত এবং সে পথে পথভ্রষ্ট হবে না এই প্রজন্ম। ভাবনার বিষয় হলো, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব দিকেই বাঙালির অঢেল সম্পদ আছে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো

মানসিকতা বা যৌক্তিকতা আমরা বিবেচনায় আনতে পারছি না। শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি হলেও রুচির জায়গাটা গড়ে উঠছে না। এমন আশঙ্কা থেকেই যেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছিলেন, রুটির লড়াইয়ের সাথে রুচির লড়াইটাও জরুরি। রুচির লড়াইটা হয়ে উঠছে না। কারণ সেখানে সংস্কৃতি নেই। তাই শেকড়ের সন্ধান পেতে, এই ভাবনাকে মননে পৌঁছে দিতে ঋতু উৎসবগুলো জরুরি। বাঙালি যেন অর্থ বিত্তের সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়, ঐতিহ্যকে বলিষ্ঠ করতে পারে সেজন্যই ঋতু উৎসব।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে বলা যায়, মানবতার উন্নয়ন, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ সমাজগঠনে ঋতুভিত্তিক উৎসব সুষম সমাজ গঠনকে নিশ্চিত করে। একবিংশ শতকে মানবিক সভ্যতা যত রকম বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে, তার মধ্যে সাংস্কৃতিক হামলাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিবাদী সভ্যতা ও ভোগবাদী সংস্কৃতি সুস্থ সংস্কৃতির ধারাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তৈরি করছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। তাই জাতির বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করার বিকল্প নেই। দৃশ্যমান এই পৃথিবীর বাইরেও যে বিরাট জগৎ, বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষাদিবস অর্জনের গৌরব – সবকিছু ধারণ করেই গতিশীল হয়েছে বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আত্মবিশ্লেষণের পথকে যেমন দেখিয়ে দেয়, তেমনি সমতাভিত্তিক উদারতা গ্রহণের শিক্ষাও দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল এই উৎসবগুলোর যেমন সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে, তেমনি এগুলো মানুষকে একে-অন্যের পরিপূরক ও সহযোগী করে। সুশীল সমাজের চিন্তা, কর্মে, সহিষ্ণুতায় সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগ্রত করতে অসাম্প্রদায়িক উৎসব গুরুত্ববহ। অপরাধ প্রবণতা আর দুর্নীতির পথ পরিহার করে, জাতিকে একই আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা চেতনায় গড়ে তুলে ঐক্যের ভিত মজবুত করতে,সহমর্মী পরিবেশ তৈরি করতে, সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে সমুন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুযোগ তৈরি করে প্রগতিশীল ঋতুভিত্তিক উৎসব।

পরিশেষে বলতে হয়, সব আনন্দ আয়োজনের মর্মকথা – সহমর্মিতার মাধ্যমে শান্তির বিকাশ সাধন। বর্ণগত বা আর্থিক অবস্থানগত শ্রেণিভেদের উর্ধ্বে যে অবস্থান, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণসাধনে ঋতুভিত্তিক উৎসব সেই আদর্শ মৈত্রী সম্মেলন হিসেবে ভূমিকা রাখে। এ উৎসবে মানবিক মূল্যবোধের ও সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের বিকাশ ঘটে। সমঝোতা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সংবেদনশীলতার নানামাত্রিক প্রকাশ ঘটে। ঋতুউৎসব জীবন-সংসারের অবসাদ ভুলিয়ে অহিংসা, অভেদ আর বিবেচনাবোধের প্রসার ঘটায়।

এখান থেকে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে এই প্রবণতা গঠনমূলক নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধিবিধান আত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত করে, বাঙালির শিকড়সংলগ্নতার সাথে সংস্কৃতির সংযোগ স্থাপন করে সর্বজনীন ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো।

তৃতীয় অধ্যায়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উৎসবে প্রত্যাশা ও আমাদের দায়

উৎসবকে বলা হয়েছে আনন্দের সহযাত্রী। যে দিনটি বছরের অন্য দিনগুলো থেকে বিশেষ। উৎসব শুধু মানব জীবনেই নয়, আছে প্রকৃতিতেও। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, হেমন্তের সূর্য কিরণে অগ্রহায়ণের পক্ক শস্যসমুদ্রেও হিল্লোলিত হয় সোনার উৎসব। প্রকৃতির সেই রূপ লাবণ্যে আন্দোলিত হয় মানব মনও। উৎসবের দিনে মানুষ সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে বলেই উৎসব খুব কাঙ্ক্ষিত। উৎসব এক সামাজিক উৎকর্ষ, যা পরিশুদ্ধ করে আত্মসংস্কৃতি, দূর করে শ্রেণিবৈষম্য, শাণিত করে জাতির ঐক্যবোধ।

এত কিছুর পর এবং এতটা সময় পেরিয়ে এই প্রশ্ন থেকেই যায়, বারো মাসে তের পার্বণের দেশ বাংলাদেশে উৎসবপ্রিয় বাঙালির উৎসবগুলো সত্যিকার অর্থে কতটা স্বস্তির। উৎসব প্রাঙ্গণে একে অন্যের আনন্দের সহযাত্রী কি হয়ে উঠতে পারে; কিংবা উৎসব ঘিরে কেন সহিংসতা চলে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঘিরে পূজামণ্ডপে ধর্ম অবমাননার সূত্র ধরে তাণ্ডব চলেছে। আবার রমনার বটমূলে বোমা হামলা থেকে শুরু করে মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদের দিনে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকায় জঙ্গি হামলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলার উৎসব চত্বরে প্রবাসী লেখককে কুপিয়ে হত্যা, নববর্ষের সন্ধ্যায় ভূভূজেলা বাজিয়ে নারীর ওপর হিংস্রতা – এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। অনেকের মনে হবে এসব ঘটনা উৎসব সংশ্লিষ্ট না, হয়তো বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশে কোনো আনন্দ উপলক্ষ্যে এই দিনগুলো দেখতে হবে, এটা খুবই বেদনার ও অপ্রত্যাশিত। এসব ঘটনা জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদাটুকু বিনষ্ট করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অর্থই এখানে অর্থহীন। উৎসবের কল্যাণ চিন্তার স্ফূরণ ঘটেনি বলেই বৃহত্তর কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রেমই উৎসবের দেবতা – মিলন তাহার সজীব সচেতন মন্দির। তাহলে প্রেমময় সেই মিলনমেলায় প্রাণের উৎসব কেন কলঙ্কিত হয়েছে বারবার! উৎসবের আলোকে ম্লান করে দেয়া মানুষরূপী বিভীষিকারা কবে মানবিক হবে? হবে পরমত সহিষ্ণু, সংস্কৃতিবান?

উৎসবে সহিংসতা বা নারীনিগ্রহের ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিরা দুর্ধর্ষ অপরাধী, উল্লেখ করে হাসান মামুন (২০১৫) লিখেছেন, উৎসবের কাঁটা হয়ে যারা এসব ঘটাচ্ছে বা ঘটিয়েছে তাদের অন্তত ক'জনকে প্রকাশ্যে কোনো দণ্ড দেওয়া যায় কিনা। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে 'লাঞ্ছনাকর দণ্ড' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু জাতির মুখ মলিন করে দেওয়া নানা ঘটনাদৃষ্টে তিনি মনে করেন, কিছু 'দৃষ্টান্তমূলক' ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকার ও প্রশাসনকে যুক্ত হতে হবে।

অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তই পরবর্তী অপরাধে সাহস যোগায় উল্লেখ করে আলমগীর শাহরিয়ার, (২০২১) 'সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, সহিংসতা ও বর্বরতার শেষ কোথায়?' প্রবন্ধে লিখেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখ দিয়ে দেখলে সংখ্যালঘুর মন বোঝা যায় না। বিপরীত দিক থেকে ভাবলেই কিছুটা আন্দাজ করা যায়। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা যদি ভাবতেন যে তাদের ধর্মীয় উৎসবে শহরজুড়ে পাহারা দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কারণ কিছু ধর্মোন্মাদ মানুষ একটা হুজুগ তুলে যে কোনো সময় হামলা করতে পারে, তবে সেটা নিশ্চয়ই খুব স্বস্তির হতো না। সশস্ত্র পাহারা দিয়ে হয়তো সাময়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, কিন্তু আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ তৈরি করা যায় না।

যতদিন পর্যন্ত মানুষ শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি চিন্তা চেতনায়ও যৌক্তিক আচরণ করার মতো বোধ-বুদ্ধির অধিকারী না হবে,ততদিন অতীতের মতো ভবিষ্যতেও অনেক ধর্মীয় ইস্যুকে রাজনীতির মোক্ষম হাতিয়ার করা হবে এমন আশঙ্কা করেন আলমগীর শাহরিয়ার। তাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, নিবিড় পরিচর্যায় এ গভীর ক্ষত দ্রুত সারানো জরুরি বলে মনে করেন তিনি।

অসাধু, দুর্বল শ্রেণির কর্মফলের ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির ওপর বর্তাবে, তা কখনই কাম্য নয়। উৎসব এই শেখায়, বিপ্লবের রণসঙ্গীতকে পরিবর্তন করতে হবে সাম্যের গণসঙ্গীতে। শোষণ, সন্ত্রাসবাদ, অবিশ্বাস আর বৈষম্য মুছে ফেলে অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা, সাম্য আর কর্মপ্রচেষ্টার মতো গুপ্ত শক্তিগুলোকে জাগ্রত করবে অসাম্প্রদায়িক উৎসব।

উৎসবে প্রত্যাশা

উৎসবের দিন আমাদের প্রতিদিনের নিরানন্দ চিত্তটা আনন্দময়ের কাছে প্রার্থনা করে সকল দীনতা, কৃপণতার উর্ধ্বে উঠে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হবার (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৫০০)। রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর রেষ ধরে বলা যায়, উৎসবের শিক্ষা মানুষকে মহানুভব করে। উৎসব জাতীয় জীবনের অধিকার আদায়ে জাতিকে সংগঠিত ও অগ্রসর হবার এক প্রেরণা। ঐতিহ্যকে লালন করা এবং আত্মসংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল জাতি তৈরি করা উৎসবের সার্থকতা।

বাঙালির সাংস্কৃতিক উৎসবের ইতিহাসে দেখা যায়, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করতে এবং সুস্থ ধারার সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়েও লক্ষ্য অর্জনের চালিকাশক্তি হিসেবে অগ্রগামী ছিল জাতীয় ও রাজনৈতিক উৎসবগুলো। তাই উৎসবের কাছে রবীন্দ্রনাথের (১৯৬৭ :৩৩৮) প্রত্যাশা – বিশ্বজগতে প্রাচুর্য, ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে যিনি অমৃতরূপে বিরাজমান তাঁর সেই শক্তিই যেন বিরাজ করে উৎসবে। আর সেই উপলব্ধিতে মানবিক দৈন্য দূর করার আহ্বান জানান তিনি :

> এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরম গতি, সকলেই তাহার আপন–ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৩৯)

বাঙালির জীবনচর্যার মৌলভূমে লোক-উৎসবের তেমন কোনো দীনতা কোনোকালে ছিল না। বাঙালির যে সংস্কৃতি, তার উৎসভূমিতে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তার জীবন-জীবিকা-দর্শনের কেন্দ্রে আছে নিজস্বতা। সেখানে জীবন উপোভোগের জন্য উৎসব, আনন্দস্মৃতি রোমন্থনের জন্য উৎসব।

শেখ মাসুম কামাল (২০০৯ : ১০০), লিখেছেন বাঙালির সব আয়োজন অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে ধর্ম যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি কিছু অনুষ্ঠান রোমান্টিক যার আত্মিক তাৎপর্য বেশ নান্দনিক :

> প্রাচীন উৎসবে নরবলি পাঠাবলি কুমড়োবলি দিয়ে জীবনব্যপী উল্লাসে মত্ত হয়ে জীবনকে উপভোগের সন্ধান যেমন বিরল নয়, আবার অপার্থিব সুখস্মৃতির চরণামৃত পানের মধ্য দিয়ে দেব-দেবীর সুখ উৎপন্ন করতে নৃত্যগীত পটীয়সী সেবাদাসীর অন্তরে ঠাকুরের দান গ্রহণের বিষয়ও অন্তঃসলিলা হয়ে আছে সমাজে। ... নাচ-গান অনাবিল আনন্দ জুগিয়ে চলেছে বাঙালির মনে অনাদিকাল থেকে। বিমিশ্র সে ধারার অবশেষাংশ সময়ের দুরন্তকাল পর্যন্ত জীবন্ত। (মাসুম, ২০০৯ : ১০০)

শুধু তাই নয়, একটা সময় ছিল যখন বাঙালির উৎসবের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণও ছিল কষ্টসাধ্য। যদিও কালের প্রবাহে অনেক উৎসবের সাথে জনমানুষের সংযোগ নেই, অনেক উৎসব বিলুপ্ত, কোনোটা ক্ষয়িষ্ণু। তারপরও, কিছু উৎসব সর্বজনীনভাবে বা জাতীয় পর্যায়ে উদযাপিত হয়, আর কিছু উৎসব টিকে আছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেরণাতেই। উৎসব স্বপ্ন আর কল্পনার জগৎকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ধরায় নামিয়ে আনে। মাসুম কামাল উদাহরণও তুলে ধরেন :

> বাঙালির জীবনে বর্তমান কাল অবধি যে সকল লোক-উৎসব পরিদৃশ্যমান, তা পেলাম বিবর্তনের ধারায়, বিচিত্র সম্ভারে, সর্বজনীনরূপে। যে কারণে দেখি সত্যনারায়ণের অপর নাম সত্যপীর, বনমার অপর নাম বনবিবি, গাজি পীরের সম্মোহনী শক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল গাজি ঠাকুর। এমনকি ঝুলন উৎসব, চড়ক উৎসব, গাজন উৎসব, ভাসান উৎসব প্রভৃতি উৎসব প্রায় একশ বছর আগেও সর্বজনীন উৎসব হিসেবে গণ্য হতো গ্রামে গ্রামে। এসকল উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে প্রাণ পাওয়া যাত্রাপলা এবং নাচ-গান। (মাসুম, ২০০৯ : ১০১)

সুস্থ ধারার উৎসব সুস্থ সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে; আর সুস্থ ধারার সংস্কৃতি ভিতরে ভিতরে কাজ করে, গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতির সেবকরা সেই চেষ্টাতেই ভরসা নিয়ে পথ চলা অব্যাহত রাখেন; উল্লেখ করে

সন্‌জিদা খাতুন বলেন, 'বাংলাদেশের বাঙালি এখন বাংলা উচ্চারণ, বানান, সাহিত্য, ঐতিহ্যসম্মত সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্যের উৎকর্ষ সাধনে নিবেদিত।' (সন্‌জীদা, ২০১৬ : ৫১২)

বাংলার লোক-উৎসবের অতলান্তে যেমন রয়েছে দ্রোহের সুর, অপরদিকে রয়েছে সুনির্মল জীবনের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণের সাধই উৎসবকে কাঙ্ক্ষিত করে।

বাঙালির সামাজিক জীবনে যে উৎসবগুলো স্মৃতিপটে ভাস্বর, যে উৎসব মিশে আছে জীবনের বাঁকে, সেগুলো বিপুল প্রণোদনারও উৎস এবং এর মধ্য দিয়ে সংহত সামাজিক জীবনের নানা ব্যঞ্জনাও ফুটে ওঠে। জনপদে বিমলানন্দে প্রাণের স্রোত বইয়ে দিয়ে যায় উৎসব। উৎসবে সমষ্টির আবেগের যে প্রকাশ তা যেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেজে ওঠে প্রার্থনাসঙ্গীতের সুরে। মানবতার জয়গানে সুপ্রাচীন এই সুর যুগে যুগে বিরাজমান থাকুক- এমন প্রার্থনায় মাসুম কামাল আরও লিখেছেন :

> শত শত বছরের প্রাচীন এসকল উৎসব সর্ব ধর্মের দর্শনের মিশ্রণে গড়া একটি ছাঁচের মধ্য থেকে উৎপন্ন হয়ে যে সমন্বিত রূপ ধারণ করেছে, এ দাবি যুক্তিনিষ্ঠ। যে কারণে মনসার ভাসান, বেরা ভাসান, গাজীর গান, জাগগান, সত্যপীরের পাঁচালী, পৌষ সংক্রান্তি, রাস উৎসব, রথ-যাত্রা, লোক-যাত্রা, কবিগান, আলকাপ – এসকল বিচিত্র ধারার লোক উৎসবের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক এমনকি সমন্বয়ধর্মী মানবীয় চেতনার যে সৌধ রচিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে সর্বজনীন অথচ সুপ্রাচীন একটি রূপ। (মাসুম, ২০০৯ : ১০০)

উৎসবে সাম্প্রদায়িক চেতনা বা জাতিভেদের উর্ধ্বে ওঠার আকাঙ্ক্ষা স্বত্ত্বেও, বাঙালির বিভ্রান্ত হবার সুযোগ রয়ে যায়। কারণ, হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি – বিজাতি, বিভাষী, বিদেশিদের দ্বারা শুধু পীড়িতই হয়নি, বরং ভিনদেশী সংস্কৃতিকে ধারণ করার অপচেষ্টা করে, তার সজাত্যবোধ নিয়ে প্রবঞ্চনা করেছে, সজ্ঞানে এক মিথ্যা পরিচয় বহন চলেছে। এই মনোভাব তার সংস্কৃতি বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করছে; উল্লেখ করে আহমদ শরীফ বলেন, ইতিহাসের চেতনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ হতে হলে আমাদের ভিত সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে :

> আমাদের উপলব্ধি করতে হবে-হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-বাগদিরাই আমাদের স্বগোত্র, স্বজাতি – আমাদের ভাই। আমাদের দেহে তাদেরই রক্তের ধারা বহমান। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সাঁওতাল, কোচ, গারো, খাসিয়া, চাকমা আমাদের ভাই। আমরা যারা আমাদের গোত্র পরিচয় মুছে দিয়ে, আমাদের জাতি পরিচয় লুকিয়ে বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি শাসকশ্রেণিতে মিশে যেতে চেয়েছি, শাসকের সংস্কৃতি অন্ধ অনুকরণ করেছি, শাসকের পরিচয়ে আত্মপরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তারা ভুল করেছি, আত্মপ্রবঞ্চনা করেছি – তার জন্য আমাদের দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। (আহমদ শরীফ, ২০১৬ : ৪৬)

এই দুর্দশা ও আত্মপ্রবঞ্চনার কবল থেকে পরিত্রাণ মিলতে পারে আত্মোপলব্ধিতে, স্বকীয় সংস্কৃতির সুস্থ ধারার চর্চায়।

উৎসব সমাজকে, সমাজের মানুষকে যেমন প্রভাবিত ও পরিচালিত করেছে, তেমনি উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষ সমকালীন জীবনে প্রবেশ করেছে। উৎসব সমাজকে ন্যায়-অন্যায় বোধে উজ্জীবিত করেছে যুগে যুগে। বাঙালি গণমানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, বিদ্রোহ করেছে। পরাজয়কে ভূলুণ্ঠিত করে অন্তর্নিহিত শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। দুর্দমনীয় মনোভাব বাঙালিকে দেখিয়েছে সফলতা। কিন্তু এই বাঙালির বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যারা বিজাতি-বিভাষী-বিদেশীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারাই বাঙালির সর্বনাশ করেছে বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। তিনি (২০১৬ : ৪৬) বলেন, শক্তি দিয়ে যারা মানায়, তাদের শক্তি পশুশক্তি। পশ্বাচার মানুষের কাম্য হতে পারে না। আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতা এবং দাসত্বের মনোভাব পরিবর্তন জরুরি। যে শৃঙ্খলিত, পরাধীনতার মনোভাব যার প্রতিপদক্ষেপে, সে কখনো প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। এজন্য আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীন মানুষের চেতনা অর্জন করার বিকল্প নেই। তাঁর মতে :

> বাঙালির চাই চরিত্রবল, চাই মনুষ্যত্ব, চাই মহত্ত্ব, চাই আদর্শপরায়ণতা, চাই মহৎ ও সুন্দরের জন্য সাধনা ও সংগ্রাম। এসব অর্জনের চেষ্টা করলে বাঙালির সুপ্ত শক্তি, অবদমিত শক্তি, আড়াই হাজার বছরের অবদমিত শক্তি জেগে উঠবে। বাঙালি পৃথিবীর বুকে মানুষ হয়ে দাঁড়াবে–প্রকৃত আত্মপরিচয় ঘোষণা করবে। (আহমদ শরীফ, ২০১৬ : ৪৬-৪৭)

উপর্যুক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে বিজাতীয় প্রভাব থাকলেও, সেখান থেকে ভালোটুকু গ্রহণ করার শিক্ষা অর্জন করা যেন সময়ের দাবি। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকে আদর্শপরায়ণ মনোভাবে এবং কল্যাণের সাধনায় নিয়োজিত হলে এর প্রভাব ছড়িয়ে যাবে সমাজে এবং সামাজিক উৎসবেও।

আহমদ শরীফ মনে করেন, জাতির জন্মপরিচয় তাকে সংকুচিত করে না, বরং আরোপিত পরিচয় তার অক্ষমতা প্রমাণ করে। জন্ম দৈবিক, কিন্তু কর্ম তার অর্জন। এজন্য একনিষ্ঠভাবে নিজেকে গড়ে তোলার উপযোগিতা তুলে ধরেন তিনি :

> 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো' – এই মনোভাব থাকতে হয়। ঐতিহ্য দিয়ে কি হয়? চোরের ছেলে চোর না হয়ে ভালো মানুষও হয়। আবার মহাপুরুষের ছেলেও কাপুরুষ অমানুষ হয়। ঐতিহ্য কি করে? মহাপুরুষের বংশধরদের চিরকাল মহাপুরুষ করে তুলতে পারে না কেন ঐতিহ্য? এ প্রশ্নের উত্তর নেই। উত্তরের দরকারও নেই। আমাদের শুধু দরকার এই মনোভাব যে, আমাদের বাঙালিদের বড় হবার সম্ভাবনা ছাড়া কিছুই নেই – সব আমাদের করে নিতে হবে এবং আমরা সব করে নেব। (আহমদ শরীফ, ২০১৬ : ৪৯)

সব বিছু করে নেয়া বা গড়ে নেয়ার জন্য যে সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন, সে সংঘশক্তির জন্য দরকার আত্ম-উপলব্ধির নবায়ন। ইতিহাস-ঐতিহ্য-উৎসব যদি সেই বোধ জাগ্রত করে, সেটাই হবে জাতির জন্য গৌরবের। তাই উৎসবের কাছে জাতির প্রত্যাশা – মিথ্যা আস্ফালন আর বিশেষ দিনে বাঙালি হবার অহংকার ছাপিয়ে, সাজাত্যবোধ ও সততার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দেবে উৎসব।

উৎসবের ঐতিহ্যকে লালন করার জন্য মানুষের ধর্মচিন্তা, আচার-অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিকতার আদি উৎস খুঁজে দেখা সময়ের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সে উৎসই জাতি ভেদের ঊর্ধ্বে উঠে উৎসব উদ্‌যাপনে সুচিন্তিত পথ দেখাবে। সর্বজনীন উৎসব – অসাম্প্রদায়িকভাবে, নব পরিচয়ে পৃথিবীর বুকে বাঙালির অবস্থান দৃঢ় করবে, পৃথিবীকে দেবে নতুন বার্তা।

কিন্তু সে সময়ে পৌঁছানোর প্রহর শেষ হবে কবে, বা আদৌ তার পরিসমাপ্তি আছে কি না, এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৩৩৯-৩৪০) রেখে গেছেন অনেক আগেই। বাঙালির অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তিতে ভরসা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই ঋতুভিত্তিক অনেক উৎসবেই দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্ত মহামিলন। বাঙালি চাইলে পারে, এ কথার প্রমাণ সে যুগে যুগে রেখেছে তার শিল্পে, সাহিত্যে, সৃজনকলায় ।

বাঙালির শৈল্পিক দক্ষতা তাকে জাতি হিসেবে যেভাবে অলংকৃত করেছে, সে অহংকার যে কোনো ভাবেই ধরে রাখা উচিত,মনে করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বাঙালির মতো শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই – প্রমাণ, বাঙালি পটুয়ার পট, বাঙালি ছুতারের কাঠ খোদাই, মধ্য-যুগের বাংলার ইটে-কোটা মন্দিরের নক্‌শা; বাঙালির নাচ অপূর্ব-প্রমাণ, বাঙালির মল্ল-নৃত্য, রায়-বেশে নাচ, বাংলার কোনো কোনো জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপশীল ব্রত-নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিব, যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব; এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটি মনোহর অভিব্যক্তি। (সুনীতিকুমার, ২০১৬ : ৪৭০)

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির মতোই বাঙালি হিসেবে আমাদের ভাবনা আছে, শিল্পবোধ আছে, আছে মেধা, সৃষ্টিশীলতা। সভ্যতার ভান্ডারে বাঙালির অবদান তলাবিহীন ঝুড়ি নয় উল্লেখ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন :

> আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার আমাদের হিন্দু-যুগের ও মধ্যযুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য, পট ও ইটে-খোদাই,– এসব গর্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও-কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে ও করিবে; এইখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব করিতে চাহি না; তবে যে কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য হইব না, আমরা পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমরা আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি। (সুনীতিকুমার, ২০১৬ : ৪৭০-৪৭১)

বহির্বিশ্বে বাঙালি ঐতিহ্যকে তুলে ধরবার এত সম্ভাবনার মাঝে প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙালির উচিত তার সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশে সহায়ক হওয়া। সেই সাথে অনুচিৎ আস্ফালন বা আড়ম্বর ত্যাগ করে তার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হওয়া।

কারণ, কৃতিত্ব অর্জন এবং রক্ষা করা সাধনার বিষয়। যার অভাবে শৈল্পিক, মানবিক এমনকি সাংগঠনিক উৎকর্ষও বিলোপ হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগে লোকজ শিল্পের উপযোগিতায় রুচি, শিল্প ও সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটতে দেখা যেত। সময়ের সাথে বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবর্তনে, সেই লোকজ-সংস্কৃতির নানা ধরনের প্রকাশ হয়ে গেছে বিলুপ্ত। যা বিলুপ্ত হয়নি তা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়েছে। এমন তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় হাসান আজিজুল হকের লেখায় : একটা সময় ছিল যখন চর্যাপদের কবিতাগুলো দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিবেশিত হতো। কয়েক যুগ আগেও যাত্রা, পালাগান, কবিগান, গম্ভীরা, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি গান মুখরিত হতো মানুষের মুখে মুখে। রাঢ় অঞ্চলে গৃহস্থ বাড়িতে আয়োজিত বৈষ্ণবকীর্তন এখন লুপ্তপ্রায়। বীরভূম-বর্ধমানের বাউল গান, যা ২০০৮ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়, সে গানগুলোও যেন শ্রোতা টানতে বদলে গেছে আধুনিক সুরের সাথে। কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় লালনের মাজারে যে লালনগীতি এখন পরিবেশিত হয়, তার সাথে লালন সাঁইয়ের যোগ কতটুকু, তা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সাপুরে নৃত্য, জেলে নৃত্য, পুতুলনাচের মতো আরও অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কালপ্রবাহে হারাতে বসেছে। (হাসান আজিজুল, ২০১৬ : ৫১৪)

আজ লোকজশিল্প স্থান করে নিয়েছে সৌখিন মানুষদের অন্দরমহলে। মৃৎশিল্প, কাঁসাশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, শোলাশিল্প, বয়নশিল্প আর কাঠ খোদাই শিল্পের কারিগররা বেঁচে থাকার তাগিদে, তাদের শিল্পকে পরিবর্তন করে নিয়েছেন যুগের সাথে। যদিও, সিলেটের শীতল পাটি বুননশিল্প ২০১৭ সালে এবং জামদানি বয়নশিল্প ২০১৩ সালে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে। এরপরও এই শিল্পীদের জীবনযাত্রার মান এতটাই করুণ যে, তারা কখনই তাদের কাজের ভার পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে হস্তান্তর করে যেতে চান না। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, বাঙালি লোকসংস্কৃতির নানা প্রকাশ পরিবর্তিত হতে হতে হয়ে গেছে প্রতীকী। ঠিক যেমন প্রতীকী বাংলা বছরের প্রথম দিন আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত বাঙালির সযত্নে বর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপন প্রক্রিয়া। হাসান আজিজুল হক (২০১৬ : ৫১৩) মনে করেন, বেশিরভাগ জিনিসই পুরনো হয়ে গেলে প্রতীকী হয়ে পড়ে, দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য হলেও প্রতীকী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বাঙালি সংস্কৃতিও প্রতীকী মর্যাদা অর্জন করেছে, অন্তত বিলুপ্ত হয়ে যায়নি; সময়ের সাথে এর রূপবদল প্রাকৃতিক বলেও উল্লেখ করে তিনি।

তারপরও, সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে শিল্পের যে বিবর্তিত ও আরোপিত রূপ দৃশ্যমান, সেই রূপ যুগের বিচারে কতটুকু সহনীয়, এই প্রশ্ন রয়েছে। অবক্ষয় আর হতাশার ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে সে ব্যর্থতার দায়ভার কার ওপর বর্তাবে, সেটিও আরেক প্রশ্ন। বাঙালি সংস্কৃতির বিপরীতশক্তিকে প্রতিরোধ করার সাংস্কৃতিক বলয় কতটুকু সংগঠিত, রয়েছে এই প্রশ্নও।

আদিকাল থেকে শুরু করে আজকের এই বিশ্ব-মানবসমাজে; যুগের সংকট, দুর্যোগ, জটিলতা উত্তরণে করণীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অন্তহীন ভাবনা আছে, অপকর্মের প্রতিবাদ আছে, তেমনি অনেক সুবচনও

নির্বাসিত হয়েছে। তবে মঙ্গলকামনায় যে অসাম্প্রদায়িক উৎসব, তার উপযোগিতা যুগে যুগে ধারণ করেছে জাতি।

উৎসবের মূল কথা সামাজিক উৎকর্ষ। তাই উৎসবের চেতনা যেন জাতির ঐক্য বোধকে শাণিত করে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গৌরবোজ্জ্বল করে, ন্যায় যুদ্ধের বিজয়োল্লাসকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে। কল্পনার আশ্রয়ী হয়ে বিশ্বব্যবস্থাকে আত্মোন্নয়নের অবলম্বন না করে, নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে না দিয়ে, উৎসবের ভূমিকা যেন সংস্কৃতির সুস্থ ধারায় মানসগঠনে সহায়ক হয়। উৎসবের কাছে প্রত্যাশা – তা চিন্তাজগতে অনুরণন জাগাক! চিত্তবিনোদন, কর্মস্পৃহা, স্বতঃস্ফূর্ততার মতো উৎসাহের আগুনে সজীব প্রাণে বয়ে আনুক রসধারা। উৎসবের শক্তি যেন জাতির মূল্যবোধ ও মাত্রাবোধ তৈরিতে সহায়ক হয়।

এমনি বহুবিধ প্রত্যাশার সাথে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই কিছু দায়বোধে আবদ্ধ হয়ে ওঠেন। বাঙালির প্রাণের উৎসবকে তাৎপর্যমণ্ডিত করতে তাকে সম্প্রীতি-প্রয়াসী সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় কখনো কখনো।

আমাদের দায়

অনেক সময় আমরা উৎসব করে ফতুর হয়ে যাই। ঋণশোধ করতেই দিন বয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, অল্পসম্বল ব্যক্তি যদি একদিনের জন্যে রাজা হওয়ার শখ মেটাতে যায় তবে তার দশদিনকে সে দেউলে করে দেয়। সেইজন্যে উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড় ম্লান। সেদিন আকাশের আলোর উজ্জলতাকে মনে হয় ফিকে, হিসেবের কথাটা মনে পড়ে অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, দুঃখ পেতে হয় না তাকে যে প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে নিয়মিত উৎসবের আয়োজন করে। তাঁর সচেতন ভাবনা :

> আমাদের উৎসবকে হঠাৎ এক দিনেই সাঙ্গ করে দেব না – প্রতিদিনের তুচ্ছতা এবং আত্মবিস্মৃতির মাঝেও অন্তত একবার জগতের নিত্য উৎসবের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করবো। অনুভব করবো – আমাদের প্রত্যেকদিনই মহিমান্বিত, ঐশ্বর্যময় – আমাদের জীবনের তুচ্ছতা তাকে লেশমাত্র মলিন করেনি – প্রতিদিনই সে নবীন, সে উজ্জ্বল, সে পরমাশ্চর্য... । (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৫০১)

তবে কালের প্রবাহে, উৎসবের শিক্ষা-মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা ও পরমতে শ্রদ্ধাশীলতার মতো মানবিক গুণাবলীগুলো যেন হারিয়ে গেছে। শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের চিরস্থায়ী যোগাযোগ নেই, এমন আক্ষেপ করে বিনয় ঘোষ প্রশ্ন রেখেছেন :

> হঠাৎ মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মানুষের এই বৈরাগ্যের কারণ কি? যে সভ্যতার এক একটি স্তম্ভ মানুষ যুগে যুগে নিজের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় করে তৈরী করেছে, তাতে আজ কেন সেই মানুষই অট্যহাস্যে তাসের ঘরের মতো ধূলিসাৎ করে দিয়ে শান্তি পেতে চায়? এতদিন মানুষের কণ্ঠ থেকে বেঁচে

> থাকার যে রুদ্র সুর ধ্বনিত হয়েছে, আজ কেন সেখান থেকে মৃত্যুর করুণ রাগিণী, নীড়হারা পাখির বিলাপের মতো উৎসারিত হচ্ছে। আজ জীবন মিথ্যা, সভ্যতা মিথ্যা, শিল্প মিথ্যা, সংস্কৃতি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, সত্য শুধু মৃত্যু, সত্য শুধু অন্যায়, অবিচার, গর্বোদ্ধত স্বেচ্ছাচারিতা, পাশবিকতা। (বিনয় ঘোষ, ১৯৪০ : ১২১)

পাশাপাশি আশার বাণী শুনিয়েছেন তিনি। যে অশুভ সংকটকাল ভয়ংকররূপে সভ্যতাকে গ্রাস করছে, সেই সংকটের পেছনে রয়েছে চিরপ্রবহমান ইতিহাসের জয়জয়কার। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের (১৯৪০ : ১৪৭) মত, সেই ঐতিহাসিক ধারার প্রবাহপথে যে ঝড়ো হাওয়া, তা সাময়িক। তাই পথভ্রষ্ট না হয়ে সেই ঐতিহাসের দিকেই দৃষ্টি ফেরাতে হবে। গতিশীল ঐতিহাসিক ধারাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করাই আজ মানুষের নৈতিক কর্তব্য উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, আজ জীবনের সেই স্পন্দমান প্রাণশক্তিগুলিকে (Elemental Forces of Life) উপলব্ধি করতে চেষ্টা করাই হবে আমাদের অবশ্যপালনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। (বিনয়, ১৯৪০ : ১৪৭)

সচেতন মানুষমাত্রই অনুধাবন করেন অশনিসংকেত। ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি তার পঙ্কাবর্ত হতে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তায়, ব্যর্থ প্রমাণিত প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে যখন নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছে, তখন নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণি প্রতিবন্ধক হয়ে পথ রোধ করেছে; এমন প্রসঙ্গ উঠে আসে আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখায় :

> এটা বিশ্বাস ঘাতকতার নামান্তর। কিন্তু বিশ্বাস ঘাতকতা করে পার পাওয়ার শক্তি তারা পাচ্ছে কোথায়? তা'হলে কি এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় না যে, শোষিত নিপীড়িত জনগণের শ্রেণি-চেতনা এখনও দুর্বল। শ্রেণিত্যাগী বুদ্ধিজীবী শেণির উদ্ভব এখনও হয়নি। অথবা হলেও জনগণকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো শক্তি এখনও তারা অর্জন করতে পারে নি। তা'ছাড়া, সকল শ্রেণির প্রতিবিপ্লবী যখন ঐক্যবদ্ধ তখন তারা বিভক্ত। সময় সময় যে গণবিদ্রোহ দেখা যায় সেটা কি উত্তেজনার মুহূর্তে Crowd এর আচরণ? এ প্রশ্নটিও মনে জাগে। (আবু জাফর, ১৯৮৮ : ৮১)

কেবল দুর্বলচিত্ত, ভীরু এবং অলসেরাই জীর্ণ, অন্ধভাবনায় আটকে থেকে কূলকিনারা না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। বিধ্বস্ত মনে ফিরে তাকায় যুগের উপর দিয়ে প্রবাহিত কালস্রোতে, আশ্রয় খোঁজে ফেলে আসা বুর্জোয়া জীবনের নৈতিকতায়। বিনয় ঘোষ (১৯৪০ : ১৫১-১৫২) লেনিনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, লেনিনের মতো 'Master of action' যাঁরা, যুগধারার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের এক ভাবেন, এবং সেজন্য এর অন্তর্লীন চিরজীবন্ত প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পথ সুগম করেন। তাঁর মতে :

> আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের ও মানুষের এই 'elemental force' গুলিকে উপলব্ধি করে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা। সামাজিক সমস্যাগুলির বাহ্যিক রূপই আসল রূপ নয়, সেই বাহ্যিক রূপের অন্তরালে যে প্রাণশক্তি আছে, স্পন্দমান প্রাণের যে গতিশীল জীবন্ত রূপ আছে, তাই হচ্ছে আসল রূপ, বাস্তব তাকে বলে, তাকে সত্য বলে। ভাসমান সমস্যার মর্মস্থলে প্রবেশ করে সেই প্রাণশক্তির সন্ধান করা, এবং তাকে অন্তরে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে রূপায়িত করাই শিল্পীর কর্তব্য। সেই রূপায়ণকে বলে বাস্তব-সৃষ্টি, সত্য-সৃষ্টি, এবং শিল্পী হচ্ছেন সেই বাস্তব ও সত্যের স্রষ্টা। (বিনয়, ১৯৪০ : ১৫২-১৫৩)

প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে ছিন্ন করে সমাজের অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে পারে উৎসব। সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা বাস্তবায়ন করা হবে এ-যুগের যোদ্ধা, শিল্পী-সাধকদের করণীয়। তবে, প্রচলিত আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি যখন অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ করতে ব্যর্থ হয়, পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালেও শাসক শ্রেণি তার কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণার্থে জরাজীর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাধান খুঁজে বেড়ায় বলে উল্লেখ করে আবু জাফর শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> প্রত্যাসন্ন আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের আশঙ্কায় তারা তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগ্রত করে তাদিগকে বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। নিজেরা যে বিধি পালন করে না, পালন করা সম্ভবও মনে করে না, এমন কি ওসব বিধিবিধানে আস্থাশীলও নয়, জনসাধারণের জন্যে তারা ঠিক ঐগুলোই ব্যবস্থাপত্র রূপে বিতরণ করে। (আবু জাফর, ১৯৮৮ : ১১১-১১২)

এমন ক্ষেত্রে উৎসবগুলোই বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ছাপিয়ে মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশা পৌঁছে দেয় নতুন প্রজন্মের কাছে।

বিনয় ঘোষ (১৯৪০ : ১৫৩) বলেন, সাম্য, স্বাধীনতা, বিশ্বাস, নিরাপত্তা, শান্তি, শৃঙ্খলার বিষয়গুলো বর্তমান সমাজের 'elemental force'. মানবজীবনে এ গুণগুলোর সমন্বয়হীনতাই আধুনিক শিল্পীদের নৈরাশ্য ও অবিশ্বাসের কারণ। এমন পরিস্থিতিতে উৎসবগুলো জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার আশা জাগায়। নিরাপত্তা, শান্তি, সৌন্দর্য, স্বাধীনতা, বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে মানুষের যে প্রাণপণ সংগ্রাম, সেই সুপ্ত প্রাণশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে উৎসব। উৎসবের যুথবদ্ধ প্রেরণায় বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী শক্তি অর্জন করে সম্মিলিতর অধিকার। সকলের মিলিত অংশগ্রহণই শুধু নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে অনার্য ও আর্য পূর্বপুরুষ থেকে বাঙালি জাতি জন্মসূত্রে যে মনোভাব অর্জন করেছে তার নিন্দা পরিহার করতে হবে। বাঙালির নৈসর্গিক ও পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্যকে সম্বল করে যে অবস্থান সেটাকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলার পরামর্শ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের :

> আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানস প্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশী করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে – ইহাই আমার নিবেদন। (সুনীতিকুমার, ২০১৬ : ৪৭১)

যা নেই তার জন্য দুঃখ করে, নিজের অর্জনকে দুর্বল করে ফেলায় কৃতিত্ব নেই। বরং যা আছে বা সংস্কৃতির অঙ্গনে যা দেখা দিচ্ছে, প্রকাশ পাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে যদি বিকার, নৈরাজ্য পর-সংস্কৃতির জন্য অক্ষম লোলুপতা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ না পায় তখন নিজের অবলম্বন, নিজের খুঁটি ধরে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য পিছনে ফেলে আসা সামগ্রীগুলোর দিকে চোখ ফেরাতেই হবে, এমন মনে করেন হাসান আজিজুল হক :

> অবলুপ্তি পরিবর্তন রূপান্তরের বহমান স্রোতের মধ্যে বহু নিত্য শিল্প রয়ে গেছে যাকে সময় প্রহার করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা জীবনের চিরন্তনতা ও সৃষ্টিশীলতা প্রকাশে আজো আয়ুষ্মান। এই আয়ুষ্মানতার দীপ থেকে বর্তমানের নিভন্ত প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে নেওয়া আমাদের কাজ। (হাসান আজিজুল, ২০১৬ : ৫১৬)

প্রবলদের থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেখা দিলে জনগণের দিক থেকে তার মোকাবেলা করার আহ্বান জানান আবুল কাসেম ফজলুল হক। 'জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ' (২০১৮) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, দুর্বলরা জেগে উঠলে প্রবলদের মধ্যেও আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালোচনা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও প্রগতির মনোভাব দেখা দেবে। এর জন্য দুর্বলদের Eternal vigilance-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি আরও মনে করেন, দুর্বলরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের থেকে নিজেদের কল্যাণে নেতৃত্ব সৃষ্টি করে শক্তিশালী হতে পারে; আর সংস্কৃতি অবলম্বন করে মানুষের সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ, সহযোগিতামূলক ও সম্প্রীতিময় করতে পারে।

অতীতে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক হামলার মাধ্যমে নানা অপশক্তি সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিল। জাতীকে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে, দুশমনের নানা সাংস্কৃতিক চক্রান্ত মোকাবেলার পরিকল্পিত এবং কার্যকর পদ্ধতি ভাবতে হবে। সংস্কৃতি চর্চাকে প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার করে তুলতে সক্ষম হলে মানবতাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করেন আসাদ বিন হাফিজ। তাঁর পরামর্শ :

> যারা সমাজপতি বা নেতৃত্বের আসনে থাকবেন সমাজ দেহের সুস্থতা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে। সমাজের প্রতিটি অঙ্গনকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও তাদেরই। ... রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির গুরুভার বহনে তারা যত বেশি পারঙ্গম হবেন সমাজে তত দ্রুত সুস্থতা ফিরে আসবে। শিল্পীরা শিল্প চর্চা করেন কিন্তু তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সমাজপতিরা, রাষ্ট্রনায়করা। ... এ জন্য সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা বাড়াতে হলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। (আসাদ,২০০৪ : ২৩৩-২৩৪)

সংকট সংগ্রামের দ্বারা জেয় হলেও মুর্খ শ্রমজীবীদের দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়, উল্লেখ করে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণির যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের জয়ে যে নূতন সমন্বিত সভ্যতার সৃষ্টি হবে তার মধ্যে মানুষ আবার নূতন মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে।' (বিনয় ঘোষ, ১৯৪০ : ১৩৬)

সেই আশার প্রদীপ তুলে ধরেই অন্ধকার ভেদ করতে সচেষ্ট হন আশাবাদীরা। তাদের উচিত হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারক ও বাহক হওয়া। উৎসবের আনন্দ ও সুখের মাঝেই আছে সম্প্রীতির সে-সুযোগ। এ বিষয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার পাশাপাশি, কিছু পরামর্শও দিয়েছেন মাসুদ রানা :

> রাষ্ট্র যতই ধর্মনরপেক্ষ হোক না কেন, জনগণের মধ্যে আদিতে ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উৎসব সেভাবে তার ঐতিহ্যের অংশে পরিণত হয়েছে, তা হঠাৎ করে বাদ দেয়া যায় না এবং উচিতও নয়। জোর করে বাদ দিলে সে আবার জোর করেই ফিরে আসে। তাই সম্প্রীতি-প্রয়াসী সমাজ সংস্কারকদের উচিত হবে মানুষকে নিরানন্দ শূণ্যের মধ্যে ফেলে না দিয়ে প্রচলিত উৎসবগুলোকেই সর্বজনীন করার প্রকৌশল গ্রহণ করা। সামাজিক প্রকৌশলীরা স্থানীয়ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোকদের একে-অন্যের উৎসবে সহযোগিতা ও অংশিদারিত্ব দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। (মাসুদ রানা, ২০১৬)

উদাহরণস্বরূপ তিনি লিখেছেন, মুসলমানের ঈদের জামাতে কিংবা কুরবানিতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি পুজোপাঠে কিংবা আরতিতেও সব ধর্মের মানুষের যোগদান সম্ভব নয়। কিন্তু একের উৎসবে অন্যকে শুভেচ্ছা জানানো, উপহার দেওয়া, আনন্দ সম্মিলনীতে মিলিত হওয়া, নিজস্ব উৎসবী পোশাক পরিধান ও অনিষিদ্ধ উৎসবী খাবার খাওয়া যেতেই পারে। তবে, তিনি এও মনে করেন, বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুর তুলনায় অতি-ক্ষুদ্র, সেখানে পারস্পরিক সম্মতির পদ্ধতি চাপ হিসেবেও অনুভূত হতে পরে। সংখ্যাগুরু দায়পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ-পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে সম্প্রীতি-প্রয়াসীদের উচিত হবে সংখ্যাগুরু মুসলমানদেরকে হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা।

মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব কারণ, মানুষ যেমন অপরাজেয় মনোবলে বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জয় করেছে, তেমনি জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার অস্ত্র – সৌহার্দ, যার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় উৎসবের মিলনে। তাই জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সুস্থ পরিচর্যা ও বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বৈচিত্র্যের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ঐক্য। সমাজের সকল সম্প্রদায় তার বিশেষত্ব নিয়েই পরস্পরের সম্পূরক। সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও নির্মাণের ভাঙা-গড়ার খেলায় শিষ্টাচার, ললিতকলা, চারুকলার উৎসব নির্মাণ করবে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি। ঋতু উৎসবকে যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন, এই উৎসব যাদের জীবনে অপরিহার্য, তারা যেদিন আনন্দ করতে পারবেন, সেদিনই সত্যিকার অর্থে উৎসব উদযাপনের সার্থকতা। নইলে তা খেটে খাওয়া মানুষের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতারই নামান্তর হবে। তবেই অর্থবহ হবে নতুন বছর বরণের আনন্দ।

উপসংহার

মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গল সাধনার ব্রত নিয়ে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা, তাতে সভ্যতার উৎকর্ষ যেমন হয়েছে তেমনি বিজ্ঞানের প্রভাবে জীবনের অমৃতসম সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তির অপ্রতিহত সহজলভ্যতায় মানুষ হয়ে উঠছে আন্তরিকতাশূন্য, আত্মকেন্দ্রীক ও উদাসীন। বিজ্ঞান ও শিল্পের মাঝে অনিবার্যভাবে তৈরি হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়। ফলে, অনেকটা দ্রুতচালে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে জাতিগত সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিবর্তন আর বৈষম্যের অনির্ধারিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী প্রতিবেশ সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে; দেখা দিচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতা, নিস্পৃহতা, নিরাশা, অবিশ্বাস, মৃত্যুচিন্তার মতো অনিষ্ট ধারণা। বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ ও চেতনায় বিকৃতি ঘটছে; সংকট তৈরি হচ্ছে জাতিগত সংস্কৃতির অনন্য কাঠামোয়। আগামী দশকগুলোয় সংস্কৃতির রূপান্তর, সংযোজন এবং অনুপ্রবেশে বাংলার ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলোর পরিবর্তন আরও ব্যাপক হবে এমন ধারণা নিশ্চিতভাবেই করা যায়। তবে এই রূপ চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির আদি রূপ নয়।

একটা সময় ছিল যখন লোকসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া, নেতৃত্ব, শ্রমবিভাজন বা সামাজিক স্তরবিন্যাস সব ক্ষেত্রেই ঋতুভিত্তিক উৎসবের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হতো। সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ, উৎসবের মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণ কামনা আর অগণিত মানুষের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণে জীবন ঘনিষ্ঠ উৎসব রূপ নেয় সমাজ ঘনিষ্ঠ উৎসবে। ঋতু উৎসবের আর্থ সমাজিক প্রেক্ষপটে আবর্তীত হয় খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন জীবিকা।

বাঙালির বৈচিত্র্য-পিয়াসী মন এবং এর সঙ্গে তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সমন্বিত হয়ে ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো নিজ নিজ অবয়ব ও রূপ লাভ করেছে। উৎসবের উদ্ভব ভিন্ন ভিন্ন কারণে হলেও, জীবনের প্রয়োজনে তা বাঙালির স্নেহপুষ্ট হয়ে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এসব উৎসব সর্বজন-নন্দিত এবং সর্বজনীন আনন্দের উপলক্ষ।

'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' গবেষণা পাণ্ডুলিপির তিনটি অধ্যায়ের ৭টি পরিচ্ছেদে সজ্জাক্রমে সংস্কৃতি এবং বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ ও সংকট, ঋতুভিত্তিক উৎসবের উদ্ভব-বিকাশ-বিবর্তন, একই সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসবের উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃতি, সংস্কৃতির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য, বাঙালি কে বা কারা, বাঙালি সংস্কৃতির সংকট ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সেই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে বলা যায়, একটি সম্প্রদায়ভূক্ত মানব গোষ্ঠীর

সম্পদ এবং তার নিত্য জীবনযাপন প্রণালি, জীবনের দৃশ্যমান ও অনুভবযোগ্য অভিব্যক্তির যে বহিঃপ্রকাশ তার সব কিছুই সংস্কৃতি। আরও বিশদভাবে মানুষের জীবন ব্যবস্থায় দৃশ্যমান সম্পদ, তার ভাষা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেই সাথে ঐতিহ্য, রীতি, প্রবণতা, চিন্তা, কর্ম, সৃষ্টি এক কথায় মানব জাতির সজ্ঞানে মিশে থাকা এক সামগ্রীকতার রূপ-সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ধারা এবং সমঝোতার মাধ্যমে উন্নততর জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষাও।

সংস্কৃতি সৃষ্টিশীল এবং সঞ্চারণশীল এক প্রক্রিয়া; তবে এর অনুকরণজাত চর্চা জাতির অস্তিত্ব সংকটের কারণ। এক অর্থে তা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর।

সময়ের আবর্তনে প্রতিটি জাতির সংস্কৃতিচিন্তায় প্রগতিশীল, রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা লক্ষ্য করা যায়। সেই ধারায় জীবন, চেতনা ও মননে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী, সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী যে কোনো কাজ বা আচরণ অপসংস্কৃতি। আধুনিকতার নামে স্বজাত্যবোধ, চেতনা ও বিশ্বাসকে বিলিয়ে দেয়াও অপসংস্কৃতির নামান্তর। বাঙালি সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা, স্বার্থচিন্তা ছাপিয়ে যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত না হলে, সেখানে ভর করে কুসংস্কার। সেখান থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে যুক্তিগ্রাহ্য ও মানবিক হবার বিকল্প নেই।

সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে। আজকের সংস্কৃতি শুধু দেশীয় সাংস্কৃতিক প্রবণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। চলমানতাই মানব-প্রকৃতির প্রবণতা। যেখানে প্রভাব ফেলে আত্মচিন্তা বা আত্মপ্রসারে উন্মুখ থাকার প্রবণতা। সেই সূত্রে জীবন-জীবিকার রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ঘটে সামাজিক রূপান্তর, প্রভাবিত হয় সংস্কৃতি।

অতীতের শিল্পনৈপুণ্য আর সম্পদশালী ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে সংস্কৃতির বদল কাম্য নয়। ঐতিহাসিক ধারায় মৃত্তিকা সংলগ্নতা, মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থাকার প্রবণতা বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারার বিশেষ দিক। সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতির সুফল ভোগ করতে জনগণের সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে বাঙালির সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলোকে আঁকড়ে ধরতে হবে। অনুভব করতে হবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন সংস্কৃতির অনুকরণীয় দিকের ব্যাপকতা ও গভীরতা। তবেই জাতি হিসেবে বাঙালির অবস্থান সমৃদ্ধ হবে, এমন আশা করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উৎসব ও ঋতুভিত্তিক উৎসবের আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য, উৎসবের উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টার পাশাপাশি, উৎসবের ঐতিহ্য বর্ণনায় এসেছে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের উৎসব। সময়ের সাথে উৎসবের বিলুপ্তপ্রায় বা বিবর্তিত রূপটিও খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের গবেষণায়।

উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এক অনুষঙ্গ, যার মৌল উপাদানের অন্তর্গত আনন্দময়তা, ঐতিহ্যে অংশ নেওয়া এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংযোগ-সংহতি। সমাজবিজ্ঞানীরা উৎসব উদ্ভবের ইতিহাস খুঁজে বের করা দূরূহ বলে মনে করলেও, এই মতে পৌঁছেন, মানুষের উৎসব আর উৎসব প্রীতির ইতিহাস সামসময়িক। পারিবারিক আঙিনায় সীমিত ব্যক্তিগত আনন্দায়োজন যেমন উৎসব, তেমনি সমাজিকভাবে আয়োজিত নির্দিষ্ট গোত্রের বা সর্বজনীন অনুষ্ঠানও উৎসব। মূলত সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা পারিবারিক সমাবেশে মানুষে মানুষে বিরোধমুক্ত ও সংস্কারমুক্ত উৎসব আয়োজনে মিশে থাকে মানুষে মানুষে সম্পর্কের উত্তম দিকগুলো।

নৃতাত্ত্বিক তথ্য মতে, সভ্যতা পূর্ব-সময়ে, বলা যায় ভাষা সৃষ্টিরও আগে, গুহাবাসী মানুষ আনন্দ প্রকাশের জন্য নৃত্য বা দেহভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়ে, হাতে-মুখে বিশেষ ধরনের শব্দ সৃষ্টি করে আনন্দের আমেজ তৈরি করত, যা ছিল উৎসবের আদি আয়োজন। পরবর্তীকালে প্রকৃতির কৃপাপ্রার্থী অসহায় মানুষের আশ্রয় হয়ে ওঠে জাদুবিশ্বাস, অতিপ্রকৃতে বিশ্বাস, ধর্মীয় উপাদান, সংস্কার-আচারসহ নানা বিষয়।

আদিম যুগে শিকার কেন্দ্রিক খাদ্য সংগ্রহের অনুকরণ যখন কিছুটা উপস্থাপনা নির্ভর অভিনয়ে রূপ নেয় তখন সেই অনুকরণ প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে তার মনোরঞ্জনের খোরাক। সেগুলো স্থূল বা অমার্জিত হলেও, ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে জীবনে, দিন যাপনের গ্লানি অপনোদনে সেই আনন্দ আয়োজন তার কাছে আনন্দের। শিকারের সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে শিকারি নিজেই কিছু শুভ আর অশুভ অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে। কালক্রমে এই শক্তিগুলিই বিশ্বাসের সাথে পরিণত হয় শিকারের দেবদেবীতে। ইতিহাসদৃষ্টে এভাবেই হয়তো উদ্ভব ঘটে সাড়ম্বর পূজা বা উৎসবের।

অপরদিকে, গোত্রের যুথবদ্ধ জীবনে অবশ্য পালনীয় রীতি-প্রথা, যুথে মানব শিশুর জন্ম, প্রকৃতিতে ফল ফসলের প্রাচুর্য বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন রক্ষা পাবার কৃতজ্ঞতায় মানুষ অদৃশ্য শক্তির উপাসনা করে, তাকে সন্তুষ্ট করতে আচার সর্বস্ব উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবের বিশেষ সেই ধারায় কালক্রমে গড়ে ওঠে – জীবিকার উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, ঐতিহাসিক বা স্মরণ উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সামাজিক-পারিবারিক উৎসব, দেশাত্মবোধক উৎসব, জাতীয় উৎসব, দেশীয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব, স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত উৎসব।

এই উৎসবের সাথে অবশ্বম্ভাবীভাবে মিশে আছে এর বিবর্তন বা রূপান্তর প্রক্রিয়া। যদিও পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন কিছু উৎসব বা আচার, সমাজের বিবর্তন ঠেকিয়ে এখনো অকৃত্রিম-এমন উদাহরণ বিরল নয়। তবে বেশিরভাগ উৎসব সামাজিক, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে আপোষ করে।

এই গবেষণায় আলোচ্য ঋতুভিত্তিক উৎসব অনাদিকালের বহু প্রতীক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালির এক মহামিলনের উৎসব। ধর্মের সীমানার উর্ধ্বে ব্যক্তি, পরিবার,

Dhaka University Institutional Repository

স্থান, কাল আর জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ঋতুউৎসব সর্বজনীন। সেই সাথে লৌকিক সংস্কারে উদযাপিত ঋতুভিত্তিক উৎসব বাঙালির কাছে মঙ্গলের বার্তা বাহক।

মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে বর্ষামঙ্গল, শরৎ উৎসব, পৌষমেলা, বসন্তবরণের মতো ঋতু-উৎসবের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। এর আগে বর্ষবরণ উৎসবের সূচনাকাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও, বাংলা সনের সংস্কারক হিসেবে সম্রাট আকবরের নাম উঠে আসে সবার আগে। পুণ্যাহ, হালখাতা, চৈত্রসংক্রান্তী ও বৈশাখী মেলা, নৌকাবাইচ, নবান্ন, পিঠা উৎসবের মতো বর্ণাঢ্য আয়োজনগুলো সময়কে রাঙিয়ে তুলেছে নানাভাবে। এদিকে, বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ছায়ানটের আয়োজনেও উদযাপিত হয় বর্ষবরণসহ ঋতুভিত্তিক অনেক উৎসব। পরবর্তীকালে উদীচী এবং বর্তমানে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীসহ এই প্রজন্মের প্রগতিশীল শিল্পীদের প্রচেষ্টায় টিকে আছে উৎসবগুলো।

বাঙালি জাতিসত্ত্বার সংহত পরিচয় বহন করে ঋতুভিত্তিক উৎসব। মূলত গ্রাম কেন্দ্রিক কৃষিসমাজের প্রয়োজন-উপযোগ থেকে শুরু করে উৎসব-পার্বণ বা জীবন-জীবিকার কিছু জড়িয়ে আছে ঋতুভিত্তিক উৎসবের মর্মমূলে। তাই এই উৎসবগুলো নবজাগরণের এক উৎসাহব্যঞ্জক অনুভূতি। বাঙালির লোক জীবনের সুসংসহ জীবন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি যেন হালখাতা, পুণ্যাহ, লোকপার্বণ, লোকবিনোদন, সর্বোপরি চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখী মেলা। শ্রমক্লান্ত নগরবাসী থেকে শুরু করে দারিদ্র-বঞ্চনায় পীড়িত গ্রামবাসী অতীতের হতাশা ভুলে জেগে ওঠে নতুন উদ্দীপনায়–উৎসবের অমলিন আনন্দে। হয়তো এটাই ঋতুভিত্তিক উৎসবের সার্থকতা, হয়তো এভাবেই আগামীর শুরু। একটু সতর্ক ও সযত্ন হলেই বাঙালি তার লালিত ঐশ্বর্য দিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারে, এমন প্রমাণ সে রেখেছে। এটুকু স্মরণ রাখার, বাঙালি অনুকরণে সিদ্ধহস্ত হবে না,অজস্র শৈল্পিক প্রদানে সিদ্ধি লাভ করবে।

ঋতুভিত্তিক উৎসবের উপযোগীতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বাঙালির সামাজিক মিলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, জাগিয়েছে স্বজাত্যবোধ, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ। উৎসব মানুষকে করেছে মানবিক ও সহনশীল, দূর করেছে জাতিগত সীমা। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে ঋতু উৎসবগুলো পর্যায়ক্রমে বাঙালির জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে পরিণত হয়েছে প্রাণের উৎসবে।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা সৃজনশীলতার প্রকাশ যেমন ঘটে, তেমনি দেখা দেয় নব কর্মপ্রেরণা। উৎসবের ব্যয়ে শ্রমিক সরবরাহ বাড়ে, সুযোগ তৈরি হয় নানামূখী কর্মসংস্থানের। সেই সাথে মুদ্রা সরবরাহে গতিশীলতা দেশীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

আলোচনার একটি অংশ জুড়ে আছে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও গৌরবময় সংস্কৃতির দিকগুলোও। ত্রিপুরা, মারমা,চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রকৃতি কেন্দ্রীক ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ

Dhaka University Institutional Repository

উৎসব 'বৈসাবীর' মতো মূলত ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো, সেই সাথে নানা সাংস্কৃতিক আচার ও উপাদানগুলো আলোচনায় এসেছে বর্ণাঢ্য উপাদান হয়ে। মর্যাদা, মঙ্গল ও শান্তির প্রত্যাশায় উদযাপিত এই ঋতুভিত্তিক উৎসব বাঙালি সংস্কৃতিকে যেমন ঋদ্ধ করেছে, তেমনি সমৃদ্ধ করেছে গবেষণাকে।

শেষ অংশ তৃতীয় অধ্যায়ে, সর্বজনীন উৎসব কী, সর্বজনীন উৎসবের উপযোগিতা, বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশে উৎসব এবং ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলো কতটুকু সহায়ক, তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল উৎসব, শরৎ বন্দনা, নতুন ধান ঘরে তোলার নবান্ন উৎসব, পৌষসংক্রান্তি, পিঠা উৎসব বা বসন্তবরণের মতো ঋতুভিত্তিক উৎসব – এ যাবৎকাল পর্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। তবে, তা উদযাপিত হয়েছে ঔপনিবেশিক অনুকরণজাত প্রভাবে বা অভ্যাসে নয়; বরং প্রাণের তাগিদে সব মানুষের অংশগ্রহণে এবং অধিকারকে সমতায় রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে। যদিও কারো কারো মতে, সর্বজনীন উৎসব আয়োজনে শুধু রক্ষণশীলতা নেই, যা আছে তা হল প্রতিক্রিয়াশীলতা আর অপচয়। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, স্বজাত্যবোধ উন্মুক্ত করে বৃহত্তর জীবনবোধকে। তাই বাঙালি সংস্কৃতিকে লালন করার, একত্রে উদ্‌যাপন করার এই তাগিদকে ভুলে গেলে চলবে না। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন সংস্কৃতি জীবনকে আত্মকেন্দ্রীক, সংকুচিত, স্থবির করে দেয়। এর প্রভাবমুক্ত হতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও দরকার। উৎসবের উপযোগিতা স্বীকার করে, তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আজ সময়ের দাবি। এতে আপাত-প্রতীয়মান প্রতিবন্ধকতা দূরে সরে যাবে বলে আশা করা যায়।

বাঙালির শ্রেণিবৈষম্যময়, শোষিত-সামন্ত সমাজব্যবস্থায় 'স্বাধীন জাতি' শব্দটি বুর্জোয়া-স্বাধীনতার স্বরূপ; যা এক অর্থে দাসত্বের নামান্তর। অপরদিকে, ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অসাম্প্রদায়িক শক্তির মেলবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা, আত্মপ্রত্যয় আর উদ্যোগের সমন্বয় ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তি ঘটায়।

আদিকাল থেকেই সমাজে চলমান শ্রেণিদ্বন্দ্ব ঋতুভিত্তিক উৎসবকে সহনশীল, সহগামী হতে দেয়নি। শ্রেণিদ্বন্দ্ব উৎসবের মাহাত্ম্য খর্ব করেছে। কদাচিৎ নির্যাতিত শ্রেণি এর প্রতিবাদ মুখর হওয়ায়, এখন পর্যন্ত সার্থকভাবে আলোর মুখ দেখছে কিছু উৎসব।

বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসবের শিক্ষা – বৈষম্যহীন এক সমাজ। তা বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের কিছু দায় থেকেই যায়। যে দায়িত্বের সফল বাস্তবায়ন পথ দেখাবে পরবর্তী প্রজন্মকে। যারা হয়ে উঠবে সুস্থ সংস্কৃতিকে বেগবান করার চালিকা শক্তি।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাই ঋতুভিত্তিক উৎসবের উপযোগিতা কেবল বিবেচনার বিষয় নয়, তাদের উপলব্ধির সঙ্গে উৎসব শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

'বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে ঋতুভিত্তিক উৎসব : বিবর্তনের রূপরেখা' বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় তথ্যপ্রমাণ ও লিখিত গ্রন্থপঞ্জির অভাব অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলে। সে ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা উত্তরণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে কর্মসূত্রে মাঠ পর্যায়ে কিছু কাজ সহায়ক হিসেবে এসেছে। সেখান থেকেও তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে।

আশা করা যায়, ঋতুভিত্তিক উৎসব বিষয়ে ভবিষ্যতে যেসব গবেষক আগ্রহী হবেন, তাঁরা এই গবেষণার অসম্পূর্ণতাগুলোকে সমৃদ্ধ করবেন। উৎসব নিয়ে গবেষণার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও উদার থাকা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অজয় দাশগুপ্ত ২০০১, 'বাঁধ ভাঙার উৎসব', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

অতুল সুর ২০০৮, *বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

অন্নদাশঙ্কর রায় ২০১৬, 'সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আতিউর রহমান ২০০১, 'নববর্ষের আশাবাদ : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

আতোয়ার রহমান ১৯৮৫, *উৎসব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আ. ন. ম. নূরুল হক ২০০১, 'নববর্ষ : সেকাল ও একাল', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

আনিসুজ্জামান ২০০১, 'কয়েকজন বর্ষীয়ান শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির নববর্ষ নিয়ে স্মৃতি বর্ণনা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

আনিসুজ্জামান ২০১৬, 'আমাদের সংস্কৃতি', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সংকলিত ও সম্পাদিত), কথা প্রকাশ, ঢাকা

আনু মাহ্মুদ ২০০১, *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহ্মুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

আবদুল মতিন ২০১৬, 'সংস্কৃতির সন্ধানে', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, (আবুল কাশেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আবু জাফর শামসুদ্দীন ১৯৮৮, *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ২০০১, 'পয়লা বৈশাখের কড়চা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহ্মুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৯৯৫, *সাহিত্য চিন্তা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০১৫, *সংস্কৃতি*, ভাষা প্রকাশ, ঢাকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০১৬, 'সংস্কৃতি ও শিক্ষা : বিরাজমান পরিস্থিতি', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০১৮, *জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ*, ২ নভেম্বর, কালের কণ্ঠ, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ ২০০৪, 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি' (কাজী নুরুল হক অনূদিত), *সংস্কৃতি জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

আবুল হোসেন ২০১৬, 'মুসলিম কালচার', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আমিনুর রহমান সুলতান ২০১৪, 'ময়মনসিংহের নবান্ন উৎসব', *লোক উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

আলপ্তগীন তুষার ২০১৯, *মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

আল মাহমুদ ২০০৪, 'ধর্মান্ধতার বদনাম দিয়ে ধর্মহীনতার উৎসব', *সংস্কৃতি : জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা।

আলী আনোয়ার ২০০৮, 'উৎসব নিয়ে ভাবনা', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আশরাফ সিদ্দিকী ২০০১, 'শুভ নববর্ষে দর্শন', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহ্মুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

আশরাফ সিদ্দিকী ২০১৪, 'আমাদের আবহমান নবান্ন উৎসব', *লোক-উৎসব নবান্ন*, অবসর, ঢাকা

আসাদ বিন হাফিজ ২০০৪, 'সংস্কৃতিই পারে', *সংস্কৃতি : জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

আহমদ রফিক ২০০৮, 'পয়লা বৈশাখ হতে পারে জাতীয় উৎসব-দিবস', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ*, (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আহমদ শরীফ ২০০৬, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আহমদ শরীফ ২০১৬, 'ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সম্পাদিত), কথা প্রকাশ, ঢাকা

ইন্দুভূষণ অধিকারী ১৯৮৮, 'প্রকাশকের কথা', *বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি*, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, কলকাতা

এ. টি. এম. গিয়াস উদ্দিন ২০০১, 'বাংলা নববর্ষ ও আন্তর্জাতিকতা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ ২০০৭, 'সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য', *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪*, (কে. এম. মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

এম. আই. চৌধুরী মুক্তা ২০০১, 'বাঙালির জাতীয় উৎসব পহেলা বৈশাখ', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

ওবায়দুল হক সরকার ২০০১, 'নববর্ষ-নব ভাবনা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক*, ঐতিহ্য, ঢাকা

ওমর বিশ্বাস ২০০৪, 'সংস্কৃতি', *জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

করুণাময় গোস্বামী ২০০১, 'শুভ নববর্ষ : রমনা বটমূল', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

কে. এম. মোহসীন ২০০৭, 'সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন', *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪* (কে. এম. মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

খোন্দকার রিয়াজুল হক ১৯৯৫, *বাংলাদেশের উৎসব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গাজী আজিজুর রহমান ২০১৯, 'বাংলা কাব্যে বৈশাখ ও বর্ষবরণ', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গোপাল হালদার ১৯৭৫, *বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা, ঢাকা

গোপাল হালদার ১৯৭৬, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা

গোলাম মুরশিদ ২০০৬, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ২০০১, 'বাঙালির নববর্ষ চেতনা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

তিতাশ চৌধুরী ২০১৪, 'নবান্ন উৎসবে গ্রাম বাংলা', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

দীনেন্দ্রকুমার রায় ২০১৪, 'নবান্ন', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

দীপককুমার বড় পণ্ডা ২০১৪,'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

নারায়ণ চৌধুরী ১৯৮৫, *সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য;* শ্রী চিত্তরঞ্জন সরকার, মনোবাণী রবীন্দ্র পল্লী, নিমতা কলিকাতা

নাসরীন মুস্তাফা ২০১৬, 'হেমন্তায়োজন', *ঋতুগদ্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

নীলিমা ইব্রাহিম ২০১৬, 'বাঙালি সংস্কৃতি', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সংকলিত ও সম্পাদিত), কথা প্রকাশ, ঢাকা

পূরবী বসু ২০০১, 'চৈত্র-বৈশাখ', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক*, ঐতিহ্য, ঢাকা

প্রদ্যোত কুমার মাইতি ১৯৮৮, *বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি*, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, কলকাতা

প্রদ্যোত কুমার মাইতি ২০১৪,'নবান্ন : বাঙালির জাতীয় উৎসব', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

প্রবীর ঘোষ ২০১৬, 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (আবুল কাশেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

ফজল খান ২০০১, 'বাংলা নববর্ষ ও আমরা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক*, ঐতিহ্য, ঢাকা

ফিরোজ মাহমুদ ২০০৭, 'জনপ্রিয় সংস্কৃতি : ফোকলোর', *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪* (কে. এম. মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর ১৯৭৪, *সংস্কৃতির সংকট*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বরুণকুমার চক্রবর্তী ২০১৪, 'পার্বণে উপেক্ষিতার আর এক নাম 'নবান্ন'', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

বিজনকুমার মণ্ডল ২০১৪, 'নবান্ন-এর রূপরেখা', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

বিনয় ঘোষ ১৯৪০, *শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০১৯, 'নববর্ষ-উৎসব : রূপরূপান্তর', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত) বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বুলবন ওসমান ২০০১, *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব*, প্রথম অরিত্র সংস্করণ, ঢাকা

মফিদুল হক ২০১৯, 'বৈশাখ বাজায় মিলনের বাঁশি', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মমতাজুর রহমান তরফদার ২০১৬, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান (সংকলিত ও সম্পাদিত), কথা প্রকাশ, ঢাকা

মাধুরী সরকার ২০১৪, 'নবান্ন : আদিম খাদ্যপ্রাপ্তির উল্লাসের বিবর্তীত রূপ', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা।

মাসুম কামাল, শেখ ২০০৯, *বঙ্গ সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

মাযহারুল ইসলাম তরু ২০০৭, 'আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন ও সংস্কৃতি', *আদিবাসী লোকজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মিজানুর রহমান আফরোজ ২০০১ *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন ১৯৯৪, *বাংলাদেশের উৎসব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন ২০০১, 'বৈশাখে', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ ২০০১, 'আমাদের জাতীয় সন', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

মুহম্মদ নূরউল ইসলাম ২০০১, 'সাংগ্রেং পোয়ে রাখাইন সম্প্রদায়ের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসব', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

মুহম্মদ মতিউর রহমান ২০০৪, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি', *সংস্কৃতি জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২০০৪, 'বাংলার ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতি', সেলিন ইয়াসমিন অনূদিত, *সংস্কৃতি জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০০১, 'নববর্ষের উৎসব', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

মৃত্যুঞ্জয় রায় ২০১০, *বাঙলার ঐতিহ্য*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ২০১৬, *সংস্কৃতি কথা* (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোমেন চৌধুরী ২০১৪, 'নবান্ন : একটি লোক-উৎসব', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ২০০৪, 'বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন', *সংস্কৃতি জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

মোহম্মদ আব্দুল কাইউম ২০০১, 'ঐ নুতনের কেতন ওড়ে', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ২০০৭, *ফোকলোর উৎসব ও লোক সংস্কার*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

যতীন সরকার ২০০৮, 'বাংলা নববর্ষ : উৎসবের খণ্ডীভবন', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ*, (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবিউল হুসাইন ২০০৮, 'বৈশাখের সর্বজনীনতা : আমাদের সোনালী ঐতিহ্য', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৭, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৩, *সঞ্চয়িতা*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯৮, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

শফি আহমেদ ২০০১, 'নববর্ষের কামনা – আবার তোরা বাঙালি হ', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

শফি আহমেদ ২০০৮, 'নববর্ষের কামনা : আবার তোরা বাঙালি হ', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শামসুজ্জামান খান ২০১৪, 'নবান্ন উৎসব', *লোক উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

শামসুজ্জামান খান ২০১৩, *বাংলাদেশের উৎসব*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

শাহ আবদুল হান্নান ২০০৪, 'সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক', *সংস্কৃতি* জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪ খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

শাহাবুদ্দীন আহ্মদ ২০০৪, 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংস্কৃতি', *সংস্কৃতি জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪* (খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত), জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা

শেখ মাসুম কামাল ২০০৯, *বঙ্গসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

সন্‌জীদা খাতুন ২০১৬, 'সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সম্পাদিত), কথা প্রকাশ, ঢাকা

সমীররঞ্জন শীল ২০০১, 'বাঙলা নববর্ষ ও আমাদের স্বাদেশিকতার চিন্তা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

সঞ্জীব দ্রং ২০০১, 'নববর্ষ উৎসব বৈসুক সাংগ্রাই বিজু : বৈসাবি', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

সরকার আবদুল মান্নান ২০০৮, বর্ষবরণ, *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত),বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১৯৬৩, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

সামসুল হুদা চৌধুরী ২০০১, 'বাঙালির সার্বজনীন জাতীয় উৎসব বাঙলা নববর্ষ', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০১, 'পহেলা বৈশাখ একুশে ফেব্রুয়ারি', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

সুজন বড়ুয়া ২০১৪, 'বিকেল যখন নিকেল করা', *ঋতুর রঙে বাংলাদেশ*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২০১৬, 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা* (আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সম্পাদিত), কথা প্রকাশ ঢাকা

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, 'নবান্ন ও আদিবাসী সমাজ', *লোক উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ২০০১, 'নবায়নের প্রণোদনা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান ২০০১, 'বাংলা নববর্ষ', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ২০০১, 'উৎসব', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা

সৌমিত্র শেখর ২০১৪ 'নবান্ন : পার্বণ থেকে উৎসব', *লোক-উৎসব নবান্ন* (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত) অবসর, ঢাকা

হাসান আজিজুল হক ২০১৬, 'বাঙালি সংস্কৃতির কী হবে', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সম্পাদিত, কথা প্রকাশ ঢাকা

হাসান ইমাম ২০০১, 'কয়েকজন বর্ষীয়ান শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির নববর্ষ নিয়ে স্মৃতিবর্ণনা', *পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যের বাহক* (আনু মাহমুদ সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ ২০০৮, 'নববর্ষে সংস্কৃতি-সাংকর্য নাকি সংঘর্ষ', *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ* (মোবারক হোসেন সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Alfred A. Knopf Sr. 1966, *Culture Dynamics,* Alfred A. Knopf Inc, New York.

Dhaka University Institutional Repository

Anisuzzaman	??, *Festivals of Bangladesh* (Edited by Anisuzzaman, Shamsuzzaman Khan, Syed Manzoorul Islam), Nymphea publication, Dhaka
Archer Taylor	1948, *Folklor and the student of literature,* The pacific Spectator, Vol-2.
Bertrand Russell	2009, *History of Western Philosophy*, Routledge.
Mokaram Hossain	2012, 'Late autumn comes on the sly', *SIX COLORS OF BANGLADESH,* Anindya Prokash, Dhaka
Muntassir Mamoon	1996, *THE FESTIVALS OF BANGLADESH* (Translated from Bengali by Rajoshi Ghosh), University Press Limited, Dhaka
Samaren Roy	1981, *The Roots of Bengali Culture,* Firma KLM Private Limited, Calcutta.

পত্রিকা, ই-পত্রিকা ও অনলাইনসূত্র

আনিসুজ্জামান	২০১৮, ১৪ এপ্রিল, 'বাংলার প্রাণের উৎসব', *সমকাল*, ঢাকা
আনিসুজ্জামান	২০২১, ২৪ সেপ্টেম্বর, 'রবীন্দ্রনাথের উৎসব-ভাবনা', সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত শরৎ উৎসব ১৪২৮ (মানজারুল ইসলাম চৌধুরী সুইট সম্পাদিত)।
অতনু সিংহ	২০১৯, ১ জুলাই, 'বরষা পরবে', *ক্যানভাস*, ঢাকা
অনুপ সাদি	২০২১, ৫ জুলাই, 'সংস্কৃতি সম্পর্কে লেনিনবাদ হচ্ছে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রগতিশীল সংস্কৃতি', *ফুলকি বাজ*
অমিত রায় চৌধুরী	২০২০, ৩১ আগস্ট, 'সমাজ বিবর্তিত, উৎসব শাশ্বত', *রাইজিংবিডি.কম*
আবুল কাসেম ফজলুল হক	২০১৮, ২ নভেম্বর, 'জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ', *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা
আবুল খায়ের	২০১১, ১০ ডিসেম্বর, 'মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত : বিরহীর বার্তাবাহক'
আলমগীর শাহরিয়ার	২০২১, ১৮ অক্টোবর, 'সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, সহিংসতা ও বর্বরতার শেষ কোথায়?', *দ্য ডেইলি স্টার*, ঢাকা
আহমেদ ফয়েজ	২০১৩, ২০ মার্চ, 'একটি সার্বজনীন উৎসব : পহেলা বৈশাখ', *ahmedfoyez's bangle blog*.
ইমরান এইচ সরকার	২০১৫,৩০ সেপ্টেম্বর, 'প্রগতিশীলতা, মুক্তচিন্তা, ধর্মবিদ্বেষ : একটি বিশ্লেষণ'
এ কে এম শাহনাওয়াজ	২০১৮, ১৯ জুন, 'ধর্মীয় উৎসবে সাম্প্রদায়িকতা', *যুগান্তর*, ঢাকা
এইচ এম মুশফিকুর রহমান	২০২০, ১৫ ফেব্রুয়ারি, 'বসন্ত উৎসব ইতিহাস ও করণীয়', *দ্যা মেইল বিডি.কম*।
এস.এ. জাহাঙ্গীর আলম	২০২১, ২৪ জানুয়ারি, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত মিশন-ভিশন অর্জন প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণের বিকল্প নেই', *ঢাকা টাইমস*
জেবুন্নেসা চপলা	২০১৭, ১৭ জানুয়ারি, 'ধর্মান্ধতার অন্ধকার নয় বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান করতে হবে', *বিবিসি নিউজ*, বাংলা
তপোময় ঘোষ	২০১৭, ২৫ ডিসেম্বর, 'নবান্নের টানে আর কতদিন...', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতা
তারিক মনজুর	২০০৫, ১১ মার্চ, 'সিলেটের আদিবাসী জাতিসত্তা : জীবন ও সংস্কৃতি', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা
দিলশানা পারুল	২০২০, ৯ নভেম্বর, 'প্রগতিশীলতা বনাম মৌলবাদ : বাংলাদেশের 'বাইনারি' রাজনীতি'
দীপিকা ঘোষ	২০১৪, ২ অক্টোবর, 'বিপর্যস্ত ঋতুচক্র', *প্রথম আলো*, ঢাকা
নিতাই চন্দ্র রায়	২০১৮, ১৪ এপ্রিল, 'গ্রামীণ অর্থনীতিতে পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব', *শেয়ার বিজ*, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

নীরু শামসুন্নাহার	২০২০, ১৭ মে, 'বাংলাদেশে বর্ষার উৎসব', *পর্যটন বিচিত্রা*
পাপিয়া দেবী অশ্রু	২০১৯, ৫ অক্টোবর, 'বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গা পূজার ইতিবৃত্ত', *রোর মিডিয়া*
পান্থ আফজাল	২০১৬, ১১ সেপ্টেম্বর, 'উৎসবের অর্থনীতি', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা
ফয়সাল খলিলুর রহমান	২০১৬, ২৬ জুন, ২০১৬, 'বৃষ্টি ঘিরে উৎসব', *sylhettoday24*
মাসুদ রানা	২০১৬, ৭ জুলাই, 'উৎসব-জাতি-সম্প্রদায়-সম্প্রীতি', *বিডিনিউজ২৪.কম*, ঢাকা
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	২০১৯, ২ জুন, 'উৎসবের অর্থনীতি', *bdnews24.com*, ঢাকা
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	২০১৭, ২৫ জুন, 'ঈদের আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য', *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা
সাইমন জাকারিয়া	২০১১, ২২ এপ্রিল, 'বাংলা ঋতু-মাসের নামবিচার', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা
স্বকৃত নোমান	২০১৭, ১ ডিসেম্বর, 'শীত উৎসব', *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	২০১৮, ১৫ ডিসেম্বর, 'উৎসবের শেষে ও তার পরে', *প্রথম আলো*, ঢাকা
সেলিনা হোসেন	২০২১, ১৪ এপ্রিল, 'বাঙালির অসাম্প্রদায়িক উৎসব', *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা
হাসান মামুন	২০১৫, ১৮ এপ্রিল, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু', *বিডি নিউজ ২৪.কম*, ঢাকা
হায়দার আকবর খান রনো	২০১৭, ১২ মে, 'ধর্মীয় মৌলবাদ বনাম বাঙালি সংস্কৃতি', *প্রথম আলো*, ঢাকা
যতীন সরকার	২০২১, ১৪ এপ্রিল, 'বাঙালির নববর্ষ আজ আমাদের অসাম্প্রদায়িক উৎসব', *সমকাল*, ঢাকা
লেখক (?)	২০২০, ৯ মার্চ, 'বসন্ত উৎসব–রবীন্দ্রনাথের আদর্শ', শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য, *দৃষ্টিভঙ্গি*, ঢাকা
লেখক (?)	২০১৭, ১২ মার্চ, 'শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব', *প্রথম আলো*, ঢাকা
লেখক (?)	২০১৮, ২৮ মে, 'সাত গুণী পেলেন শিল্পকলা পদক', *প্রথম আলো*, ঢাকা
লেখক (?)	২০১৭, ফেব্রুয়ারি, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, 'ফিরে দেখা পৌষমেলা', *সংস্কৃতি অঙ্গন* (মানজারুল ইসলাম চৌধুরী সুইট সম্পাদিত), ঢাকা
লেখক (?)	'মঙ্গল শোভাযাত্রা', https ://www.bbc.com/bengali/news-39579890
Satyaki Dutta	২০১৬, ১৪ আগস্ট, 'বর্ষামঙ্গল', শান্তিনিকেতন

সাক্ষাৎকার : সরাসরি ও মিডিয়া

১. গোলাম কুদ্দুছ

সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট

সভাপতি, পৌষমেলা উদযাপন পরিষদ।

(সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ২৮ নভেম্বর ২০২১, দুপুর ৩টা। ঠিকানা : ২৩৪/সি, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।)

২. মানজারুল ইসলাম চৌধুরী সুইট

সাধারণ সম্পাদক, বসন্ত উৎসব উদযাপন পরিষৎ

সাধারণ সম্পাদক, সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠী

সহ-সভাপতি নবান্ন উৎসব

সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, পৌষমেলা

আহ্বায়ক, বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত উৎসব।

(সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ২৭ নভেম্বর ২০২১, বেলা ১১.৩০ মিনিট। ঠিকানা : ১৫১/২ মনিপুরি পাড়া, ঢাকা।)

Dhaka University Institutional Repository

৩. অরূপ রতন চৌধুরী

'বাজলো তোমার আলোর বেণু', বিশেষ অনুষ্ঠান, এনটিভি

অনুষ্ঠান প্রচারের তারিখ : ৮ অক্টোবর ২০১৯

(সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৩ অক্টোবর ২০১৯। স্থান : বহিরঙ্গন/Outdoor, কারওয়ান বাজার। সময় : বিকাল ৫টা।)

৪. শিপ্রা সরকার

অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'বাজলো তোমার আলোর বেণু', বিশেষ অনুষ্ঠান, এনটিভি

অনুষ্ঠান প্রচারের তারিখ : ৮ই অক্টোবর ২০১৯

(সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : অক্টোবর ২, ২০১৯, স্থান- বহিরঙ্গন/Outdoor, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। সময় : দুপুর ১টা।)

৫. তামান্না জেনিফার মুন	'মঙ্গল শোভাযাত্রা', সংবাদ প্রচারের সময় : এনটিভি, ১৩ এপ্রিল ২০১৫। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১২ এপ্রিল ২০১৫, স্থান : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সময় : সকাল ১১টা।
৬. তামান্না জেনিফার মুন	'শরৎকাল', সংবাদ প্রচারের সময় : এনটিভি, ৫ অক্টোবর ২০১৮। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১ অক্টোবর ২০১৮, স্থান : বহিরাঙ্গন, ঢাকা, সময় : সকাল ৯টা – দুপুর ১টা।